HIDE RD
'F' BLOCK.

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

শ্রীমতী গৌরী মিত্র
শ্রীমতী সুষমা মিত্র
কল্যাণীয়াসু

বেহালা	১
পালঙ্ক	২৬
ভুবন ডাক্তার	৬৫
টর্চ	৯৯
কাঠগোলাপ	১২৩
শুল্ক	১৫৫
একপো দুধ	১৭২
ক্রোড়পত্র	১৮৬

বেহালা

ঘরে না আছে একটা দাঁতন, না আছে এক ছিঁটে মাজন। সংসারে কেবল নেই আর নেই। ভোরে উঠেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল পঞ্চাননের। স্ত্রী এক পাঁজা বাসন নিয়ে পাশের পুকুরের দিকে যাচ্ছিল, নজরে পড়তেই তাকে কড়া একটা ধমক লাগিয়ে কাছে ডাকল, 'এই শোন।'

অপর্ণা এঁটো বাসনগুলি নিয়েই স্বামীর কাছে একটু এগিয়ে এসে বলল, 'কি।'

পঞ্চানন বিকৃতমুখে শব্দটির পুনরাবৃত্তি করল, 'কি! সারা বাড়ি খুঁজে একটা দাঁতন পেলাম না, সংসারে কি থাকে না-থাকে আজকাল বুঝি একটু খবরও রাখো না তার? ভেবেছ দিনরাত অমন পেট ভাসিয়ে বেড়ালেই চলবে, না?'

লজ্জিত ভঙ্গিতে দেহের ওপর শাড়িখানি আর একটু টেনে দিল অপর্ণা, তার পর স্বামীকে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছি ছি ছি, মা রয়েছেন ওদিকে। কি মুখই না একখানা ক'রে তুলেছ। ভাষা শুনলে আর মনে হয় না, লেখাপড়া শিখেছ, কোন এককালে এম. এ. পর্যন্ত পড়েও ছিলে।'

পঞ্চানন বলল, 'ভাগ্যে তখন কোর্স শেষ করিনি, তাহ'লে বাকি পড়াটুকু তুমি আর কাকে পড়াতে? যা বলছি তার জবাব দাও, দাঁতন নেই কেন?'

অপর্ণা বলল, 'পেড়ে না আনলে থাকে নাকি, ফুরিয়ে যায় না? কাছেই তো নিম গাছ আছে। যাওনা, নিয়ে এসো না একটা ভাল দেখে, নাকি মেয়ে মানুষ হয়ে আমি যাব গাছে উঠতে?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে পঞ্চানন একটু হাসল, 'মেয়ে মানুষও গাছে ওঠে। কিন্তু যা একখানা অবস্থা নিজের বানিয়ে বসেছ, তাতে তোমার আর সে সাধ্য নেই।'

'ফের?'

ব'লে এবার মুখ ফিরিয়ে নিজেও একটু হাসি লুকিয়ে পূর্ণ অন্তঃসত্ত্বা অপর্ণা বাসন নিয়ে পুকুরের ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

উঠানের আর এক পাশে বেড়ার আড়ালে পঞ্চাননের মা যোগলক্ষ্মী ঘটির জলে তাঁর আড়াই বছরের নাতনী মঞ্জুশ্রীর চোখমুখ ধুইয়ে দিচ্ছিলেন। ছেলেকে একটু ধমক দিয়ে বললেন, 'বউটার সঙ্গে আবার কি খিটিমিটি স্থরু করলি, ও পঞ্চু! কদিন ধ'রেই ওর শরীর ভালো না। কাল তো ব্যথায় এমন কাতর হয়ে পড়ল, আমি ভাবি বুঝি,—'

পুত্রবধূকে বাসন নিয়ে ঘাটে যেতে দেখে বিরক্ত হয়ে তাকেও ধমক দিলেন, 'আচ্ছা বউমা, তোমার আক্কেলখানা কি, কাল যে মানুষ তুমি উঠে বসতে পার না, আজ সেই তুমিই গিয়ে নামছ ঘাটে। কেন, বাসনগুলো আমার হাতে দিলে দোষ হোত কি। না কি, তোমার সংসারে আমি কিছু করি না, দেখি না, কুটো গাছটা নেড়ে খাই না—'

যোগলক্ষ্মী ব'লে যেতে লাগলেন।

অপর্ণা নিঃশব্দে ঘাটে গিয়ে নামল। কথার জবাব দিলে কথা বাড়বে।

কাল একাদশীর পরদিন আঁশের রান্না রাঁধতে হয়েছিল ব'লে শাশুড়ী তার তিনকুল উদ্ধার করেছেন।

পুকুর ঠিক নয়। খানিকটা জায়গা থেকে মাটি তুলতে তুলতে জল উঠে গেছে। জলাশয়টি এখনো চতুষ্কোণী পুষ্করিণীর আকার নেয়নি, ত্রিকোণী পর্যন্ত হয়ে রয়েছে। আস্তে আস্তে খুব সাবধানে বাসন নিয়ে জলের কাছে গিয়ে বসল অপর্ণা।

পূব পারে আগাছার জঙ্গল, তার ভিতর থেকে বেশ বড় একটা নিমগাছ মাথা খাড়া ক'রে রয়েছে। ডালগুলি সব উঁচুতে। পাড়ার লোকেরা হাতের নাগালে যা পেয়েছে ভেঙে নিয়ে গেছে।

পঞ্চানন পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর ক'রে হাত বাড়িয়ে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। কিছুতেই নাগাল পেল না। নিজে পুরা ছ' ফুট লম্বা হ'লে কি হবে। ডালগুলি অন্ততঃ সাত আট ফুট উঁচুতে। আর স্বামীর দশা দেখে বাসন মাজতে মাজতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল অপর্ণা। শুধু সেই নাকি গাছে উঠতে পারে না। পঞ্চাননের তো আর তার মত অবস্থা নয়, কই সে উঠুক দেখি এখন। স্ত্রীর হাসি চোখে পড়ায় পঞ্চানন হাসি চেপে বলল, 'মজা দেখা হচ্ছে, না?'

তারপর দু'হাতে মোটা নিম গাছের গুঁড়িটাকে বেড় দিয়ে ধ'রে বেয়ে বেয়ে একেবারে আগ ডালে চ'লে গেল পঞ্চানন।

নাতনীকে কোলে ক'রে যোগলক্ষ্মীও ততক্ষণ পুকুরের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেখে চেঁচিয়ে বললেন, 'ও পঞ্চু, করিস কি, করিস কি, অতবড় ভারি দেহ নিয়ে আগডালে গিয়ে উঠলি, প'ড়ে মরবি নাকি, হাঁরে!'

পঞ্চানন অবশ্য প'ড়ে মরল না। ছোট বড় এক রাশ ডাল ভেঙে নিয়ে মিনিট দু'তিনের মধ্যেই গাছ থেকে নেমে এল। তারপর একখানা

ডাল ছোট ক'রে নিয়ে দাঁতন করতে সুরু করল। আজকাল বাইরের লোকজনের মত মাও বলেন, বড় আর ভারি দেহ। আগে আগে কেউ ওকথা বললে, যা রাগ করতেন, ভাবতেন চোখ লাগবে। কেবল দৈর্ঘ্যই ছ'ফুট নয়, পঞ্চাননের প্রস্থটিও ঠিক পরিমাণমত। কেবল প্রকৃতির দানের ওপর ভরসা ক'রে বসে থাকেনি পঞ্চানন, নিজের দেহকে নিজেও চেষ্টা ক'রে গড়ে তুলেছে। ছেলেবেলা থেকেই শরীরচর্চার দিকে ঝোঁক ছিল, ডন, বৈঠক, বার, বারবেল সবই ক'রে দেখেছে। আজকাল আর অত সব নেই, তবু দেহখানা আছে। তার মত ছত্রিশ বছর বয়সে অনেক বন্ধু আর সহকর্মী কুঁজো হয়ে নুয়ে পড়েছে, কিন্তু সে এখনো শক্ত, এখনো খাড়া। অবশ্য কি ক'রে যে আছে তাই আশ্চর্য। দেহের খোরাক তো নয় হাতীর খোরাক। অথচ চাকরিটি চুনোপুঁটির। সে চাকরিতে এ হাতীকে পোষা যায় না। তেমন ক'রে পুষতে গেলে মা, বউ, মেয়ে শুকিয়ে মরে। ওদের মুখের অন্ন কেড়ে খেতে হয়। ছেলেবেলায় যখন যত্ন ক'রে দেহ গড়েছিল তখন ভাবেও নি এমন সমস্যা একদিন দেখা দিতে পারে। নিজের মনেই একটু হাসল পঞ্চানন।

মেঠো পথ দিয়ে জন দুই যুবক তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে দেখে বাসনগুলি তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে অপর্ণা বাড়ির ভিতর চলে গেল। নাতনী কোলে যোগলক্ষ্মীও চলে গেলেন পিছনে পিছনে।

যুবক দুইটি পঞ্চাননকে দেখে থেমে দাঁড়াল। ফর্সাপানা চশমা-পরা আদ্দির পাঞ্জাবী-পরা ছিপছিপে ছেলেটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখুন, মিঃ সরকার এদিকটায় কোথায় থাকেন বলতে পারেন?'

পঞ্চানন বলল, 'কেন বলুন তো, কোন্ সরকারকে চাই আপনাদের?'

ছেলেটি বলল, 'ইয়ে নামটা ভুলে যাচ্ছি। এই যে সেই বেহালার ওস্তাদ, পাকিস্তান থেকে এসেছেন।'

পঞ্চানন একটু হাসল, 'ও, আমারই নাম পঞ্চানন সরকার। ওস্তাদ টোস্তাদ কিছু না ভাই, বেহালা বাজাবার সখ আছে ওই পর্যন্ত। সময় পেলে সকাল সন্ধ্যায় একটু টুংটাং করতাম। তা কি চাই আপনাদের?'

দাঁতন নিয়ে আবার দাঁত ঘষতে লাগল পঞ্চানন।

ছেলেটি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। অবাক হয়ে ভাবল, এই লোক আবার বেহালা বাজায়। ঠাট্টা করছে না তো? লুঙ্গিপরা জোয়ান কালো গুণ্ডামার্কা পাহাড়-প্রমাণ চেহারার এই লোকটির অতবড় মোটা মোটা আঙুলে সূক্ষ্ম তারযন্ত্র সত্যিই কি কোন সাড়া তোলে! আর রুচি ব'লেও কি কোন জিনিস নেই ভদ্রলোকের! তাদের সামনেই কি রকম ক'রে দাঁতন করছে দেখ। আর ডালও একটি কি রকম নিয়েছে বেছে বেছে। তার চেয়ে নিমগাছের গুঁড়ি শুদ্ধু উপড়ে নিলেই হোত।

ছেলেটি নিরুপায় হয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল, 'তাহ'লে সন্তোষ'—সন্তোষ অত সূক্ষ্মও নয়, অত সুপুরুষও নয়, বেঁটে গোছের মোটা বাইশ তেইশ বছরের যুবক। পঞ্চাননকে সে অতখানি অবিশ্বাস করল না, সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ পরিমল, ওঁকেই দাও চিঠিখানা। উনি যখন বলছেন ওঁর নামই পঞ্চানন সরকার—'

চিঠি লিখেছেন পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরের জমিদার সুরেন্দ্র মল্লিক। ভারি সখ গানবাজনায়। নিজে অবশ্য গানবাজনা জানেন না। তবে গুণীর সমাদর জানেন। একদিন শুনেছিলেন পঞ্চাননের বেহালা। সেই থেকে মনে রেখেছেন। গাঁয়ের বাড়িতে যখনই আসেন, দু'একজন গাইয়ে বাজিয়ে সঙ্গে থাকে, ডাক পড়ে পঞ্চাননের।

'কিন্তু সকাল বেলায় আমার যে অসুবিধা। ন'টার গাড়ি ধরতে হবে অফিসের জন্য, তাছাড়া বাড়িতে একটু দরকারও আছে'—চিঠি-পড়া শেষ ক'রে পঞ্চানন বিকৃত ভঙ্গি করল মুখের।

ছেলেরা বলল, ‘কিন্তু সুরেশবাবু বিশেষ ক’রে ব’লে দিয়েছেন আপনার কথা, নাম-করা সব গুণীরা এসেছেন, তিন গ্রামের লোক এসে জড়ো হয়েছে এদিকে—’

‘ও, তাই নাকি, গুণীরা এসেছেন! আচ্ছা, চলুন চলুন।’

দাঁতনটি পুকুরের পাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে নিল পঞ্চানন। ছেলে দু’টিকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে জামাকাপড় প’রে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। স্ত্রীকে বলল, ‘দাওতো আমার বেহালাটা, খুব সাবধানে এসো।’

অপর্ণা বলল, ‘সকাল বেলায় আবার বেহালা নিয়ে কোথায় চললে, খেয়ে দেয়ে অফিসে বেরুতে হবে না?’

পঞ্চানন বলল, ‘হবেই তো, বেহালাও হবে অফিসও হবে। আনো তাড়াতাড়ি।’

যোগলক্ষ্মীও একটু বাধা দিলেন, ‘কি যে তোর আক্কেল, এদিকে বউমা এমন, তুই চললি বেহালা নিয়ে, ওর একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা কিছু করতে হবে না?’

পঞ্চানন বলল, ‘ব্যবস্থা তো সব ঠিকই আছে, মা। হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে ব’লে রেখেছি। সময় হ’লেই সেখানে পাঠিয়ে দিয়ো।’

মাইলখানেক দূরে হাসপাতাল আছে একটি। পাট-কলের হাসপাতাল। ব্যবস্থাটা মজুরদের জন্য। কিন্তু বেশি টাকা দিয়ে স্থানীয় ভদ্রলোকেরাও সেখানে স্থান নেয়। পঞ্চাননও সেই বন্দোবস্তই করেছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা এখনও পাকাপাকি হয়নি। টাকার যোগাড় বাকি রয়েছে। অফিসের ম্যানেজারের কাছে কদিন ধ’রে বলছে এ্যাডভান্সের কথা। তিনি আজ দেব কাল দেব করছেন। এখনো দেন নি।

কিন্তু চণ্ডীপুরের জলসায় এসে সমস্ত দুশ্চিন্তার কথা ভুলে গেল পঞ্চানন। হুগলী জেলার এই গ্রামাঞ্চলে গানবাজনার এত যে সমঝদার আছে, তা যেন ওর ধারণা ছিল না। মল্লিকদের উঠান ভ'রে গেছে গ্রামের লোকে। হয়তো অনেকেই শুধু কৌতূহলী হয়ে এসেছে। তবু সমাবেশটা দেখবার মত। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা এ অঞ্চলের তার মত আরো কয়েকজন উদ্বাস্তু বন্ধুর সঙ্গে চোখাচোখি হোল পঞ্চাননের। তারা কাছে ডেকে বলল, 'মান রাখা চাই।'

পঞ্চানন বলল, 'মান সম্মান বুঝিনে ভাই, বাজিয়ে আনন্দ পাই তাই বাজাই। কারো যদি ভালো লাগে আরো লাভ।'

পঞ্চাননের সময় নেই শুনে দু'একটি কণ্ঠসঙ্গীতের পর সুরেনবাবু তাকে বাজাতে অনুরোধ করলেন। সন্তোষ আর পরিমলের মত উপস্থিত অনেক শ্রোতাই তার স্থূলদর্শন চেহারার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। কিন্তু তারে ছড়ি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠল। তাদের কানের পরিতৃপ্তি চোখের পীড়াকে দূর করেছে।

পুরো এক ঘণ্টা বাজাবার পর মুগ্ধ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে স্মিতমুখে জোড় হাতে নমস্কার জানাল পঞ্চানন, বলল, 'এবার বিদায় দিন।'

পরিচিত আরো দু'একজন শিল্পী তাকে আরো বাজাতে অনুরোধ করলেন। কেউ কেউ আমন্ত্রণ জানালেন তাঁদের বাড়ীতে। সুরেনবাবু প্রসন্ন মুখে বললেন, 'আপনি এখান থেকেই তো খেয়ে দেয়ে গাড়ি ধরতে পারতেন, স্টেশন এখান থেকে অনেক কাছে হবে।'

পঞ্চানন বলল, 'বাড়িতে কাজ আছে।'

বাড়িতে কাজ আছে। অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ। জলসা থেকে আজ আর তার উঠতে ইচ্ছা করছিল না। নিজের বেহালা সবদিন তো

আর নিজের ইচ্ছামত বাজে না। আজ বেজেছিল। সুরের ইন্দ্রজালে তার শুধু নিজের স্থূল দেহ নয়, গোটা স্থূল জগৎটাই ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। ফের আবার তা জেগে উঠেছে। নির্মল নীলাভ জলের ভিতর থেকে ফের মাথা চাড়া দিয়ে তার বিশ্রী হিংস্র দাঁতগুলি বের করেছে কুদর্শন কুমীরটা।

পঞ্চাননের ভালো লাগে না সংসার। সংসারের পক্ষে সে অপটু বেমানান সাব্যস্ত হয়ে গেছে। ছত্রিশ বছর হ'তে চলল বয়স। কিন্তু এর মধ্যে কোন এক জায়গায় কোন একটা স্থায়ী চাকরিতে কায়েমী হয়ে বসতে পারল না সে। রোজগারটা ভদ্রজনেব মত হোল না। নিজের হাতে দু' পয়সা জমবে দূরে থাক, বয়সের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ধারের মাত্রাটা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। স্থির হয়ে কোথাও এক জায়গায় টিকে থাকতে পারেনি। ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, দেশী বিদেশী মার্চেণ্ট অফিস—ঢুঁ না মেরেছে সে এমন জায়গা নেই। কিন্তু কোথাও নিজেকে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে নি। তার এই বিপুল স্থূল দেহের হিংসা স্থূল প্রচণ্ড ক্রোধ অনেক সময় বাদ সেধেছে। বনিবনাও হয়নি মালিকের সঙ্গে, ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে। গেছে চাকরি। আবার কখনো বা টেনেছে এই সূক্ষ্ম তারযন্ত্র। তারে তারে জড়িয়েছে তারে। সুরের জালে একেবারে মুড়ে ফেলেছে। নিয়মিত অফিস যেতে দেয়নি, অফিসের কাজে মন দিতে দেয়নি, কোন যোগ্যতা অর্পণ করতে দেয়নি তাকে। গেছে চাকরি। তা যাক, তবু বেহালাটি আছে। এক চাকরি যায় আবার হয়। কিন্তু বেহালাটি গেলে আর হবে না। নিজের মন থেকে সুরবোধ, সুরের পিপাসা যদি একবার চলে যায়, আর তা ফিরে আসবে না। বেহালাটির দিকে পরম স্নেহে তাকাল পঞ্চানন। অনেক পুরনো, অনেক দামী বেহালা তার। লক্ষ্ণৌ থেকে তখন চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনে এনেছিল। 'এখন এর দাম—' বেহালাটির দিকে তাকিয়ে

সস্নেহে মৃদু হাসল পঞ্চানন, 'এখন আর তোর দাম নেই। তুই অমূল্য।'

মাঠ পেরিয়ে গাঁ। দু'দিকে ঝোপঝাড়। কলাগাছের সারির আড়ালে গৃহস্থ বাড়ি। একটি সুন্দরী বধূ জলের কলসী কাঁখে তাকে দেখে মাথায় আঁচল আরো দীর্ঘ ক'রে টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকল। চোখ ফিরিয়ে নিল পঞ্চানন। তবু আর একটি বধূ তার চোখের সামনে থেকে নড়ছে না। অপর্ণা। যে গেল, অনেকটা তারই মত দেখতে অপর্ণা। ভারি নরম আর সুকুমার তনু দেহ ওর। তবে বাঙালী মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। পঞ্চানন স্ত্রীকে বলে, 'ভালোই হয়েছে। এর চেয়ে এক ইঞ্চি খাটো হ'লে তোমাকে চুমু খেতে গিয়ে আমাকে হাঁটু গাড়তে হোত। কিংবা ছোট মেয়ের মত তুলে নিতে হোত কোলে।'

অপর্ণা লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'ছি ছি ছি, তোমার মুখের কি কোন আগল নেই? ও-সব কথা কি লোকে মুখে বলে?'

পঞ্চানন হেসে বলেছে, 'কাজের বেলায় দোষ নেই, শুধু মুখের বলায় দোষ বুঝি? এসো তাহ'লে কাজেই'—আচমকা দু' হাতে পঞ্চানন স্ত্রীকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে, 'কিন্তু এত নরম তুমি, সাধ মিটিয়ে তোমাকে যে ভালো ক'রে একটু এমব্রেস করব তারও জো নেই। কেবলই ভয় হয়, আমার চাপে তুমি মরে যাবে।'

অপর্ণা স্বামীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জবাব দিয়েছে, 'তোমার চাপে মরব না, মরি তো তোমার বেহালার চাপে মরব। বেহালা আমার সতীন।'

'সতীন!'

হঠাৎ যেন তাল কেটে গেছে, তার ছিঁড়ে গেছে পঞ্চাননের। ইচ্ছা করেছে প্রচণ্ড শক্তিতে অপর্ণাকে বহু দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু তা করেনি। আস্তে আস্তেই ছেড়ে দিয়েছে।

বেহালা ওর সতীন। এ কেবল অপর্ণার মুখের কথা নয়, মনের বিশ্বাস। ওই ছোট একটা বেহালার জন্যই এত বড় দেহ, আর এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়েও পঞ্চানন জীবনে কিছু ক'রে উঠতে পারল না, হয়তো কোন দিন পারবেও না। অপর্ণা তার সংসারে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা টের পেয়েছে। আর ওর মনের কথা টের পেয়েছে পঞ্চানন।

অপর্ণা কেন, সে নিজে আরো অনেক আগে নিজেকে বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাবার কথায় কান দেয়নি, মার কথায় কান দেয়নি, পা দেয়নি সংসারের ফাঁদে। কেবল ঘু'রে ঘু'রে বেড়িয়েছে এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে সেখানে। টহল দিয়ে ফিরেছে সারা আর্যাবর্ত। চড়াই উৎরাইতে মাঝে মাঝে দু'একবার পদস্খলন যে না হয়েছে পঞ্চাননের তা নয়। কিন্তু কোথাও একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েনি। ফের উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ত্রিশ পেরিয়ে পা কাটল শেষে গাঁয়ের পচা শামুকে। পাশের গাঁয়ের ভুবন রক্ষিতের ছোট মেয়ে অপর্ণা। ভুবনবাবু শুধু পঞ্চাননদের এম. ই. স্কুলের অঙ্কের মাষ্টারই নন, প্রথম তবলার চাঁটিও তাঁর কাছে শেখা। তিব্বতের সীমান্ত থেকে ফিরে এসে পঞ্চানন বেড়াতে গেছে তাঁর ওখানে, অপর্ণা এল চা আর জলখাবার নিয়ে। পরম উৎসাহে দেশবিদেশের ভূগোল বর্ণনা করছিল পঞ্চানন, কিন্তু কোথায় যেন একটু গোল বাঁধল। একটু এল অন্যমনস্কতা। আর ঝানু মাস্টারমশাই তা বুঝতে পেরে ছাত্রের হাত চেপে ধরলেন, বললেন, 'আমাকে উদ্ধার কর, ওকে তুমি নাও। একেবারে অযোগ্য হবে না তোমার। পড়াশুনোও কিছু শিখেছে, ম্যাট্রিক পাশ করেছে গেল বছর। ঘরের কাজকর্ম রান্নাবান্না সেলাই-ফোঁড়া সেবা-শুশ্রূষা সব জানে।'

না, করতে পারল না পঞ্চানন। সাক্ষাৎ সুরশ্রী মালশ্রীর মূর্তি।

সে মূর্তি দেখে চোখ মুগ্ধ হোল। কিন্তু মোহ ভাঙল পরে। ওকে ঘরে আনার পরে। পঞ্চানন দেখল সুর ওর মূর্তির মধ্যে আছে, মনের মধ্যে নেই। সুর ওর গলায় নেই আঙুলে নেই, সে জন্ম দুঃখ ছিল। কিন্তু মনের গুণ-গুণানি মরল কি ক'রে! অতবড় সুরজ্ঞ রসজ্ঞের কন্যা এমন বেসুরা অসুরা কি ক'রে হোল!

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোগলক্ষ্মী বকে উঠলেন, 'আচ্ছা পঞ্চু, তোর কি জন্মেও কোন আক্কেল বুদ্ধি হবে না। তখন পই পই ক'রে বললাম, বেরোসনি, বেরোসনি। বউটার যখন এই অবস্থা, আজ আর কোথাও গিয়ে দরকার নেই তোর। এখন এসব সামলাবে কে? ও তো খুবই কাতর হয়ে পড়ল।'

শেষ কথাটায় উদ্বেগের সুর লাগল।

পঞ্চানন একটু কাল বিভ্রান্ত হয়ে থেকে বিকৃত মুখে রূঢ়স্বরে বলল, 'কাতর হয়ে পড়ল! কাতর হবার আর সময় পেল না ও! এই মাসের শেষে আমি এখন কি দিয়ে কি করি? আমি নিজেই কি কম কাতর নাকি।'

কিন্তু কাতর হ'লেও পুরুষকে ব্যবস্থা করতে হয়। সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে হয় পূর্ণগর্ভা স্ত্রীর। একটু দূরে একটা গঞ্জের মত আছে, সেখানে ঘোড়ার গাড়ি মেলে। বেহালাটা মাটির দেওয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল পঞ্চানন। মঞ্জু ঠাকুরমার কোল থেকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল, 'বাবা, মালা। মালা দাও।'

তাই তো। জলসার বেলফুলের মালাটা তো গেলাতেই রয়ে গেছে। খেয়ালই ছিল না। এমন মাল্যবান হয়ে বেরুলে তো ভারি হাস্যকর হোত। মেয়ের ওপর একটু কৃতজ্ঞ বোধ করল পঞ্চানন। হেসে নিজের গলার মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরুল।

মাইল খানেক পথ। কিন্তু আড়াই টাকার কমে যাবে না ঘোড়ার গাড়ি। এদিকে আড়াই টাকা গাড়ির পিছনে ব্যয় করতে গেলে পকেট প্রায় খালি হয়ে যায়। তবু গাড়ি না নিয়ে উপায় নেই।

হাসপাতালের কাছাকাছি এসে আরো নরম হয়ে পড়ল অপর্ণা। ওর মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠল।

হাত ধ'রে স্ত্রীকে গাড়ির ভিতর থেকে নামাল পঞ্চানন। তারপর একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'এসো। এই তো প্রথম নয়। নিজের শরীরের অবস্থা নিজে যদি বুঝে না বলতে পার তো আমি কি করব। একটা কি দুটো দিন আগেও যদি বলতে এত তাড়াতাড়ি এসব হবে তাহ'লে আমি টাকার ব্যবস্থা যেভাবে পারি ক'রে রাখতাম। এখন কি করি বলতো।'

অপর্ণা এর জবাবে শুধু ক্লিষ্ট মুখে স্বামীর দিকে তাকালো, কথা বলবার শক্তি তার ছিলনা, বোধ হয় ইচ্ছাও নয়।

•

নিম্নশ্রেণীর কুলি মজুরের দল ওষুধের শিশি হাতে আসছে যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা বোধ করল পঞ্চানন। ওদের যা গতি তারও আজ সেই গতি। ফর্সা একটা জামা পঞ্চানন প'রে আসতে পেরেছে, এই যা পার্থক্য। সে জামার গোটা তিনেক পকেট আছে বটে। কিন্তু তিন পকেট ঝাড়লেও পুরো একটা টাকা বেরুবে না।

স্যুট-পরা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর একজন মজুরকে তার বোকামি আর বেয়াদপির জন্য বকছিলেন।

স্ত্রীকে নিয়ে পঞ্চানন এসে তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি একটু হাসলেন, 'এই যে।'

আগেই মুখ চেনা ছিল ভদ্রলোকের সঙ্গে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'আজই ভর্তি ক'রে দেবেন নাকি ?'

পঞ্চানন বলল, 'সেইজন্য তো এসেছি। কিন্তু দেখুন একটু মুসকিলে পড়ে গেছি।'

সত্যিকারের মুসকিলের বিবরণ শুনে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মুখ গম্ভীর হোল। তিনি বললেন, 'অর্ধেক টাকা এ্যাডভান্স দিতে হয়, তাই নিয়ম এখানে। আপনি সব না পারেন গোটা দশেক টাকা দিয়ে যান।'

পঞ্চানন একটু বিনীত ভঙ্গিতে হাসল, 'এই মুহূর্তে তাও ঠিক পেরে উঠছিনে শ্রীপতি বাবু। আপনি এখনকার মত ভর্তি ক'রে নিন মিঃ সেন, আমি অফিস থেকে ফিরে এসে আজই সব ব্যবস্থা করব।'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'আপনারা এমন false position-এ ফেলেন, আর এত undue advantage নিতে চান যে তা শুনে আমাদের নিজেদেরই লজ্জা করে। অথচ আপনারা লেখাপড়া শিখেছেন। ভদ্রলোক। আপনারাও যদি এমন করেন তাহ'লে কুলি মজুরদের সঙ্গে আপনাদের পার্থক্য রইল কি।' তিরস্কারের ভঙ্গিতে ভিতরে ভিতরে বেশ একটু অপমানিত বোধ করল পঞ্চানন। মুখের আর বাহুর পেশীগুলি আপনা-আপনিই শক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু আত্মসংবরণ ক'রে ফের পঞ্চানন সবিনয়ে হাসল, 'আজ্ঞে, কতকগুলি circumstance-এর জন্যই এমন হয়ে পড়ল। আমি অবশ্য বিকালে ফিরে এসেই—'

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'বেশ ওঁকে নিয়ে এসে যখন পড়েছেন, ব্যবস্থা একটা করাই যাবে। কিন্তু কথা যেন ঠিক থাকে।' নার্সকে ডেকে কি সব নির্দেশ দিলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

স্ত্রীকে কোন রকমে ওঁদের হাতে গছিয়ে দিয়ে পঞ্চানন ফিরে এলো। কিন্তু মনের মধ্যে কি রকমের একটা অস্বস্তি লেগেই রইল। সুবিধা পেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বেশ কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিলেন। অপর্ণার জন্যই এমনটা হোল। ও যদি আর একটু হিসেবী হোত, ক'টা দিন

মহাসমুদ্র বার বার ফুলে ফুলে উঠছে। শুধু সমুদ্র নয়, সমুদ্র সৈকতের বাসিন্দাটিও আজ বড় অস্থির অশান্ত। কোন্ এক ব্যাঙ্কের সঙ্গে ফোনে অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে আলাপ করছিল স্মরজিৎ। তার ঘনকৃষ্ণ যুগল-ভ্রু বার বার কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল, 'further security ছাড়া O D বন্ধ? বেশ।'

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সশব্দে ফোন নামিয়ে রাখল স্মরজিৎ। তারপর মূল্যবান কলমের স্বর্ণচূড়া তার সুন্দর সুগঠিত দাঁতে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কামড়াতে লাগল। মিনিট কয়েক ধ'রে পঞ্চানন যে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই।

পঞ্চানন একবার ডাকল, 'স্মরজিৎ বাবু।'

স্মরজিৎ একটু চমকে উঠে মুখ তুলল, তারপর কলমটা টেবিলে রেখে নিজেকে সামলে নিয়ে পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বলল, 'ও আপনি, বসুন।'

পঞ্চানন স্মরজিতের সামনের চেয়ারে বসল। দুই বিপরীত আকৃতি-প্রকৃতির পুরুষ পরস্পরের দিকে একবার নিঃশব্দে তাকাল।

পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি বয়স হবে না স্মরজিতের। বেশ সুপুরুষের চেহারা। ফর্সা রঙ, উন্নত সুগঠিত দেহ। রক্তাভ পাতলা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ নাক, আয়ত চোখ—সব মিলিয়ে ভারি মিষ্টি মুখের ডৌলটি, কোথায় যেন একটি অপর্ণার মুখের আদল আসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননের মনে পড়ল, অপর্ণা আর সে অপর্ণা নেই। ওর চেহারা ভারি খারাপ হয়ে গেছে। ভেঙে-চুরে যেন শুকিয়ে গেছে মুখ। শুকোবে না কেন। ওর এ অবস্থায়ও তো একটু ভালো, পুষ্টিকর কোন খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারেনি পঞ্চানন, দিতে পারেনি একটু বিশ্রাম!

'এতক্ষণে আপনার অফিসে আসবার সময় হোল!'

স্মরজিতের গলা শুনে চমকে উঠল পঞ্চানন, বলল, 'আমি আজ বড় বিব্রত আছি স্মরজিৎ বাবু।'

স্মরজিৎ বলল, 'প্রায় রোজই তো এই কথা শুনি। আপনাকে বিব্রত ছাড়া কবেই বা দেখলুম।'

ঠিক এই ভঙ্গিতে এর আগে স্মরজিৎ কোন দিন তার সঙ্গে কথা বলেনি। পঞ্চাননের বিশাল রোমশ বুক ভেদ ক'রে একটা তীব্র শাণিত তীর যেন মর্মস্থলে বিদ্ধ হোল। গভীর বেদনায় উত্তাল হোল আবেগের সমুদ্র। 'তাই বটে! তাই বটে! আমি বিচ্যুত, ব্রতচ্যুতই বটে!'

স্মরজিৎ বলল, 'তাছাড়া কুণ্ডু কোম্পানীর কাছ থেকে কমপ্লেন এসেছে—ওঁদের ফাইলটা তো আপনিই ডিল করছেন?'

পঞ্চানন বলল, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

স্মরজিৎ কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল, 'ঠিক পার্টির ডিরেকসন অনুযায়ী আপনি কপি তৈরি করেন নি।'

পঞ্চানন বলল, 'ভেবেছিলাম আমাদের সাজেসানটাই ভালো তার চেয়ে; কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করবার মত আমার মনের অবস্থা এখন নয়, স্মরজিৎবাবু। আমি বড় বিপদের মধ্যে আছি।'

স্মরজিৎ বলল, 'আমিও খুব সম্পদের মধ্যে আছি তা ভাববেন না। তবু অফিসে বসে অফিসের আলোচনা, অফিসের চিন্তাই আমাকে করতে হয়। বলুন, কি বলবার আছে আপনার, বলুন। বেশি সময় নেই আমার, কাজ আছে।'

পঞ্চানন বলল, 'আমার টেবিলেও কাজ পড়ে রয়েছে। আমিও এক্ষুনি যাব। কিন্তু আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।'

স্মরজিৎ বলল, 'টাকা, আপনি তো এমাসের অর্ধেক টাকা ওমাসেই অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন।'

পঞ্চানন বলল, 'তা নিয়েছিলাম ; কিন্তু বাকী টাকাটা আমার আজই চাই। গোটা চল্লিশ টাকা হলেই চলবে।'

তারপর এই অবিবাহিত যুবকের সামনে একটু ইতস্তত: ক'রে কথাটা বলেই ফেলল পঞ্চানন, 'তাকে আজ হাসপাতালে দিতে হয়েছে। গতবার ডেলিভারীর সময় ভারি কষ্ট পেয়েছিল। প্রাণ-সংশয় হয়েছিল প্রায়। এবারও কি হয় বলা যায় না। টাকাটা নিয়ে আমি আজ সকাল সকালই বাড়ি চলে যাব।'

স্মরজিৎ বলল, 'তা কাজকর্ম সেরে সকাল সকাল যেতে চান, যেতে পারেন ; কিন্তু টাকা দেওয়া আজ সম্ভব নয়।'

'সম্ভব নয় ?'

পঞ্চাননের মুখে আর্তনাদের মত শোনাল কথাটা।

স্মরজিৎ বলল, 'না। আপনি তবু কিছু অ্যাডভান্স নিয়েছেন। কিন্তু স্টাফের অনেকেই আজ পর্যন্ত এক পয়সাও পায় নি, তা-ও আপনি জানেন।'

হঠাৎ একটা অদ্ভুত, অশোভন প্রশ্ন বেরিয়ে পড়ল পঞ্চাননের মুখ থেকে, 'কেন পায় নি ? আজ বিশ তারিখে এসেও কেন ও মাসের মাইনে পেল না তারা ?'

শুধু তার কথা নয়, তাদের কথা।

স্মরজিৎ তীব্রদৃষ্টিতে মুহূর্তকাল পঞ্চাননের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'আপনার এ প্রশ্নের অধিকার নেই পঞ্চাননবাবু। এ প্রশ্নের জবাব অন্তত: আমি আপনাকে দেব না। কেন পেল না, তার নিশ্চয়ই হেতু আছে। তা ডিরেকটর বোর্ড জানেন, ম্যানেজিং ডিরেকটর জানেন। আমাকেও তা জানতে হয়। কিন্তু সে কথা আপনার জানবার কথা নয়, পঞ্চাননবাবু। আপনি যেটুকু নিয়ে আছেন, সেটুকু নিয়ে থাকুন।

জটিল, বড় জটিল অর্থনীতির মারপ্যাচ। তুনিয়াটা আপনার বেহালা নয়।'

তীব্র ঝঙ্কার লাগল তারে তারে। তার যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বেহালা নয়, সারা তুনিয়াটা বেহালা নয়। কিন্তু কেন নয়! কেন তুনিয়াটা বেহালা হয়ে ওঠে না, বেহালার মত বেজে ওঠে না! বেহালার তারকে যে নীতিহীন অর্থনীতির জট এমন ক'রে জড়ায়, তা কেন টেনে ছিঁড়ে উপড়ে ফেলা হয় না!

প্রচণ্ড ক্রোধে, তীব্র আক্রোশে হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পঞ্চানন। সে তো কেবল সুরশিল্পী নয়, সে অসুরও। দেহে তার আসুরিক শক্তি। সেই শক্তি দিয়ে কি ভেঙে ফেলা যায় না কুটিল তুনিয়ার এই জটিল প্রতীককে! টুকরো টুকরো ক'রে ফেলা যায় না সেই জটিল ব্যবস্থার,—পরম অব্যবস্থার প্রতিহার এই আপাত-মনোরম পুতুলকে।

অপর্ণাকে যেমন আলিঙ্গন ক'রে ধরে পঞ্চানন তেমনি ক'রে ওর বিশাল বলিষ্ঠ বুকের ওপর অপর্ণারই মত সুকুমার, তনুদেহধারী, রূপবান, লাবণ্যবান এই স্মরজিৎকে ঠিক তেমনি ক'রে চেপে ধরতে ইচ্ছা করল। কিন্তু এ পেষণ সে পেষণ নয়; প্রেমের পেষণ নয়, প্যাসনের পেষণ নয়, এ নিষ্পেষণে হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

স্মরজিৎ চেয়ারে স্থির হয়ে বসে রইল। বেল রয়েছে হাতের কাছে টিপলেই হয়, ফোন রয়েছে হাতের কাছে, রিসিভারটা তুলে নিলেই হয়। কিন্তু স্মরজিৎ তা তুলল না। তার প্রয়োজন নেই। সে জানে ঐ দৈত্য আর এগুবে না। এ দৈত্য সে দৈত্য নয়। সামনের দেয়ালে কাগজে আঁকা সমুদ্রের মত ওর মধ্যেও শুধু ইচ্ছার রঙ্গ, কর্মের তরঙ্গ নেই।

বরং স্মরজিৎ পরম সৌজন্যে মৃত্তু হাসল, 'বসুন পঞ্চাননবাবু। আপনি মিছামিছি ধৈর্য হারাচ্ছেন। যদি কিছু করা সম্ভব হোত, আমি নিশ্চয়ই

করতাম। দেখুন আর কি, এক স্ত্রী, এক সংসারই আপনি আগলে উঠতে পারছেন না, আর এই বিরাট অগোছাল অফিসটা কী কষ্টে আমাকে সামলাতে হচ্ছে। আমার কথাটাও একবার ভেবে দেখুন, প্লিজ ফিল ফর মি।'

পঞ্চানন আর কোন কথা না ব'লে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। সামনে টেনে নিল কুণ্ডু কোম্পানীর ফাইলটা। কিন্তু আজও কাজে মন লাগল না।

সহকর্মী শচীন জিজ্ঞাসা করল, 'কি দাদা, কিছু সুবিধা হোল ?'

পঞ্চানন মাথা নাড়ল।

পাশের টেবিল থেকে সৌরেন বলল, 'আমিও চেষ্টা করেছিলাম। হয় নি।'

পঞ্চানন ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল। সৌরেনের মুখও বিষণ্ণ, উদ্বিগ্ন। কেবল সৌরেনের নয়, আশেপাশের আরো অনেকের। পঞ্চাননের মনে হোল, ওদের প্রত্যেকের ঘরেই কি আছে প্রসববেদনাতুরা গর্ভিনী স্ত্রী ? খানিকক্ষণ আগে যে চোখে আগুন জ্বলেছিল, তা হঠাৎ জলে ভরে গেল। সেই বাষ্পাকুল চোখে ওদের মুখে মুখে আজ নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখল পঞ্চানন।

কেন এমন হয়। ফাইল খুলে রেখে পঞ্চানন ভাবতে লাগল, কেন এমন হয়। কেন সারা দুনিয়াটা বেহালা হয়ে ওঠে না। এক সুরে, এক ঝঙ্কারে বাজে না কেন সকলের হৃদযন্ত্রী। অর্থের ভেদ, অবস্থার ভেদ তো সে এতদিন স্বীকার করে নি। পঞ্চানন ভেবেছে, ভেদ শুধু একই রকমের আছে—সুর আর অসুরে, রসিক আর অরসিকে। অর্থের কথা অবান্তর। কিন্তু আজ মনে হলো, তা তো নয়, তা তো নয়। অর্থই পরম অন্তরায়, অর্থই ভেদ অঘটন ঘটায়, ভেদ ঘটায় ভাবার্থের।

একটু বাদে পঞ্চানন বলল, 'সকলে মিলে একটা জয়েণ্ট পিটিশন দিন জাহ্নবীবাবু।'

সুবিমল বলল, 'সেই কথাই ভাবছি। আপনি বরং ফাইলটা রেখে যান। এ্যাকশন যা হয় আমরা নেব। আপনি যান চলে।'

চলে তো যাবে, কিন্তু খালি হাতে গিয়ে করবে কি সেখানে—অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে পঞ্চানন ভাবল। সহকর্মীদের কারো কাছে ধার মিলবে না। ওদেরও সবাইর হাত খালি। দু'চার পাঁচ টাকা পঞ্চাননের কাছে প্রায় প্রত্যেকেই পাবে। তা শোধ না দিতে পেরে আজ ভারি লজ্জা বোধ করল পঞ্চানন। না জানি ওদেরও কত কষ্ট হচ্ছে! বন্ধুবান্ধবের কাছে আর যেতে ইচ্ছা করল না। গিয়ে লাভ নেই। তারা অনেকেই উত্তমর্ণ। এই মাসের শেষে কোন্ মুখে ফের আবার গিয়ে তাদের কাছে হাত পাতবে। তার চেয়ে বাড়িই যাক্। মার কাছে কিছু যদি থেকে থাকে। এর আগে মা একবার সব মুসকিলের আসান করেছিলেন।

কিন্তু ছেলের প্রস্তাব শুনে যোগলক্ষ্মীও এবার মাথা নাড়লেন, 'বলিস কি তুই! ব্যাটা ছেলে হয়ে তুই সহর থেকে টাকা আনতে পারলিনে। আর আমি করব টাকার যোগাড়! ঘরের মধ্যে কি আমি টাকার গাছ পুঁতেছি? আমার যা ছিল, তা তো সবই তুই নিয়ে সেরেছিস। এবার আমাকে খা।'

কথাটা ঠিক। একেকবার দেশ-সফরে বেরিয়েছে পঞ্চানন, আর বিশ-পঁচিশ যা যখন পেরেছে কেড়েকুড়ে নিয়েছে মার কাছ থেকে। তখন কোন বিচার-বিবেচনার পরিচয় দেয় নি। এখন মা কি করবেন!

ঘরের মধ্যে গিয়ে চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলাল পঞ্চানন। বিক্রী বন্ধকের মত তৈজসপত্র কোথাও চোখে পড়ল না। তক্তপোষের তলায় একটা ট্রাঙ্ক শুধু আছে। সে ট্রাঙ্কে অপর্ণার দু-তিনখানা পুরোনো শাড়ী, আর ওর গরীব মাস্টার-বাপের দেওয়া অল্প সোনার খানকয়েক গয়না। তা ছোঁবে না

পঞ্চানন, অপর্ণার কিছুও ছোঁবে না। দেয়ালে ঝুলানো বেহালাটার দিকে চোখ পড়ল পঞ্চাননের। তার বেহালাকে যে সতীন বলেছে, শত্রু বলেছে, তার কোন জিনিস ছোঁবে না। কিন্তু কেবল কি অপর্ণাই বলেছে ও কথা? অপর্ণার মত সুকুমারদেহ, সুকুমারমতি তার আর এক গুণমুগ্ধ অনুরাগীর মুখেও তো আজ ওই একই বিদ্রূপ রূপ পেয়েছে—'দুনিয়াটা বেহালা নয়।'

হঠাৎ ছোঁ মেরে বেহালাটা হুক থেকে তুলে নিল পঞ্চানন। তারে একটু ঝঙ্কার লাগল। কোন্ তারে কে বলবে? কিন্তু সে ঝঙ্কার কানে নিল না পঞ্চানন, কানে আঙুল দিল।

পাড়ার মল্লিক বাড়ি গেল, চৌধুরী বাড়ি। কিন্তু সবাই মাথা নাড়ল। ও জিনিস দিয়ে তারা কি করবে। সবাইর হাতে তো বেহালা বাজে না।

চৌধুরীদের ভাগচাষী ধনঞ্জয় মণ্ডল ছোট কর্তার জন্য তামাক সাজতে সাজতে দুজনের কথাবার্তা একমনে শুনছিল। কর্তাকে হুঁকো এগিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে এল পঞ্চাননের পায়ে পায়ে। পথে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তারপর নীচু গলায় ফিস ফিস করে বলল, 'বলছেন কি, পালোয়ানবাবু, অমন দামী জিনিসটা আপনি বেচে দিবেন। সাধের জিনিস, সখের জিনিস কেউ কি বেচে?'

পঞ্চানন ওর মনের ভাব টের পেয়েছে, বিরস মুখে বলল, 'অত কথায় কাজ কি! তুই নিবি নাকি?'

ধনঞ্জয় পরম বিস্ময়ে আধ হাতখানেক জিভ বার করল, 'কি যে বলেন! আপনার জিনিস আমি নিতে পারি! নেওয়ার সাধ্য আছে?'

পঞ্চানন তাড়া দিল, 'তা'হলে, যা পালা।'

কিন্তু ধনঞ্জয় পালাল না, ফের এল পিছনে পিছনে। বলল, 'তবে আপনি যদি দিয়ে দেন তো নিই।'

পঞ্চানন বলল, ‘বিনা দামে?’

ধনঞ্জয় বলল, ‘একেবারে বিনা দামে নয়, আমি যা পারি তা দেব। কত চান আপনি?’

পঞ্চানন বলল, ‘আমি যা চাই, তা তুই দিতে পারবিনে। গোটা পঁচিশেক টাকা পারবি দিতে? এর নতুন দাম ছিল—সে কথা ব’লে আর কি হবে। এখন আর এর কোন দাম নেই। ওরে অপর্ণার সতীন, দুনিয়ার শত্রু, তোর কোন দাম নেই আর। সারা দুনিয়াটা যখন তোর হবে তখনই তোর দাম।’

ধনঞ্জয় বলল, ‘না পালোয়ানবাবু, অত দিতে পারি না। কুড়ি টাকায় তো দেবেন না, একুশ টাকায় ছেড়ে দিন আমাকে। আচ্ছা, আপনার কথাও থাকুক, আমার কথাও থাকুক। ওই বাইশ। তার বেশি পারব না পালোয়ানবাবু। কোত্থেকে পারব। বউটা মারা গেছে। ওর খোরাকীর ধানটা বিক্রি ক’রে দিলাম। সেই ক’টা টাকাই হাতে আছে। ভাবছিলাম তাই নিয়ে বিবাগী হয়ে কোথাও চলে যাই। পুরানো সারিন্দাটাও কদিন আগে গেল। চলে যাই যে দিকে দু’চোখ যায়।’

পঞ্চানন বলল, ‘বেশ তো যাবি।’

ধনঞ্জয় বলল, ‘না দাদাবাবু, যাবো আর কোথায়, বাড়িঘর হাল লাঙল ছেড়ে। ভাবলাম, আপনার বেহালাটা যদি পাই তা’হলে তো ঘরে বসেই বিবাগী হতে পারি। বেহালাটা দিন আমাকে, দাদাবাবু। এত দর আর পাবেন না।’

‘ও জিনিসের আদর কি সবাই জানে?’

পঞ্চানন একটু কি ভাবল, তারপর বলল, ‘আচ্ছা তুই নে। তোর ঘরেই থাক। যার ঘরে বউ থাকে না, তার ঘরেই বেহালা থাকা ভালো!’

টাকা নিয়ে সেই রাত্রেই হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করল পঞ্চানন।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মেজাজটা এখন একটু ভালো। মৃদু হেসে বললেন, 'অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার ছিল কি? যা হোক এসেছেন ভালোই করেছেন। A good news for you. ছেলে হয়েছে আপনার।'

খুব সুখ-প্রসব হয়নি অপর্ণার। স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় সেবারের মত কষ্ট পেয়েছে। শেষপর্যন্ত ফরসেপ্-বাহন হয়ে বেরিয়েছে নবজাতক। ডাক্তারেরা দু'টির জন্যই উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেকথাও জানালেন। তারপর বললেন, 'যদিও নিয়ম নেই, তবু আমার নাম ক'রে এখনই আপনি দেখে যেতে পারেন।'

পঞ্চানন সজোরে মাথা নাড়ল, 'না, দেখে আর আমার দরকার নেই।'

দিন তিনেক পরে শীর্ণ দুর্বল দেহে ছেলে নিয়ে ফিরল অর্পণা। মার স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় ছেলেটাও ভারি রোগা হয়েছে। পঞ্চাননের ছেলে ব'লে চেনাই যায় না। চেনা না যাওয়াই ভালো—পঞ্চানন মনে মনে ভাবল।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই চৌকাঠের কাছে থমকে দাঁড়াল অপর্ণা, দেয়ালের খালি হুকটা ওর চোখে পড়েছে, ভীত ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'তোমার বেহালা কোথায়!'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল পঞ্চানন, তারপর বলল, 'বেহালা নেই।'

অপর্ণা বলিল, 'সে কি!'

আশ্চর্য এ ঝঙ্কার, এত ঝঙ্কার এর আগে কোথায় ছিল!

যোগলক্ষ্মী নাতনী নিয়ে পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। অপর্ণাদের আসার খবর পাননি এখনো। লোক পাঠান হয়েছে। এখনই এসে পড়বেন।

ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো রোগা ছেলেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে, নিঃশব্দে ছলছল চোখে অপর্ণা স্বামীর দিকে তাকাল।

মাটিতে নামানোমাত্র কদাকার ছেলেটা চেঁচাতে স্বরু করেছে। উঃ, ওই শুকনো গলায় কি চেঁচাতেই না পারে!

বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাল পঞ্চানন।

ছেলে কেঁদেই চলেছে।

চেয়ে চেয়ে বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল পঞ্চাননের।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সে এবার শান্ত কোমল কণ্ঠে বলল, 'এমন পড়ন্ত বিকালে বেহালায় তো এখন পূরবীর স্বর বাজবে অপর্ণা। এই অসময়ে এমন খাম্বাজী আওয়াজ ও পেল কোথায়!'

পালঙ্ক

পোস্ট অফিস থেকে মকবুলই হাতে ক'রে নিয়ে এল এনভেলপের চিঠিখানা। ছোট ডিঙি নৌকায় ক'রে চৌধুরী-বাড়িতে সে দুধের যোগান দিতে গিয়েছিল। সেই বাড়িতেই গাঁয়ের পোস্ট অফিস, আসবার সময় পোস্টমাস্টার তার হাতেই রাজমোহন রায়ের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রশস্ত উঠানে কোণাকুণিভাবে বাঁশের আড় টানানো। সেই আড়ে ঝি আর চাকরের সাহায্যে নিজের হাতে ভিজে পাট মেলে দিচ্ছিলেন রাজমোহন। চিঠির দশা দেখে আগুন হয়ে উঠলেন, 'হারামজাদা, এ করছিস কি!'

মকবুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্যান, কি হইছে ধলাকর্তা?'

রাজমোহন ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হইছে! ছ্যাখ, চাইয়া ছ্যাখ দেখি চিঠিখানার দিকে। বলি, চিঠি কি খালের জলে চুবাইয়া আনছিস? দুধে জল মিশাইস বইলা চিঠিতেও জল মিশাইছিস? তোর সবতাতেই জল, হারামজাদা?'

মকবুল গম্ভীর মুখে বলল, 'অমন কথা কবেন না ধলাকর্তা, আমার দুধে পানি নাই। আমার নৌকায় তো পাটাতন নাই। এত কান্দাকাটি করলাম, একখানা তক্তা আপনে দিলেন না। গলুইর চারোটের কাছে রাখছিলাম চিঠি, জল লাইগা গেছে।'

কাঠগোলাপ

রাজমোহন বললেন, 'জল লাইগা গেছে! এই বুঝি তোমার তক্কা আদায় করার ফন্দি। ছাখ মকবুল, তোর মত এমন কুচকুইরা মানুষ পাড়ায় আর দুইজন নাই। ওকি, যাইস ক্যান? বয় বয়। তামাক খাইয়া যা।'

উত্তর ঘরের বারান্দায় আগুন, মালসা, তামাকের ডিবে, মুসলমানদের জন্যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রাখা আলাদা হুঁকো-কলকে। মকবুল অপ্রসন্ন মুখে গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

রাজমোহন পাট মেলা ক্ষান্ত রেখে এবার চিঠির দিকে তাকালেন। কিন্তু মাস কয়েক আগে চোখের ছানি কাটানো হয়েছে। চশমা ছাড়া লেখাপড়ার কাজ কিছু করতে পারেন না। চাকরকে ডেকে বললেন, 'এই কালু, আমার চশমাজোড়া আইনা দে তো। ওই ছাখ, জল-চৌকির উপর চশমা আর পঞ্জিকাখানা রইছে। যা, নিয়া আয়।'

সাদা নিকেলের ফ্রেমে পুরু লেন্স্। কাপড়ের খুঁটে কাচটা মুছে নিয়ে সাবধানে চশমাটা পরলেন রাজমোহন। তারপর প্রসন্ন মুখে চিঠিখানার দিকে চেয়ে বললেন, 'বউয়ের লেখা। ঠিকানাটাও অসীমাই লেখছে নিজের হাতে। বাবু সময় পায়ন নাই। তা বাবুর চাইয়া আমার বউর হাতের লেখাই ভালো, অনেক ভালো। কেডা কবে যে, মাইয়া-মাইনষের লেখা। ঠিক একেবারে পুরুষের ধরণ, পুরুষের ছান্দ। টান-ঠানগুলি একেবারে পাকা। দেখছিস কালু, দেখছিস?'

তের-চৌদ্দ বছরের বালক চাকর কালু মণ্ডলের অক্ষর-পরিচয় হয়নি। তবু সে খামের উপর ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারিফ ক'রে বলল, 'তা ঠিকই কইছেন ধলাকর্তা, ঠাইরেনের হাতের লেখাটা খুব ভালোই। ঠাইরেন দেখতেও যেমন সোন্দর, তানার চাল-চলন, কওন-বলনও তেমনি। সেবারে যে আইছিলেন, আমারে দুইডা

টাকা বকশিশ দিয়া গেলেন। নেব না, তবু জোর কইরা গছাইয়া দিলেন। আপনাদের কায়েতের ঘরের বউঝি ধলাকর্তা, রকমই আলাদা।'

বয়স অল্প হলে কি হবে, কালুর কথাবার্তা খুব পাকা। রাজমোহন একটু হেসে বললেন, 'আরে কেবল কায়েতের ঘরের মাইয়া হইলেই হয় না। ঘরখানা কেমন, বংশখানা কেমন, তা দেখবি না? চণ্ডীপুরের অম্বিকা বোসের নাতনী। এ অঞ্চলের মধ্যে অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান গুণী মানী লোক আর ছিল না। তাঁর বাড়ির মাইয়া। আমি কি যেমন তেমন বউ ঘরে আনছিলাম?'

এবার এনভেলপের মুখখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা সশব্দে পড়তে লাগলেন রাজমোহন। পড়বার আগে কালুর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেবল হাতের লেখা না, চিঠির মুসাবিদাটাও একবার শোন। তার মুসাবিদার কাছে উকিল-মহুরীও হাইরা যায়।'

মকবুলকেও ডাকলেন রাজমোহন, 'ও মকবুল, আয় এখানে, শোন আইসা।'

কৌতূহলী মকবুল হুঁকো হাতে উঠানে নেমে রাজমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজমোহন পড়তে লাগলেন:

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, অনেকদিন হয় আপনার চিঠিপত্র পাইনে। আপনার চিঠি না পেলে আমরা বড়ই চিন্তায় থাকি। ওখানে আপনি একা একা আছেন। আমরা কেউ কাছে নেই, আপনার নাতি-নাতনীরা কেউ কাছে নেই, কেবল ঝি আর চাকর ভরসা ক'রে আপনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা একা কাটাচ্ছেন। একথা যখন ভাবি, আমার মন ভারি খারাপ হয়ে যায়। আমরা থাকতে এই বৃদ্ধ বয়সে

আপনার সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে না, একথা মনে হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকে না। কিন্তু কি করব? আপনি তো আমাদের কথা শুনলেন না, আপনি তো পাকিস্তান ছেড়ে কিছুতেই এলেন না! অথচ বিষয়-সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে পাড়াপড়শীরা একে একে সবাই তো প্রায় চলে এসেছে। বাঁড়ুয্যেরা এসেছে, মুখুয্যেরা এসেছে, রাহারা এসেছে, সাহারা এসেছে। কুণ্ডুরা, নন্দীরা কেউ বাকি নেই। বলতে গেলে গ্রাম তো এখন একেবারে শূন্য। তবু আপনি এলেন না! এলেন না, তা ছাড়া ভবিষ্যতের কথাও একবার ভেবে দেখলেন না! অথচ যাঁরা আপনার বয়সী, যাঁরা বৈষয়িক মানুষ, তাঁরা সবাই এতদিনে এখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সময় থাকতে, দর থাকতে থাকতে ওখানকার স্থাবর-অস্থাবর সব বিক্রি ক'রে দিয়ে দু'পয়সা হাতেও করেছেন। কিন্তু আপনি কিছু করলেন না!

শুনতে পাই, আপনি নাকি লোকের কাছে বলে বেড়ান, বাড়ির সব জিনিস আপনার, সব সম্পত্তি আপনার, একগাছা কুটো, একছটাক জমিও আপনি নাকি বিক্রি করবেন না। মুসলমানেরা সব লুটে পুটে খাবে সেও স্বীকার, তবু আপনি কিছু ছাড়বেন না! আপনার বাড়ি, আপনার ঘর, আপনার সম্পত্তি। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করবেন। এর ওপর আমাদের বলবার আছে? অধিকারই বা কি?

কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করবার জন্য আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলেঘাটায় যে ঘর আমরা ভাড়ায় নিয়েছি, তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেয়াল আর মেঝে থেকে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে। সেই স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে কানু, টেনু, রীণা, মীনা —আপনার অত আদরের নাতি-নাতনীদের কারো অসুখবিসুখই আর সারছে না। প্রত্যেক মাসে জর-জারি আর ডাক্তার-খরচ লেগেই আছে।

আপনার ছেলের কাছে খাট-তক্তপোষের কথা বললে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন, বলেন, টাকা কোথায়? তা আমি বলি কি, আমার বিয়ের সময় আমার দাদুর দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানা আপনি এবার বিক্রি ক'রে দিন। দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান। আমি খাট পারি, তক্তপোষ পারি, যা হোক একটা আপনার নাতি-নাতনীদের জন্যে কিনে নিই। ওদের কষ্ট আর দেখা যায় না।

ভেবে দেখুন, এতে আপনার আপত্তির কারণ নেই, অমতেরও কিছু নেই। এ তো আপনাদের বাড়ির জিনিস নয়। এক হিসেবে পরের জিনিস, পরের কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া। তা বিক্রি করলে আপনার সম্মানের কোনো হানি হবে না। আপনি আমার নাম ক'রেই বিক্রি করবেন। এখন পাটের সময়। মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা আছে। এই বিক্রি করার সুযোগ। তাছাড়া ও পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে? কারো তো আর ভোগে আসবে না। মিছিমিছি উইয়ে কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তার চেয়ে আপনি ওটা বিক্রি ক'রে দিন। টাকাটা কাসুটেন্তুর প্রয়োজনে লাগুক। আপনার ছেলেরও তাই মত।

এখানে শ্রীমান শ্রীমতীরা সকলে কুশলে আছে। অফিসের কাজকর্মের চাপে আপনার ছেলে একটুও সময় পান না। তিনি পরে সময় ক'রে চিঠি লিখবেন। পত্র-পাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির ব্যবস্থা করবেন। নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখবেন। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের অসীমা

সুরেন আলাদা চিঠি দেয়নি। স্ত্রীর চিঠির কোণায় এক লাইনে একটু সুপারিশ করেছে, 'আমার মনে হয় অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।'

'না, আপত্তি কিসের? কিছুতে আমার আপত্তি নাই, তোগো যা খুশি তাই কর, যা ইচ্ছা তাই কর।'

বলতে বলতে চিঠিটা সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজমোহন। চড়া গলায় চাকরকে হুকুম করলেন, 'কাউলা, পূবের ঘর খুলা পালংখানা বাইর কইরা আন দেখি। ও জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না, ও পালং আমি আদাড়ে ফেলাইয়া দেব। তার বাপের বাড়ির সব জিনিস টোকাইয়া কুড়াইয়া তো নিয়াই গেছে। থাকবার মধ্যে আছে ওই পালং। ও জিনিস আমি আর রাখব না। আরেক মেড়াকান্ত বউর গোলাম। তিনি আবার লেখছেন, আপনার আপত্তি থাকা উচিত নয়। না, আমার আর কোন আপত্তি নাই! ও পালং আমার ঘর থিকা না সরাইয়া আমি অন্নজল মুখে দেব না। যা পালং খুইলা নিয়া আয়।'

কালু বাধা দিয়ে বলল, 'ধলাকর্তা, শোনেন।'

রাজমোহন বললেন, 'না, আর শোনা-শুনি নাই, কাউলা। আমার যে কথা, সেই কাজ। ও পালং ভইরা আমি পেচ্ছাব করি, পেচ্ছাব করি। ও জিনিস আমার বাড়ি থিকা দূর কইরা না ফেলাইলে আমার মনের জ্বালা মেটবে না, কাউলা, আমার বুকের আগুন নেববে না।'

এগিয়ে গিয়ে রাজমোহন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে পূবের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। এই ঘরে থাকত স্থরেন আর তার স্ত্রী অসীমা। এক বছর আগেও স্থরেন ছুটিতে এসে সপরিবারে এ ঘরে বাস ক'রে গেছে। পালঙ্কখানা দক্ষিণের তুটি বড় বড় জানালা ঘেঁষে এখনো পাতা রয়েছে। গদিটাকে পুরু চট দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে রেখেছেন রাজমোহন। রোজ একবার ক'রে এসে দেখেন, উই-ইঁতুরে কাটল কিনা। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছেন। পূব দিকের বেড়ায় স্থরেন আর অসীমার বাঁধানো

ফটো। উত্তর দিকে ধানের গোলা আর স্তূপীকৃত শুকনো সাদা পাট।

রাজমোহনের পিছনে পিছনে মকবুলও এসে দোরের কাছে দাঁড়াল।

রাজমোহন বললেন, 'আয়, ঘরে আয় মকবুল, পালং খুইলা নিয়া যা।'

মকবুল বলল, 'এ পালং সত্যিই আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা?

রাজমোহন বললেন, 'হ্যাঁ। নগদ টাকা পাইলে আইজই আমি এ জিনিস বিক্রি কইরা দেব। বিক্রি কইরা আইজই মনি-অর্ডার করব কইলকাতায়।'

মকবুল ঘরের ভিতরে ঢুকল। এ ঘরে খাওয়ার জল নেই, ঠাকুর-দেবতার আসন নেই, কামলা-কিষাণ—সবাই এঘরে আজকাল ঢোকে।

ঘরে এসে লুব্ধদৃষ্টিতে পালঙ্কখানার দিকে তাকাল মকবুল। ভারি শৌখীন দামী জিনিস। আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরী। চারিদিকে চারটি পায়ায় বড় বড় বাঘের থাবা। হাত-খানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নক্সার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোট ছোট হাতীর সারি।

মকবুল আবার জিজ্ঞেস করল, 'পালংখানা আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা? তা বউ-ঠাইরেন যে রকম খোটা দিয়া লেখছেন, তাতে আপনার মত মানী লোকের এ জিনিস রাখা উচিত না। তা এক কাজ করেন ধলাকর্তা, জিনিসটা আপনে আমারে দেয়ন গিয়া।'

রাজমোহন মকবুলের দিকে তাকালেন, 'তোরে?'

মকবুল বলল, 'হ ধলাকর্তা। আমি মাগনা নেব না, সাইধ্য মত দাম দিয়া নেব। জিনিসটা তো আপনে আদাড়ে ফেলাইয়া দিতেই চাইছিলেন। তা আদাড়ে দেওয়াও যা, আমারে দেওয়াও তা। আমারে দিয়া দেয়ন জিনিসটা।'

রাজমোহনের আক্রোশ তখনও মেটে নি। মনে মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়। মকবুলের ঘরেই এ জিনিস যাওয়া উচিত। যে রকমের মেয়ে তাঁর পুতের বউ, আর যে রকম ছোট তার প্রবৃত্তি, তাতে তার বাপের বাড়ির জিনিসের এই গতি হওয়াই ভালো।

মকবুলের দিকে তাকালেন রাজমোহন, 'পারবি? নগদ টাকা দিয়া নিতে পারবি জিনিস? আইজই এই মুহূর্তেই আমার ঘর পরিষ্কার কইরা দিতে পারবি?'

মকবুল বলল, 'পারব ধলাকর্তা, আমি বাড়ি গুনা টাকা নিয়া আইলাম বুইলা। আপনি পালং খোলেন ততক্ষণ।'

মকবুল শেখের বাড়ি কাছেই। রাজমোহনদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছোট একটা জংলা পোড়ো ভিটে, তার দক্ষিণে সরু একটা খাল। অন্য সময় শুকনো খট্‌ খট্‌ করে, এখন বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। সেই খালের ওপারে মকবুলদের বাড়ি। জংলা ভিটায় একটা আমগাছের সঙ্গে আর মকবুলদের একটা তেঁতুলগাছের গোড়ায় বাঁধা বাঁশের সাঁকো। পায়ের নীচে এক বাঁশ আর ধরবার জন্যে উঁচু ক'রে বাঁধা আর একটা সরু বাঁশ। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে উৎসাহে প্রায় ছুটে গেল মকবুল।

তেঁতুলগাছের নীচে ছোট একখানা ঘর। ওপরে পুরোন করোগেট টিনের চাল। জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। বেড়াগুলির খানকয়েক বাঁশের বাঁখারি দিয়ে তৈরী, সামনের খান-দুই পাকাটির। মাটির ভিত বর্ষার জলে থিক থিক করছে। মাটি খুঁড়ে গোটাকয়েক কেঁচো আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে ভিতরে। সামনে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে ছোট একটু উঠান। খালের জল বাড়ির উপর উঠি উঠি করছে। এখনো ওঠেনি। উঠানে বসে একুশ বাইশ বছরের নীল রংয়ের একখানা জোনাকি

শাড়ীপরা ফর্সাপানা একটি বউ শাপলা কুটছিল। খানিক দূরে শাপলার ফুল নিয়ে খেলা করছে চার-পাঁচ বছরের উলঙ্গ রোগা রোগা দুটি ছেলে-মেয়ে। কোমরে একটা ক'রে ফুটো পয়সার সঙ্গে একগাছি ক'রে কালো তাগা বাঁধা। দেহের আর কোথাও কিছু নেই। উঠানের পূবদিক দিয়ে পাকাটি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। তাতে জ্বালানি হবে, ঘরের বেড়া হবে। সেই পাকাটির আড়ালে একটা রোগা হাড়-বের করা গরু খড় চিবুচ্ছে আর লেজ নাড়ছে।

রুদ্ধশ্বাসে মকবুল এসে স্ত্রীর সামনে দাঁড়াল, 'ফতি, ওঠ। উইঠ্যা শীগ্‌গির টাহা বাইর কর্।'

ফতেমা আঁচলখানা মাথায় তুলে দিয়ে কালো বড় বড় দুটি চোখ মেলে সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে তাকাল, 'এ তুমি কও কার নাগাল? টাহা পামু কই?'

মকবুল মুচকি হেসে বলল, 'পাবিআনে।'

তারপর নিজেই টাকার সন্ধান দিল। বাঁশের ছোট শুকনো চোঙাটার মধ্যে আছে ভাঁজ করা কয়েকখানা নোট। পাট বেচে, গাছ বেচে, গাইয়ের দুধ বেচে একটি একটি ক'রে সঞ্চয় করেছে সেই টাকা। স্ত্রীকে সেই টাকা বের ক'রে দিতে অনুরোধ করল মকবুল।

কিন্তু ফতেমা কিছুতেই উঠতে চায় না। কেবল ইতস্ততঃ করে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে পরম অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলল, 'সেই টাহা দিয়া না তুমি গাই কেনবা, সেই টাহা দিয়া না তুমি ঘর সারাবা, সেই টাহায় তুমি না আমারে গয়না গড়াইয়া দেবা কইছিলা। ও টাহা আমি দেব না, আমারে মাইরা ফেলাইলেও না।'

মকবুল হেসে বলল, 'আরে গয়নাই তো আনতেছি ঘরে। কেবল তোর গয়না না বউ, আমারও গয়না। দুইজনে মিলা একসঙ্গে পরব।

কী চমৎকার পালং রে ফতি! তুই তোর বাপের জনমেও দেখস নাই, আমিও না।'

সবিস্তারে মকবুল পালঙ্কের বর্ণনা দিল। ধলাকর্তা রাগ ক'রে পালঙ্কখানা সস্তায় বেচে দিচ্ছেন। এ সুযোগ হাতছাড়া করা সঙ্গত হবে না। বেশী দেরি করলে হয়ত ধলাকর্তার রাগ পড়ে আসবে। হয়ত অন্য কারো হাতে গিয়ে পড়বে জিনিসটা। মকবুলের আফসোসের আর সীমা থাকবে না। এর আগে হিন্দুরা কত খাট, চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বাসন-বাটি বিক্রি ক'রে গেছে। জলের দামে মুন্সীরা কিনেছে, কাজীরা কিনেছে, সিকদাররা কিনে রেখেছে। মকবুল একটা জিনিসও ছুঁতে পারে নি। একটা পয়সাও তার হাতে ছিল না। এখন সুযোগ যখন হাতের কাছে এসেছে, এ সুযোগ ছাড়া মোটেই সঙ্গত হবে না। একটা জিনিসের মত জিনিস অন্তত থাকুক মকবুলের ঘরে।

ফতেমা নরম হয়ে বলল, 'কিন্তু জিনিস যে রাখবা মেঞা, তোমার সে ঘর কই? এই ভাঙা ঘরে রাজা-বাদশার পালঙ্ক মানাবে নাকি!'

মকবুল হেসে বলল, 'মানাবে ফতেমা, মানাবে। এই কুইড়া ঘরে আমার বেগমজান, আমার দিলজানরে মানাইতেছে না?'

দুই আঙুল দিয়ে স্ত্রীর থুতনি উঁচু ক'রে ধরল মকবুল, 'আমার এই ভাঙা ঘর রাঙা হইয়া রইছে না তার রোশনাইতে? এ ঘরে তোরে যদি মানায়, তাইলে পালংও মানাবে।'

ঘরের ভিতর গিয়ে বাঁশের চোঙাটা মেঝের ওপর উপুড় ক'রে ফেলল মকবুল। নোটে আর রেজগিতে মিলিয়ে বায়ান্ন টাকা সাড়ে দশ আনা। খুচরো টাকাটা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ফের সেই সাঁকোর উপর দিয়ে ছুটে চলল মকবুল। জংলা পোড়ো ভিটেয় পাড়ার ইয়াকুব চৌকিদার মাছ ধরবার দোয়াইর তৈরী করবার

জঙ্গে বুনো লতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মকবুলকে ছুটতে ছুটতে যেতে দেখে বলল, 'অমন ঘোড়া দাবড়াইয়া চললা কই মেঞা?'

মকবুল বলল, 'আরে ভাই চকিদার নাকি? আইস' আইস', তোমারে দিয়া কাম আছে আমার। কথা আছে। তোমার দোয়াইর আমি বানাইয়া দেবনে, তুমি আইস'।'

চৌকিদারের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল মকবুল।

রাজমোহন ততক্ষণে পালঙ্কখানা খুলে উঠানে নামিয়েছেন। মকবুল তাঁর পায়ের কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে দিয়ে বলল, 'এই নেয়ন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'টাকা দিয়া কি হবে? এ পালং তুই এমনিই নিয়া যা। নিয়া খালের জলে ভাসাইয়া দে গিয়া। এ জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না।'

মকবুল বলল, 'এমনিই নিতাম ধলাকর্তা। আপনার কাছ থিকা চাইয়া নিতাম, কিন্তু এ তো আপনার জিনিস না, ঠাইরেনের বাপের বাড়ির জিনিস। টাহা আপনে ঠাইরেনরে পাঠাইয়া দেবেন।'

একটা বিষাক্ত তীর যেন বিঁধল গিয়ে রাজমোহনের বুকে। ঠিক ঠিক, এ পালঙ্ক তো তাঁর নয়! এ তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির জিনিস। এতে রাজমোহনের কোনো অধিকার নেই। সে কথা অসীম তো স্পষ্টই লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সারা চিঠিখানা ভরে ওই একটি কথাই জানিয়েছে সে। দোয়াতের বিষ, তার অন্তরের বিষ কলমের ডগায় তুলে তুলে সারা চিঠি ভ'রে ছিটিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহন চেঁচিয়ে বললেন, 'তাই দেব, তাই দেব। টাকার যখন এত খাঁই হারামজাদীর, টাকাই পাঠাইয়া দেব তারে। তুই এ জিনিস আমার চোখের সমুখ থিকা সরাইয়া নিয়া যা মকবুল, সরাইয়া নিয়া যা। ও তো পালং না, খাট না, ও আমার চিতার কাঠ। তুই সরাইয়া নিয়া যা।'

ইয়াকুব চৌকিদারের সাহায্যে পালঙ্কখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পালাল মকবুল। এবার আর সাঁকোতে নয়, তার ভাঙা ডিঙি নৌকোয় পার ক'রে নিল।

ভারি ভারি পায়াগুলি ডাঙায় নামাতে নামাতে ইয়াকুব বলল, 'তুমি ভারি জিত জিতা গেলা মেঞা-ভাই। এ পালং-এর দাম দুইশ' টাকার এক পয়সাও কম হবে না, তোমারে আমি কইয়া দিলাম।'

কথাটা মকবুল এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার! মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মত সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু-চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম নাই! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁয়ার জো নাই, একটি জ্বালানি কুটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউথ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। স্বরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে? ছাইড়া দ্যাও মোনে।'

ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা মেঞাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ খাট আমি এমনিই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।'

তারপর একটু চিন্তা ক'রে মকবুল বলল, 'না ভাই, ওডা কথার কথা, কাইড়া নেওয়ার চাইয়া দাম দিয়া নেওয়া অনেক ভালো। জিনিসটা নিজের হয়। কেউ কোন কথা কইতে পারে না। কি কও মেঞা-ভাই? সাচা কইলাম, না মিছা কইলাম?'

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিকই কইছ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবরটা পাড়া ভ'রে ছড়িয়ে পড়ল, রাজমোহন তাঁর দামী পালঙ্কখানা জলের দামে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। যে ধলাকর্তা ভিটের একটা বাঁশ বেচেন না, গাছ বেচেন না, একগাছা খড় বিক্রি করতে পর্যন্ত যাঁর সম্মানে বাধে, তিনি অমন শৌখীন সুন্দর একখানা পালঙ্ক কিনা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দিয়েছেন!

শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, গেদু মুন্সী, ছদন মৃধা—পাড়া-পড়শীরা সবাই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

শরৎ বলল, 'ধলাকর্তা, আপনার কি মতিচ্ছন্ন হইছে! অমন জিনিসটা আপনি মোটে পঞ্চাশ টাকায় বেইচা ফেললেন! আমারে দিলে আমি দেড়শ টাকা দিতাম।'

গেদু মুন্সী বলল, 'আরে থোও ফেলাইয়া তোমার দেড়শ। ও জিনিস আমি আড়াই শ' টাকা দিযা নিতাম ধলাকর্তা। আমারে কইলেন না ক্যান্?'

রাজমোহন চ'টে উঠে বললেন, 'তোমরা যাও, চইলা যাও, আমারে বিরক্ত কইরো না। ও জিনিস আমি বিক্রি করি নাই, বিলাইয়া দিছি, ফেলাইয়া দিছি। তোমরা চইল্যা যাও।

কিন্তু চলে যাওয়ার আগে ছদন মৃধা অনুনয় ক'রে গেল, 'আলমারি, চেয়ার, টেবিল, সিন্দুক যদি কোন জিনিস ফের বিক্রি করেন ধলাকর্তা, আমারে কবেন, আমারে আগে জানাবেন। আমি নগদ টাকা দিয়া, ন্যায্য দাম দিয়া জিনিস নেব, ঠগাইয়া নেব না।'

ছদন মৃধার অবস্থা পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ভালো। পাটের কারবার ক'রে বেশ কিছু জমিয়েছে। মাঠেও প্রায় শ'খানেক বিঘা থামার। ছদন মুসলমানদের মধ্যে মানী গুণী লোক।

কিন্তু রাজমোহন তার পিছনে পিছনে প্রায় ধেয়ে গেলেন, 'তুমি চইলা যাও মেরধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।'

রাজমোহনের মূর্তি দেখে সবাই সামনে থেকে স'রে পালাল। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, ধলাকর্তার এবার ছিট হয়েছে মাথায়। হবে না? ছেলে-বউ নাতি-নাতনীদের ছেড়ে একা একা এই শূন্য পুরীতে থাকে মানুষটি, তার মাথা খারাপ হবে না!

সকলে চলে যাওয়ার পর রাজমোহন কিছুক্ষণ নিজের মনেই গুম হয়ে রইলেন। ঠকেছেন, তিনি ঠকেছেন কোনো সন্দেহ নেই। ঝোঁকের মাথায়, জেদের বশে তিনি নিজের সর্বনাশ করেছেন। চোরের উপর রাগ ক'রে ভাত খেয়েছেন মাটিতে, মাটি খেয়েছেন।

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে চাকরকে ডেকে বললেন, 'কাউলা, নৌকা খোল। আমি কুমারপুর যাব।'

সোনাপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে কুমারপুর গঞ্জ। সেখানকার রেজেস্ট্রী অফিসে কাজ করেন রাজমোহন। দলিল লেখেন। আজকাল লিখতে ভারি কষ্ট হয়। হাত কাঁপে। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট, এমন কি অপাঠ্য হয়ে ওঠে। লোকে আর তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে চায় না। কিন্তু কাজ তাঁর না করলে চলে না। কাজের জায়গায় তাঁর রোজ একবার ক'রে যাওয়া চাই। কাজের আশায় অফিস ঘরের বারান্দায় খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা চাই।

সবাই বলে, 'আর ক্যান ধলাকর্তা? এখন বয়স হইছে। এখন এসব ছাইড়া দেয়ন। এখন আর এত কষ্ট করেন ক্যান?'

রাজমোহন জবাব দেন, 'না করলে ভাত হজম হয় না হরবিলাস।

না কইরা দেখছি। হজম হয় না, ঘুম হয় না, আসোয়াস্তি লাগে।'

ছোট বৈঠাখানা নিয়ে নৌকায় যাওয়ার আগে কালু বলল, 'ধলা-কর্তা, নাইয়া খাইয়া নিলেন না?'

রাজমোহন জবাব দিলেন, 'না আইজ আর নাওয়া খাওয়া লাগবে না। তুই তো পান্তা ভাত খাইয়া নিছিস। তাইতেই হবে।' তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন রাজমোহন, 'কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম, এ্যা কাউলা?'

'আমি তো আপনারে বারবার না করলাম ধলাকর্তা। আপনারে—' বলতে বলতে কালু থেমে গিয়ে বৃদ্ধ প্রভুর মুখের দিকে নির্বাক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার পর আস্তে আস্তে বলল, 'চলেন, ধলাকর্তা।'

ধলাকর্তা। ধলাকর্তাই বটে, যৌবনে পাড়ার মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন রাজমোহন। দীর্ঘকায় চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রং, উন্নত নাক, প্রশস্ত কপাল আর আয়ত চোখ। দেখলে রাজপুত্র ব'লে মনে হোত। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে চেহারার সেই জৌলুষ আর নেই, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। রঙ নিষ্প্রভ হয়েছে। সুন্দর সুগঠিত দাঁতগুলির একটি কি দু'টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর একদিক থেকে রাজমোহন ধলাকর্তা হয়েছেন। এই কয়েক বছরে তাঁর মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। ভ্রু সাদা হয়েছে, গোঁফ সাদা হয়েছে, বুকের ওপর একরাশ লোম বগী পাটের মত সাদা ধবধব করছে।

কালু চাকর বলল, 'ধলাকর্তা, নায় ওঠেন।'

'হ, উঠি।'

কাঠগোলাপ

কাঁধে ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে পুরানো ছেঁড়া চটি, বগলে তালি-দেওয়া ছাতা আর লাঠিখানা চেপে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে বসলেন রাজমোহন, খাল ছেড়ে নৌকো কুমারনদীতে গিয়ে পড়ল।

রাত্রে ফিরে এসে হ্যারিকেন হাতে প্রথমেই পূবের ঘরখানায় ঢুকলেন রাজমোহন, ঘরের অর্ধেক খালি হয়ে গেছে! ঘরের দিকে আর চাওয়া যায় না! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন। কিন্তু সেই খালি ঘর যেন পিছনে পিছনে ছুটে এলো। খালি ঘর যেন বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। বুক খালি ক'রে দিয়েছে।

উত্তরের ঘরে—নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন রাজমোহন। কাপড় ছাড়লেন, হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসলেন। কিন্তু মন বসল না। পূবের ঘরের সেই খালি জায়গাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইষ্টমন্ত্রের বদলে পালঙ্কখানাকেই বারবার ক'রে মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেউ নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে-যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে, এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।

পরদিন সকালে উঠে তিনি প্রথমে কালুকে দিয়ে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন। মকবুল এল না। কালুকে বলল, তার এখন মেলা কাজ। পরে সময় মত ধলাকর্তার সঙ্গে সে দেখা করবে।

রাজমোহন অবশিষ্ট দাঁতগুলি কিড়মিড় করলেন, 'হারামজাদার

আস্পর্ধা দেখ! আমি ডাকলাম, বলে কিনা, কাজ আছে! কাজ আমি ওয়ার বাইর কইরা দেব।'

কালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কি করবেন ধলাকর্তা? এখন ওয়াগো দিনকাল, ওয়াগোই রাজত্ব। বড়া বাশের চাইয়া ছিটা কঞ্চির ত্যাজ বেশী।'

রাজমোহন বললেন, 'হুঁ।'

তার পর খানিক বাদে নিজেই চললেন মকবুলদের বাড়ির দিকে, ভালো ক'রে হাঁটতে পারেন না। বাতে বাঁ-পাটাকে প্রায় অকেজো ক'রে ফেলেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জল-জঙ্গল ভেঙে সেই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে রাজমোহন মকবুলের উঠানে এসে দাঁড়ালেন, 'কি করতেছিস মকবুল?'

দুধের যোগান দিয়ে এসে বারান্দায় বসে স্ত্রীকে নিয়ে গরুর দড়ি পাকাচ্ছিল মকবুল। রাজমোহনের গলার শব্দ শুনে ফতেমা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মকবুল বলল, 'আসেন ধলাকর্তা, আসেন।'

কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আন্তরিকতা ফুটে উঠল না। অবশ্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জলচৌকিখানা রাজমোহনকে ছেড়ে দিল মকবুল, বলল, 'বসেন ধলাকর্তা, তারপর কি মনে কইরা? আমিই তো যাইতাম। আপনি কষ্ট কইরা আইলেন ক্যান আবার?'

রাজমোহন বললেন, 'আইলাম তোগো দেখতে। কেমন আছিস খোঁজ নিতে। তা ঘরখানা তো ভালোই উঠাইছিস। ছাওয়ালপান নিয়া থাকবার মত বড়ও হইছে। তা পুরানো টিন দিছিস ক্যান চালে। বদলাইয়া নতুন টিন দে।'

কথার ফাঁকে একবার আড়চোখে মকবুলের ঘরের মধ্যে তাকালেন রাজমোহন। পালঙ্কখানা কালই পেতে ফেলেছে মকবুল। ওর সমস্ত

ঘরখানাই প্রায় জুড়ে গেছে। উঁচু পালঙ্কের নিচে হাঁড়ি-পাতিল ফতেমার গৃহস্থালি। উপর গদি নেই, গদি মকবুলকে দেননি রাজমোহন। তার বদলে একটি মাদুর আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা বিছিয়েছে ফতেমা। একদিকে ওয়াড়হীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ। যেন চিতা থেকে কেউ তুলে নিয়ে এসেছে। তাঁর পালঙ্কের কি দশা করেছে এরা! এ দৃশ্য দেখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগের কথায় ফিরে গেলেন রাজমোহন। বললেন, 'হ, টিন বদলাইয়া ফেলা, নইলে চাল নষ্ট হইয়া যাবে যে, জল পইড়া ঘর নষ্ট হইয়া যাবে।'

মকবুল বলল, 'বদলাব তো ধলাকর্তা কিন্তু টাকা কই? মনে কতই তো সাধ—, একটা গাই কেনব, ভালো একখান নাও কেনব—কিন্তু টাকা কই?'

রাজমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'টাকা তোর নিয়া আইছি।'

মকবুল চোখ তুলে তাকাল, 'কি কইলেন?'

রাজমোহন বললেন, 'আয়, তোর সাথে কথা আছে আমার বুঝাইয়া কই।'

চৌকি ছেড়ে উঠানে নেমে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

কিন্তু মকবুল উঠতে চায় না। বলল, 'কয়েন কর্তা, যা ক'বার এখানেই কয়েন। নাই কেউ এখানে।'

রাজমোহন সেকথা শুনলেন না। ওর হাত ধ'রে প্রায় টানতে টানতে আড়ালে নিয়ে গেলেন।

চারদিকে জল, চারদিকে জঙ্গল, তিনদিকে খাল একদিকে নদী। আশেপাশে দূরে দূরে আরো খানকয়েক মুসলমান-বাড়ি আছে। কোনটিতে জল উঠেছে। আর কোন বাড়ি জলের ওপরে জেগে রয়েছে। এক একটি বাড়ি যেন এক একটি দ্বীপ। পূব-দক্ষিণ কোণে ছোট একটা বাঁশের ঝাড়। সেখানে এসে দাঁড়ালেন রাজমোহন।

মকবুল বলল, 'ব্যাপার কি ধলাকর্তা? কি কবেন, কইয়া ফেলেন।'

রাজমোহন ট্যাঁক থেকে মকবুলের দেওয়া কালকের সেই নোটগুলি বের করলেন, সেই সঙ্গে আর একখানা নতুন পাঁচ টাকার নোট। মকবুলের দিকে টাকাগুলি বাড়িয়ে ধবে বললেন, 'গুইনা নে। মোট পঞ্চান্ন টাকা আছে। পাঁচ টাকা তোর ছাওয়াল-মাইয়ারে আমি মিষ্টি খাইতে দিলাম।'

রাজমোহনের বক্তব্যটা কি, তা মকবুল অনেক আগেই টের পেয়েছে। খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মকবুল। চোখ দুটো ভালো নয় মকবুলের। কেমন যেন লালচে লালচে। একটু পিছিয়ে গেলেন রাজমোহন। তিরিশ-বত্রিশ বছরের জোয়ান পুরুষ— গায়ের রং ঘোর কালো। যেন আস্ত একটি গাব গাছ। মাথায় তাঁর চেয়েও লম্বা। খুব চওড়া নয়, কিন্তু শক্ত চোয়াড়ে-চোয়াড়ে হাত পা। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। মুখে আবার শখ ক'রে চাপ-দাড়ি রেখেছে মকবুল। তাতে ঠিক একটা জন্তুর মত হয়েছে দেখতে।

রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা! ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানী জ্ঞানী মানুষ আপনারে কি আমি অপমান করতে পারি? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দিব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাডা মনে রাইখো মকবুল

শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইছ বইলা যে, সকলেই লাট হইয়া গেছ, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।'

রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান্?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান। খাট বিক্রি কইরা আবার সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড ছাখ। তা কি কইলা তুমি?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়া যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিতা হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পারলা? শরম করল না?'

মকবুল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

ফতেমা এবার বুঝতে পারল, মকবুল তাকে ক্ষেপাবার জন্যেই এসব কথা বলছে। ধলাকর্তার সঙ্গে তার মোটেই এ ধরণের কথাবার্তা হয়নি।

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়া-মানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়া-মানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইরা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা? ছাওয়ালপান লইয়া ঘর করি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মধ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক। তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।'

আঁচলটা বুঝি একটু সরে গিয়েছিল, ফতেমা তাড়াতাড়ি, বুকের ওপর তাকে ভালো ক'রে টেনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে লজ্জিতভাবে

বলল, 'তোমার সাথে কথা কওয়ার জো নাই। আর ও দুইডা চউখ তো না যেন—'

উপমাটা হঠাৎ কতেমার মুখে যোগাল না।

কিন্তু মকবুল ওর কথার ভাব বুঝতে পেরে হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের চউখ, জুয়ান মাইনষের চউখ। ওই রকমই হয় বিবি। এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না, এ চউখের ধরণই আলাদা, দুনিয়ার অন্যায় অবিচার দেখলে রাঙ্গা হয়, আর দুনিয়ার সোন্দর জিনিস দেখলে এ চউখে রং ধরে।'

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার পরে রাজমোহনের বাড়িতে ডাক পড়ল মকবুলের। উত্তর ঘরের চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দু'টি সতরঞ্চি পাতা। একটি মুসলমানদের জন্যে আর একটি হিন্দুদের। মাঝখানে তামাকের ডিবা, আগুন-মাসলা, গুটিতিনেক ছোট বড় হুঁকো, দু'টি হিন্দুর একটি মুসলমানের।

পাড়ায় বর্ণহিন্দু বলতে আর কেউ নেই। যারা আছে, তারা সবাই কৃষ্ণবর্ণ, শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, ফটিক কর্মকার, নিবারণ রজক, এরা সকলেই রাজমোহনের অনুগৃহীত। অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছে। আর মুসলমানদের দলে আছে ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী।

মকবুল এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেদু মুন্সী মুরুব্বির স্বরে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো কর নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইরা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাড়েন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইয়া আছেন। এখনো আমরা তানার জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি। তুমি ধলা-কর্তার জিনিস ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দাও গিয়া।'

মকবুল বলল, 'এমন অন্যায় কথা আমারে কবেন না, মুন্সী সাহেব। ধলাকর্তা নিজের হাতে তানার খাট আমারে ধইরা দিছেন, নিজের

মুখে বিক্রি কইরা দিছেন। টাহা নিছেন আমার কাছ থিকা। ওই ইয়াকুব চকিদার তার সাক্ষী। এখন ওই খাট উনি আর ফেরত চায়ন কি বইলা?'

রাজমোহন বড় একখানা জলচৌকিতে গম্ভীরভাবে বসে ছিলেন। ডানদিকে একটা হারিকেন জ্বলছে। তার ফিতেটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'টাকা নিছি? ওই পালং-এর দাম পঞ্চাশ টাকা হয়? তুই কইলেই হইল?'

মকবুল বলল, 'আপনি তখন তাই কইছিলেন, ধলাকর্তা। তাছাড়া শক্তি বুইঝা জিনিসের দাম। পঞ্চাশের বেশি দেওয়ার আমার শক্তি নাই। আমি পঞ্চাশ দিয়াই নিছি।'

শরৎ শীল বলল, 'এ তো আর একটা কথার মত কথা হইল না মকবুল, তোমার শক্তি নাই, আর একজনের আছে। তুমি হয় আর একশ ধলাকর্তারে গুইনা দাও, নইলে পালং নিয়া আইস।'

হিন্দুরা ঘাড় নাড়লেও মুসলমানরা একথায় কোন উচ্চবাচ্য করল না। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগল। কিন্তু সমস্যার কোন মীমাংসা হোলো না।

মকবুল স্পষ্টই বলল, 'এই যদি আপনাগো বিচার হয়, এ বিচার আমি মানতে পারব না। টাকা দিয়া জিনিস কিনা, জিনিস আমি ফেরত দেব না। আপনারা দেওয়ানী করেন, ফৌজদারী করেন, যা ইচ্ছা করেন গিয়া।'

গেদু মুন্সী ধমক দিয়ে বলল, 'যা যাঃ! ছোট মুখে বড় কথা! বাড়ি গিয়া ভাইবা দেখ গিয়া, বিবির সাথে শলা-পরামর্শ কর গিয়া রাইত ভইরা। তারপর কাইল আইসা যা কবার কইস।'

মকবুল চলে গেলে গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা রাজমোহনকে প্রবোধ দেওয়ার সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না ধলাকর্তা। ও অমন

গোয়ার-গোবিন্দ মানুষ। পাড়ার কেডা ওয়ারে না চেনে? ও কি কাউর কথার বাধ্য? দেখি, বুঝাইয়া শুঝাইয়া। খাট নিয়া ও যাবে কোথায়? আপনার খাট হজম করবে ওয়ার সাধ্য কি? কিন্তু আপনেও রাগের মাথায় বড় কাচা-কাজ কইরা ফেলছেন ধলাকর্তা। আপনেও আর আমাগো কথা কওয়ার মুখ রাখেন নাই।'

মুন্সী আর মৃধার সঙ্গে আর সবাই একে একে বিদায় নিল। শরৎ বলল, 'সব মেঞাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা। তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনার মুখের পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইয়া যায়ন। যখন যেমুন তখন তেমুন। আপনার তো একখানা খাট। বাড়িঘর, জমিজোত কত জনে জলের দামে বিকাইয়া দিয়া গেছে না? তাতে কি হইছে? তাতে কি তারা মইরা গেছে? মরে নাই। আপনে একখানা খাটের জন্যে আর মইরা যাবেন না, আপনি ইচ্ছা করলে এখনো অমন পাঁচখানা খাট কিনা ঘর বোঝাই করতে পারেন, তা আমরা জানি না? যায়ন ঘরে যায়ন, রাইত হইয়া গেছে ঘরে যায়ন।'

আর এক ছিলিম তামাক টেনে শরৎ শীলও বিদায় নিল।

হারিকেনটা বড় চোখে লাগছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজমোহন অন্ধকারে চুপ ক'রে বসে রইলেন। পূবের ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে কালু এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। সারা বাড়ি, সারা পাড়াটাই নিস্তব্ধ। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, বড় একা, বড় একা রাজমোহন। সমস্ত অপমান তাঁহাকে একা একাই হজম করতে হবে। কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ভারি অসহায় বোধ করতে লাগলেন রাজমোহন। এই সময় যদি হারামজাদাটা বাড়ি আসত, যদি এসে তাঁর পাশে দাঁড়াত, তিনি কত বল পেতেন! কিন্তু সে আসবে

না। তাকে রাজমোহন আসতে লিখবেনও না। সে যেখানে আছে সেখানেই থাক, বউ ছেলে নিয়ে সুখে থাক।

বাপ-বেটায় কত মনোমালিন্য হয়, কত ঝগড়াবিবাদ হয়, তাঁদের মধ্যে তো তা হয়নি। তবু সে দূরে স'রে গেছে। তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তির সঙ্গে রাজমোহনের মিল নেই। রাজমোহন যা ভালোবাসেন, সে তা বাসে না। যে জমি-জায়গা, ভিটে-মাটি, ধান-পাট, গাছ-পালা রাজমোহনের কাছে প্রাণের চেয়েও বড়, তার কাছে তা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। সে দেশ চিনল না, দেশের মানুষ চিনল না। চেনার মধ্যে চিনেছে শুধু চাকরি আর শুকনো একগাদা বই। চোখের পাতা বুজে মানুষের কথা, মানুষের মানে সে বইয়ের পাতায় খুঁজে বেড়ায়। না, তার সঙ্গে কোন মিল নেই রাজমোহনের। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী, দেশান্তরী হয়েছে। রাজমোহন আর সে এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।

জোলো হাওয়া দিচ্ছে। বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে দেবদারু গাছটার পাতা সেই হাওয়ায় অল্প অল্প নড়ছে। কত বড় হয়েছে দেবদারু গাছটা! রাজমোহন নিজের হাতে পুঁতেছিলেন এই গাছ। ঠিক সুরেনের বয়স গাছটার। সুরেনের মতই গাছটা রাজমোহনের চোখের সামনে বেড়েছে। কিন্তু তাঁর চোখের সমুখ থেকে সরে যায় নি।

'অনেক আপন, সে শত্তুরের চাইয়া, তুই আমার অনেক আপন দেবদারু। তোর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাইস নাই। তুই আমার মতই আমার ভিটামাটি আকড়াইয়া রইছিস। তোর মত আপন আমার কেউ না, সংসারে কেউ না।'

এই দেবদারু গাছটাকে কতজনে চেয়েছিল। একুশ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল গাছটার। রাজমোহন দেননি। বলেছেন, 'আমি কিনি, আমি বেচি না।'

কাঠগোলাপ

জীবনে কিছুই বিক্রি করেননি রাজমোহন। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রাজমোহনের। কেন করলেন —কেন বিক্রি করলেন পালঙ্কখানা? হঠাৎ তাঁর এ কী মতিভ্রম হলো! জিনিসটা আর কি তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না? এতজনের এত জায়গা-জমি তিনি উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন, আর ভুল ক'রে বিক্রি-করা নিজের জিনিসটা তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না! নিশ্চয়ই পারবেন। তাঁকে পারতেই হবে।

কিন্তু উদ্ধার করা সহজ হোলো না। মকবুলকে জব্দ করবার কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন না রাজমোহন। ও তাঁর ভিটে-বাড়ির প্রজা নয়, কোন টাকাকড়ি ধার নেয়নি। একটা মিথ্যা মামলামোকদ্দমায় ওকে জড়িয়ে দেওয়াও যুক্তিসঙ্গত মনে হোলো না। পাকিস্তানের আমলে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী মিলবে না। তাছাড়া মাতব্বর মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠবে।

কিন্তু বড়রকম কোন শত্রুতা না করতে পারলেও মকবুলের ছোটখাট অনিষ্ট করতে ক্ষান্ত রইলেন না রাজমোহন। ওর কাছ থেকে আধসের ক'রে দুধ রোজ নিতেন, ছেড়ে দিয়ে ওয়াহেদের কাছ থেকে নিতে সুরু করলেন। কামলা-কিষাণ খাটাতে হলে, বাড়ির কাছে ব'লে সবচেয়ে আগে মকবুলকেই ডাকতেন, সেই ডাক বন্ধ হোলো।

মকবুল জাতচাষী নয়, কারো কোন বরগা জমি চাষ করে না। কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে। পাটের সময় পাট কাটে, পাট ধুয়ে মেলে দেয়; ধানের সময়ও দলের সঙ্গে মিলে ধান কাটতে যায়। যখন শস্যের কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে, জ্বালানির জন্যে অন্যের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার করে, কাঠ চেলা ক'রে দেয়। এ সব কাজের জন্য রাজমোহনের বাড়িতে মকবুলেরই আগে

ডাক পড়ত। কিন্তু এখন থেকে তিনি ওকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে লাগলেন। হিন্দুরা বেশির ভাগ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় মকবুলের কাজকর্ম এমনিতেই কমে গিয়েছিল। রাজমোহনের এই শত্রুতায় তা প্রায় বন্ধ হবার জো হোলো। মুসলমানপাড়ায় কামলা-কিষাণের চাহিদা কম। অবস্থাপন্ন ঘরের লোকেও নিজের হাতেই প্রায় এসব কাজ সেরে নেয়। কাজের অভাবে মকবুল ভারি অসুবিধায় পড়ল।

কালুর কাছেই সব খোঁজখবর পেতে লাগলেন রাজমোহন। ডিঙি-নৌকায় তাঁকে কুমারপুরে পৌঁছে দিতে দিতে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, আইচ্ছা জব্দ হইছে শেখের পো। হাতে না মাইরা ওয়ারে ভাতে মারবার জো করছেন আপনে। আপনার সাথে টেক্কা দিয়া ও পারবে ক্যান? আপনার এক দাঁতের বুদ্ধি রাখে নাকি ও?'

রাজমোহন তোবড়ানো গালে খুশী হয়ে হাসেন, 'তবু তো দাঁত আমার নাই কালু। সবগুলিই প্রায় পইড়া সারছে।'

কালু আশ্বাস দিয়ে বলে, 'যা আছে তাই যথেষ্ট ধলাকর্তা। আপনার খালি মাড়ির চোটেই ও অস্থির হইয়া ওঠবে।'

অস্থিরতা মকবুলের মধ্যে সত্যিই দেখা দেয়। স্ত্রীর কাছে কঠিন শপথ ক'রে বলে, 'দেখি আর দুই চাইরডা দিন। শালার বুইড়ারে আমি খুন করব। ওয়ার চইখের সামনে লুইটা পুইটা নেব।'

ফতেমা শঙ্কিতা হয়ে বলে, 'খবরদার, খবরদার, অমন কামও কইরো না, অমন কথাও ভাইবো না মনে।'

মকবুল বলে, 'ক্যান ভাবব না? জেল হবে, ফাসী হবে? হউক, একজনের পেছনে না হয় আর একজন যাব।'

ফতেমা বলে, 'কিন্তু আমরা যে পইড়া থাকব। আমরা যাব কোথায়?

খবরদার, অমন কামও কইরো না। রক্ত অত গরম কইরো না। বোঝলা? ছাওয়াল হইছে, মাইয়া হইছে, মাথা এখন ঠাণ্ডা কইরা চল। ওয়াগো খাওয়াইয়া পরাইয়া বাচাও। তয় তো বুঝি ক্ষমতা। তয় তো বুঝি তুমি পুরুষের মত পুরুষ।'

মকবুল বলে, 'হুঁ।'

ফতেমা বলে, 'হুঁ না। অমন লাফাইয়া ঝাপাইয়া সর্দারি খেলাইতে তো সকলেই পারে। তার মধ্যে আর কেরামতি কি? আসল কেরামতি পোলাপান মানুষ করায়, পোলাপান বাচাইয়া রাখায়, দেখছ ওয়াগো চেহারা? শুগাইয়া শুগাইয়া কি দশা হইছে ওয়াগো, দেখছ? আমার সোনার সবতুল আর মজনুর দিকে একবার চাইয়া দেখ।'

রোগা হাড়-বের-করা ছেলেমেয়ে দুটিকে পরম স্নেহে কাছে টেনে নেয় ফতেমা। আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওদের খাদ্যের অভাব যেন শুধু স্নেহ দিয়েই মেটাবে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফতেমা আবার বলে, 'ছাখ, চাইয়া ছাখ!'

ছেলেমেয়েদের দিকে না চেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকেই ক্রুদ্ধভাবে তাকায় মকবুল, রুক্ষ চড়া গলায় বলে, 'ক্ষ্যাপাইয়া দিস না ফতি, আমারে ক্ষ্যাপাইয়া দিস না। আমার মাথায় খুন চড়াইস না।'

ফতেমা স্বামীর হাত ধ'রে বলে, 'না, খুনাখুনির কাম নাই, আমার কথা শোন। ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দিয়া আইস। কি হবে খাট-পালংএ। প্যাটে যদি দুইডা ভাত থাকে, চাটাই পাইতা শুইয়াও সুখ, তাতেও ঘুম আসে।'

স্ত্রীর মুঠো থেকে রাগ ক'রে হাত ছাড়িয়ে নেয় মকবুল, তারপর আরক্ত চোখে বলে, 'খবরদার ফতি, অমন কথা কবি না, মুখ গুতাইয়া ভাইঙ্গা ফেলব। আর বারবার ধলাকর্তার পালং—ধলাকর্তার পালং

করিস না আমার সামনে। ও পালং আর ধলাকর্তার না, ও পালং আমার, গাইটের টাহা দিয়ে আনছি আমি। চুরি কইরা আনি নাই, ডাকাত্তি কইরা আনি নাই। নিজের রোজগারের টাহা দিয়া ঘরে আনছি পালং। এ জিনিস আমারই বুঝলি?'

এগিয়ে এসে পালংখানার একটা পায়া আঁকড়ে ধরল মকবুল। যেন ওর ঘর থেকে জিনিসটা কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে বালিকাচায় দা'খানা ধার দিয়ে কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল মকবুল। কোথাও কাজ মিলল না। গরীব চাষী মুসলমানের গ্রাম। সকলের অবস্থাই প্রায় এই রকম। কে তাকে কাজ দেবে? মকবুল আক্রোশে অধীর হয়ে বেড়াতে লাগল। ধলাকর্তাকে সত্যি সত্যি খুন করবার সাহস হোলো না, তাঁর বাড়িতে ডাকাতি করবারও সাহস হোলো না। শুধু দিনকয়েক ফাঁকে ফাঁকে চুরি ক'রে বেড়াতে লাগল। ঘর থেকে নয়, বাগান থেকে এককাঁদি পাকা সুপুরি চুরি করল, দুটো ডাব নারকেল চুরি করল।

রাজমোহন টের পেয়ে বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে খিস্তি ক'রে গালাগাল করলেন, থানা-পুলিশের ভয় দেখালেন, মুরারি মণ্ডলের ছেলে মুকুন্দকে কিছু পয়সা কবুল ক'রে সারাদিনের জন্যে বাড়িতে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন।

সুপুরি চিবিয়ে আর ডাব নারকেলের জল খেয়ে তো আর পেট ভরে না। মকবুল ভারি ফাঁপরে পড়ে গেল। বর্ষার এই সময়টায় সব বছরই কষ্টে কাটে। কাজকর্ম থাকে না, রোজগারপত্রও থাকে না। ধান চাল তেল ডালের দাম আক্রা হয়। কিন্তু এবার যেন কষ্টের মাত্রা সব চেয়ে বেশী। পাটের থন্দ শেষ হয়েছে। ধানের থন্দ এখনো আসেনি। এই সময় সকলেই বেকার। থৈ থৈ বর্ষা। সকলেরই ঘরে জল, বাড়িতে জল। হাঁড়িতে

চাল নেই। সকলেরই কষ্ট। তার মধ্যে মকবুলের কষ্ট সবচেয়ে বেশী। দু'চার টাকা যা সঞ্চয় করেছিল, পালঙ্কের পিছনে গেছে। এখন হাত একেবারে খালি, পেট একেবারে খালি। পিঠের সঙ্গে তার দিনরাত মিতালি। ছেলেমেয়েগুলি দাপাদাপি করে, বউ-এর ঝগড়ার চোটে বাড়িতে টেঁকা যায় না। নিজের ছেলেমেয়েদের খাদ্য নিজেই যোগাড় করে ফতেমা। দু'মুঠো ক্ষুদের সঙ্গে একরাশ শাপলা সিদ্ধ করে, কোন-দিন বা একঝাঁকা কচু। আঁচল দিয়ে খালের ঘাট থেকে টাকির পোনা ধরে, চিংড়ি মাছ ধ'রে আনে।

এর মধ্যে ধলাকর্তার চাকর কালু এলো একদিন খবর নিতে, 'কি মকবুল মেঞা, আছ কেমন ?'

মকবুল ভ্রু কুঁচকে বলল, 'বেশ আছি। বড় মাইনষের বড় চাকর, তুই আছস কেমন ?'

কুশল-প্রশ্ন-আদান-প্রদানের পর কালু আসল কথা পাড়ল, 'পঞ্চাশের পর ধলাকর্তা আরো দশ টাকা তোমারে বেশি দিতে রাজী হইছে মকবুল। তানার পালং তানারে তুমি দিয়া দাও গিয়া, অবুঝ হইও না। বোঝলা ?'

মকবুল তেড়ে প্রায় মারতে এলো, 'আমি তো বুঝছিই, তোরে এবার জন্মের বুঝ বুঝাইয়া ছাড়ব। নাম্, নাম্ আমার বাড়িগুনা। ফের যদি অমন কুপেরস্তাব নিয়া আসবি, ঠ্যাং বাইড়াইয়া ভাঙব, কইয়া দিলাম তোরে।'

তাড়া খেয়ে কালু পালাল তো এলো ছদন মৃধা, এলো গেদু মুন্সী। আড়ালে ডেকে নিয়ে সকলেই একই কথা বলে। পালংখানা বিক্রি ক'রে দিক মকবুল। ধলাকর্তা জানতেও পারবে না, আর জানলেই বা কি ? পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে তো মকবুল, ছদন মৃধা পাঁয়ষট্টি

দেবে। গেছু মুন্সী উঠল পঁচাত্তরে। কিন্তু মকবুল ঘাড় নাড়ল। পালং সে বিক্রি করবার জন্যে কেনেনি, নিজে ব্যবহার করবার জন্যে এনেছে। পালঙ্কের দর দু'চার পাঁচ টাকা ক'রে বেড়ে বেড়ে পুরো একশতে গিয়ে পৌছল। কিন্তু মকবুল কিছুতেই গোঁ ছাড়ল না। পালঙ্ক সে বেচবে না কাউকে। বউ-ছেলে নিয়ে নিজে শোবে, নিজে ব্যবহার করবে।

গেছু মুন্সী আর ছদন মৃধা দুজনেই দাঁত কিড়মিড় ক'রে মকবুলকে অভিশাপ দিয়ে গেল, 'মর শালা, না খাইয়া শুকাইয়া মর। যাওয়ার সময় গোরে নিয়া যাইস তোর খাট।'

ফতেমাও সেদিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুমি কি! কেমুন ধারার মানুষ তুমি! এ যদি এক বিঘা জমি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফসল দেবে। এ যদি একটা গাই হইত, বোঝতাম বছর বছর দুধ দেবে; একটা গাছও যদি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফল দেবে। কিন্তু একখান শুকনা মরা কাঠ, তা তুমি ঘরে রাইখা মরতে চাও ক্যান?'

মকবুল স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল, কিন্তু রাগ না ক'রে আস্তে আস্তে স্নেহকোমল স্বরে বলল, 'রাখি যে ক্যান মাগী, তা তুই বুঝবি না। মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মাইছিস, তা তোর বোঝবার কথা না। ও আমার কাছে মরা কাঠ নারে ফতি, ভারি তাজা জিনিস, ও আমার পুরুষের ত্যাজ।'

ফতেমা বলল, 'এতই যদি ত্যাজ, বাইর হও বাড়ির থিক্যা, চাকরি-, বাকরি জোটাইয়া আন। শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমরা না খাইয়া মরব ক্যান?'

মকবুল সে খোঁজ-খবরও নিয়ে দেখেছে, লেখা জানেনা, পড়া জানেনা—তাকে কে দেবে চাকরি?

স্ত্রীর কথায় পরম দুঃখে, পরম নৈরাশ্যে মকবুল শুকনো ঠোঁটে একটুখানি হাসল, 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোরস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।'

দিন দুই বাদে গরুটা বিক্রি ক'রে ফেলল মকবুল। তিন-বিয়ানো গাই। আজকাল দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধই করেছিল। ঘাস-বিচালির অভাবে শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। একেবারে ভাগাড়ে দেওয়ার চেয়ে তাকে মকবুল বেচে দিল ভিনগাঁয়ের লোকের কাছে। আর বেচল ছোট ভাঙা ডিঙিখানা। কিছু টাকা দিল ফতেমার হাতে, আর বাকি টাকায় একখানা ছই-ওয়ালা পুরনো নৌকো কিনল। কেরায়া বাইবে। সেই নৌকা নিয়ে ভোরে উঠে কুমারপুরে চলে যায় মকবুল। কোনদিন ভাড়া জোটে, কোনদিন জোটে না। আশায় আশায় ব'সে থাকে ঘাটে। বাড়ী ফেরে রাত দুপুরে। কোনদিন একটাকা পাঁচসিকে আনে। কোন দিন আসে শুধু হাতে। দেশের দিনকাল বড় খারাপ। দূরে দূরে কেরায়া যখন পায়, সবরাত্রে বাড়ি ফিরতে পারে না—ফেরে না মকবুল। ভিন্ন গাঁয়ের হাটে ঘাটে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়।

নৌকো নিয়ে সেদিন বাইরে চলে গেছে মকবুল, ফতেমা পাকাটি দিয়ে উনুন জেলে রান্না চড়িয়েছে, রাজমোহন এসে উপস্থিত হলেন বাড়িতে, 'ও মকবুল, বাড়ি আছিস নাকি, ও মকবুল?'

ফতেমা তাড়াতাড়ি বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা কর্তারে বল, সে বাড়ি নাই, নাও নিয়া বাইর হইয়া গেছে। কর্তারে পুছ কর, ওনার কি দরকার।'

কিন্তু পাঁচ বছর বয়স হ'লে কি হবে, মকবুলের ও বড় হাবা ছেলে। মা-বাবার সঙ্গে দু'একটা কথা যদি বা বলে, বাবুদের সঙ্গে মোটেই মুখ খুলতে পারে না। তাই আড়ালে থেকে ফতেমাকে কথাবার্তা চালাতে

হোলো। রাজমোহন বললেন, 'কাসে বড় কষ্ট পাইতেছি। বাসকের পাতার রসে নাকি ভালো হয়। তোমাগো বাড়িতে বাসকের গাছ আছে। দুইডা পাতা নেব নাকি বউ?'

ফতেমা হেসে বলল, 'নেবেন না ক্যান কর্তা?—নেয়ন। দুইডা পাতাই তো, আপনি বারান্দায় বসেন, আমিই আইনা দেই।'

'না না, আমিই নেব নে, আমিই নেব নে।'

ব'লে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসলেন রাজমোহন। ব'সে ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক, তাঁর পালঙ্ক! কিন্তু কি দশাই না ক'রে রেখেছে জিনিসটার! অমন সুন্দর সুন্দর নক্সা-করা পায়াগুলিকে তেল মেখে চুণ মুছে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। আর উপরে সেই তেল-চিটচিটে চিতার ছেঁড়া কাঁথা আর বালিশগুলি। ছি ছি ছি! এত দামী জিনিস কি ওদের ঘরে মানায়! এ সব জিনিসের যত্ন কি ওরা জানে!

একথা-সেকথার পর রাজমোহন আসল কথা পাড়েন, 'তোমারে একটা কথা বলি বউ, রাগ কইরো না। মকবুলরে বুঝাইয়া শুঝাইয়া কও, পালংখানা ফিরাইয়া দেউক আমারে। ও যে দাম চায়, সেই দামই আমি ওয়ারে দেব।'

বেড়ার আড়ালে ফতেমা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'না ধলা-কর্তা, ও কথা আমি তারে কইতে পারব না। আপনে বাসকপাতা নিতে আইছেন, পাতা নিয়া যায়ন। ও সব কথা কবেন না।' ব'লে ফতেমা সেখান থেকে সরে গেল।

গালে যেন একটা চড় খেলেন রাজমোহন। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে থেকে উঠে এলেন। যতক্ষণ পারলেন, বেড়ার ফাঁক দিয়ে অপলকে

চেয়ে রইলেন পালঙ্কখানার দিকে। বাসকপাতা আর নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না রাজমোহনের। তবু যাওয়ার সময় ছিঁড়ে নিলেন দুটো পাতা।

বারবাড়িতে পূজোর মণ্ডপ। তার মধ্যে রাধা-গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মুরলী, বামে চিরসঙ্গিনী রাধিকা। ব্রজমোহন রসরাজ শ্রীগোবিন্দ স্মিতমুখে চেয়ে রয়েছেন। স্নান ক'রে এসে সেই মণ্ডপের সামনে খানিকক্ষণ বসে রইলেন রাজমোহন। ধ্যানমন্ত্র জপ ক'রে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'দয়াল, আমার সব মায়ার বন্ধন কাটাও, আমারে তোমার বৃন্দাবনের পথে নিয়া চল। তোমার ব্রজের রাঙা ধূলায় আমার কামনা-বাসনা, আমার লাঞ্ছনা-অপমান ঢাইকা যাউক।'

মনে হোলো, সবই বুঝি গেল। কিন্তু গেল কই? পরদিন ফের রাজমোহনের বাসকপাতার দরকার পড়ল। চাকরের সামনে ইচ্ছা ক'রে জোরে জোরে কাসির অভিনয় করলেন। বাসকপাতা না হ'লে আর চলে না।

ধলাকর্তার সাড়া পেয়ে আজ কিন্তু ফতেমা আর ঝাঁপের আড়ালে এসে দাঁড়াল না, কথা বলল না। দূরে এক কোণে লুকিয়ে রইল। কি জানি, আজ যদি আবার ধলাকর্তা পালঙ্কের কথা পেড়ে বসেন। রাজমোহন সে কথা বুঝলেন। বাসকগাছ থেকে আজও দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর যাওয়ার সময় ফের এসে বসলেন বারান্দায়। আর কাউকে না পেয়ে মকবুলের ছেলে সবতুলের সঙ্গেই আলাপ করতে সুরু করলেন। চোখ দুটো নিজের শাসন মানল না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালঙ্কখানার দিকে তাকাতে লাগল। মকবুলের বাসকগাছ প্রায় নিষ্পত্র হবার জো হোলো। কিন্তু রাজমোহনের কাসি আর সারে না, আসা আর বন্ধ হয় না।

একদিন রাত্রে ফিরে এসে মকবুল স্ত্রীকে বলল, 'শুনি কি? ধলাকর্তা নাকি রোজ আসা ধরছেন। আইসা এই বারান্দায় বইসা থাকেন?'

ফতেমা বলল, 'হ, বাসকপাতা নেওয়ার জন্যে আসেন।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূর দূর। ঘোড়ার ডিম। তোরে দেখতে আসেন। তোর চান্দমুখ বুড়ার মনে ধরছে।'

ফতেমা রাগ ক'রে বলল, 'কি যে কও!'

মকবুল বলল, 'তাইলে আসল কথা কইয়া ফেল।'

ফতেমা বলল, 'কব আবার কি? আসল কথা তুমিও জান, আমিও জানি।'

মকবুল বলল, 'তা তো বোঝলাম। কিন্তু খবরদার, খবরদার। টাকা-পয়সার লোভে পাছে রাজী হইস, কথা দিয়া ফেলিস। তাইলে আর আস্ত রাখব না।'

ফতেমা বলল, 'ক্ষ্যাপছ? পালং-এর কথা ওঠাবে বইলাই তো আমি তার কাছ দিয়া ঘেঁষি না। কিন্তু বুইড়ার নজর বড় খারাপ। যতক্ষণ থাকে, বেড়ার ফাঁক দিয়া চাইয়া চাইয়া দেখে। আমার ভালো লাগে না। যাই কও, বুকের মধ্যে কাপে। পোলাপান নিয়া ঘর করি। কি হইতে কি হবে! মানুষের নজরে বিষ আছে।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূর দূর। ওই ছানিপড়া চউখের নজরে কিছু হবে না। ও বিষ ধোড়া সাপের বিষ। তাতে মানুষ মরে না। তুই শান্ত হইয়া ঘুমা। আইচ্ছা, কাইলই আমি বুইড়ারে কইয়া দেব, আমার বাড়ি-মুকস্থম যেন আর না হয়। হইলে পাও বাইড়াইয়া ভাঙব।'

কিন্তু মকবুলের নিষেধ করবার দরকার হোলো না। দিন দুই বাদেই রাজমোহন জ্বর আর রক্ত-আমাশয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিছানা

ছেড়ে আর উঠতে পারেন না। গাঁয়ের ডাক্তার এলো চিকিৎসা করতে, বলল, 'রায়মশাই, আপনার ছাওয়াল-বউরে একটা চিঠি দেয়ন। বুড়া বয়সে রোগটা তো ভালো না।'

রাজমোহন মাথা নেড়ে বললেন, 'না ডাক্তার, এখন না। খবর দেওয়ার সময় হইলে আমি তোমাকে কব। অফিসে নাকি তার প্রমোশনের কথা চলতেছে। এখন ছুটি নিলে সেডা আর হবে না। এখন যাউক।'

অসীমার নামে অন্য তহবিল থেকে টাকা নিয়ে পুরো দুশোই পাঠায়ে দিয়েছেন রাজমোহন। পঞ্চাশ টাকায় পালঙ্ক বিক্রি হওয়ার কথা কি আর বউ বিশ্বাস করবে? ভাববে, বাকী টাকা শ্বশুর ভেঙে খেয়েছেন। ডাক্তার রোজ যাতায়াত করতে লাগল। কিন্তু অসুখ বেড়েই চলল।

এদিকে মকবুলও বড় বিপদে পড়ে গেল। হাটের দিন রাত্রে নওপাড়ার ঘাটে মাদারগাছের সঙ্গে নৌকো শিকল দিয়ে আটকে রেখে উপরে হাট করতে নেমেছিল, এসে দেখে নৌকো নেই। তালা ভেঙে নৌকো চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। নওপাড়া চোরের জায়গা। গেদু মুন্সীর শ্বশুরবাড়িও ওইখানে। তার সঙ্গে বড় বড় চোরের সাট। বুঝতে কিছুই বাকী রইল না মকবুলের। আর এক জনের নৌকোয় কোনরকমে বাড়ি ফিরল। পরদিন থেকে সেই আগের অবস্থা, আগের চেয়েও খারাপ। এখন আর গরু নেই, নৌকো নেই, কিচ্ছু নেই। এখন বিক্রি করার মত আছে শুধু এক ঘর আর ঘরজোড়া এক পালঙ্ক।

শুয়ে শুয়ে সব খবরই শুনলেন রাজমোহন। শরৎ শীল এসে বলল, 'হবে না! আপনার সঙ্গে শত্রুতা করতে গিয়েছিল, তার শাস্তি পাবে না ধলাকর্তা?'

দিন কয়েক বাদে কালু এসে সেদিন চুপে চুপে আর এক খবর দিল, 'ধলাকর্তা, শোনছেন নাকি?'

রাজমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'কি?'

কালু বলল, 'তালাকান্দার আতাজদ্দি শিকদারের কাছে নাকি মকবুল পালংখানা বিক্রি কইরা দেবে। আতাজদ্দি নতুন দালান উঠাইছে। সেই দালান সাজাবে পালং দিয়া।'

রাজমোহন নিস্পৃহভাবে বললেন, 'সাজাউক।'

কালু বলল, 'দেড়শ টাকা নাকি দর উঠছে।'

রাজমোহন বললেন, 'উঠুক।'

কালু বলল, 'আইজ সন্ধ্যার পর আতাজদ্দি নাকি নিজেই নাও আর টাকার থইলা নিয়া আসবে।'

রাজমোহন পাশ ফিরতে ফিরতে বললেন, 'আসুক।'

সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গাঁয়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। আগে না গেলে কালু জায়গা পাবে না বসতে।

সন্ধ্যার পর বুবী ঝি পথ্যের বাটি রেখে গেল সামনে। রাজমোহন সে পথ্য মুখে তুললেন না। রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হ'তে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল। রাজমোহন কেবল এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। চোখে ঘুম আর আসে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রাজমোহন। দুর্বলতায় পা কাঁপছে। হাতড়ে হাতড়ে লাঠিগাছটা তুলে নিলেন। কোমরের তাগায় চাবি বাঁধা। সেই চাবি দিয়ে ঘরের তালা আটকালেন। বাইরে এসে দেখলেন আকাশে ঘন মেঘ। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। কিন্তু ছাতা

কি হারিকেন নেওয়ার জন্যে ফের আর ঘরে গেলেন না রাজমোহন। লাঠিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন।

মিনিট পনের বাদে মকবুলের উঠানে দাঁড়িয়ে রাজমোহন ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, 'মকবুল, এই হারামজাদা, বাইর হ', ঘরের থিকা বাইর হ'।'

মকবুল ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠানে এসে দাঁড়াল, 'কেডা?—ধলাকর্তার গলা না? ধলাকর্তা নাকি?'

রাজমোহন দুর্বল জড়িত স্বরে বললেন, 'হ আমি। পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি?'

মকবুল অন্ধকারে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেডা কইল আপনারে?'

রাজমোহন বললেন, 'আরে তা দিয়া তুই করবি কি? এসব কথা কি গোপন থাকে? মাছিতে গিয়া কয়।'

মকবুল বলল, 'এই বিষ্টির মধ্যে এই অন্ধকারে অসুখ নিয়া আপনি আসলেন ক্যামনে ধলাকর্তা? পার হইলেন ক্যামনে?'

রাজমোহন বললেন, 'চারের ওপর দিয়া পার হইছি।'

মকবুল বলল, 'সব্বনাশ! আসেন, ঘরে আসেন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'আর তোর ঘরে যাইয়া করব কি? তুই তো যা করবার করছিস।'

মকবুল বলল, 'না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন, ছাখেন আইসা।'

হাত ধ'রে রাজমোহনকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল মকবুল। গায়ে জামা নেই, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। পায়ে জুতো নেই। পরনে নেংটির

মত একখানা কানি। যে চশমা ছাড়া চলতে পারেন না, ভুলে সেই চশমাটাও ফেলে এসেছেন।

ঘরে গিয়ে মকবুল স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ওঠ বউ, ওঠ। উইঠা বাতি জ্বালা। ধলাকর্তাকে দেখাই।'

পালঙ্কে প্রায় মূর্ছিতার মত পড়ে ছিল ফতেমা, স্বামীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল।

তারপর কেরোসিনের ডিবাটা জ্বেলে উঁচু ক'রে ধরল পালঙ্কের দিকে। বাঁ হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ফতেমা। কিন্তু ছেঁড়া ঘোমটায় মুখ ঢাকা পড়ল না।

পালঙ্কের এক ধারে দুইটি শিশু প্রায় মড়ার মত পড়ে আছে।

রাজমোহন বললেন, 'তাইলে বেচিস নাই? আছে?'

মকবুল বলল, 'আছে ধলাকর্তা।'

'আতাজদ্দি বুঝি আসে নাই?'

মকবুল বলল, 'আইছিল। দেড়শর ওপর আরও দশ টাকা বেশি দিতে চাইছিল। তবু ফিরাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিতে পারছি। তবু শালার ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্দাকাটি করতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম—মাগী, আমারে আইজকার রাইতখান সময় দে। অবুঝ প্যাটটারে জোর কইরা থামচাইয়া ধইরা থাক। আইজকার মত, আমার মান বাচা, জান বাচা, রাখতে দে পালংখানা।'

রাজমোহন বললেন, 'মকবুল!'

মকবুল বলল, 'ধলাকর্তা!'

তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি ক'রে কেরোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধ'রে রইল। আর সেই

ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্ক-প্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।

একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'

রাজমোহন বললেন, 'সে কি কথা, মকবুল!'

মকবুল বললেন, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিয়া যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?'

ব'লে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, বললেন, 'খবরদার!'

তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'এতদিন চুরি কইরা কইরা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'

স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'

ভুবন ডাক্তার

সপ্তাহ খানেক জ্বরে ভুগবার পর অন্নপথ্য করলাম। আর তার পরদিনই মাসীমাকে বললাম, 'আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে দাও, আজই কলকাতা পাড়ি দেব।'

মাসীমা অবাক হয়ে থেকে বললেন, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে আজই যেতে চাস, তুই কি ক্ষেপেছিস না কি কল্যাণ!'

বললাম, 'চাকরির ব্যাপার মাসীমা। না গেলেই চলবে না। যে ক'দিন ছুটি ছিল, তার অনেক বেশী কামাই হয়ে গেছে। নতুন ম্যানেজার এসেছেন অফিসে, কি হয় বলা যায় না।'

একথা শুনে মাসীমা নরম হলেন। ভদ্রলোকের ছেলের শরীর একটু দুর্বল থাকে থাক, কিন্তু চাকরিকে দুর্বল করলে চলে না।

মাসীমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাহ'লে আর তোমাকে আটকাব না বাবা। চাকরি-বাকরির যা বাজার শুনি আজকাল। দুর্গা দুর্গা ব'লে বেরিয়ে পড় তাহ'লে। সাবধানমত যেয়ো আর গিয়েই একটা পৌঁছা-সংবাদ দিয়ো।' তারপর একটু থেমে ফের বললেন, 'ভালো কথা, যাওয়ার আগে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাবিনে? বুড়ো তায় বামুন, একটা প্রণাম ক'রে যাওয়াই তো ভালো, আশীর্বাদ করবেন।'

ঠিক। এতক্ষণে একটা কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মাসীমা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করা অবশ্যই দরকার। আশীর্বাদের জন্যে নয়, তাঁর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটখানার জন্যে।

ফরিদপুর জেলার এই কাসিমপুর গ্রামে দু'চার বিঘে জমি আমাদের এখনও আছে। তা কোনদিনই ভোগে আসে না। পাকিস্তান হওয়ার পর থেকে ভাবছি ছাড়িয়ে দিয়ে আসব। কিন্তু যাই যাই ক'রে আর যাওয়া হয়নি। এবার হাত-টানাটানিটা একটু বেশী হওয়ায় মরিয়া হয়ে ছুটি নিলাম অফিস থেকে। ভাবলাম যা হয় একটা কিছু ক'রে আসব। কিন্তু এসে বিশেষ কিছু লাভ হোলো না। জমির দর নেই, খদ্দের নেই। তাছাড়া মাসীমার মোটেই ইচ্ছে নেই আমরা জমি বিক্রি করি। তিনি বললেন, 'তাহ'লে আমার আর এখানে থাকা চলে না। জমি তো আর কামড়াচ্ছে না যে, মাটির দরে সোনা বিলিয়ে দিবি। আছে থাক না।'

মাসীমাকে বললাম না, কিসে কামড়াচ্ছে। তবু কোথায় কি আছে, না আছে দেখবার জন্যে দু'একদিন বেরুতে হোলো। ফলে কার্তিক মাসের রোদ লাগল মাথায়। খালের জলটাও সহ্য হোলো না। তৃতীয় দিনে একেবারে পুরোপুরি বিছানা নিলাম। দিন দুই যাওয়ার পরও যখন জ্বর গেল না, মাসীমা বললেন, 'ও-পাড়ার ভুবন ডাক্তারকেই ডাকি। অবশ্য সাধারণ জ্বর-জ্বারিতে আমাদের মধু কম্পাউণ্ডারও মন্দ নয়। কিন্তু তার দরকার নেই বাপু। সহরের বড় বড় ডাক্তারের ওষুধ খাওয়া নাড়ী তোমাদের, মধুর ও ওষুধ যদি না ধরে, মুশ্‌কিলে পড়ব। বড় ডাক্তার দেখানই ভালো।'

বললাম, 'ভুবন ডাক্তার বুঝি খুব বড় ডাক্তার তোমাদের?'

মাসীমা বললেন, 'বড় না? সেকালকার দিনের এম. বি. পাশ। বিলেত যাওয়ার পর্যন্ত কথা উঠেছিল, যাননি। চমৎকার ডাক্তার, ওষুধ

একেবারে ধন্বন্তরী। আর গরীব দুঃখীর ওপর খুব টান। নিজের বাড়িতে হাসপাতাল করেছেন। বিনা পয়সায় ওষুধপথ্য দেন। এ-মুল্লুকে এমন লোক নেই যে ভুবন ডাক্তারের নাম না জানে, গুণ না গায়।'

সুতরাং ভুবন ডাক্তারকেই ডাকা হোলো। জরের ঘোরে দেখলাম একবার চেহারাটা। প্রায় ছ' ফুট লম্বা শক্ত সমর্থ চেহারা। গায়ের রং গৌর। গোঁফ দাড়ি কামানো, মাথার চুল সব পেকে গেছে। কিন্তু দাঁত দু'তিনটির বেশি পড়েছে ব'লে মনে হোলো না। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া। গলায় সাদা ধবধবে পৈতা দেখা যাচ্ছে, ওপরে কুচকুচে কালো স্টিথোস্কোপ।

মাসীমাই রোগের বিবরণ সব বললেন। ডাক্তার খানিকটা শুনলেন, খানিকটা শুনলেন না। একবার নাড়ীটা একটু ধরলেন। তারপর বললেন, 'জিভটা বার করুন তো।' করলাম। দেখে নিয়ে বললেন, 'হুঁ'।

তারপর আচমকা পেটে এক খোঁচা দিয়ে বললেন, 'ব্যথা লাগে?'

পেটে কোন ব্যথা ছিল না, কিন্তু খোঁচায় যে সত্যিই ব্যথা পেয়েছি সেকথা আর তাঁকে বলি কি ক'রে?

বারান্দায় গিয়ে মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন দেখলেন?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'ভাববেন না। আপনার চাকরকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবেন আমার ডিস্‌পেনসারিতে। ওষুধ নিয়ে আসবে।'

খস্ খস্ ক'রে একটা কাগজে গোটা কত ওষুধের নাম আর মাত্রা লিখলেন। তারপর চার টাকা ভিজিট নিয়ে মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বিদায় হলেন।

মাঝখানে আরো একদিন এসেছিলেন। সেদিনের বিবরণও ওই আগের দিনের মতই।

মাসীমার চাকরটি মুসলমান। বয়স বছর তের' চৌদ্দ। নাম কলম। নিজে কোনদিন কলম ধরেনি। কিন্তু লগি বৈঠায় খুব ওস্তাদ।

ডিঙি নৌকোয় গেলাম ভুবন ডাক্তারকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে। আশীর্বাদ সহ মেডিক্যাল সার্টিফিকেট-খানা নিয়ে আসব—এও ছিল বাসনা।

ছোট ছোট খাল গেছে এঁকে বেঁকে। একটা থেকে একটা, তার থেকে আর একটা। দুই দিকে ঝোপ। কোথাও বা বাঁশের ঝাড়, স্থপারির বাগান, গাব, শ্যাওড়া আর আগাছার জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ক'রে বাড়ি। ঘরগুলি তালাবন্ধ। কলম হেসে বুঝিয়ে দিল, 'হিন্দুরা ভয় পায়া পলাইয়াছে।'

আমাদের আগে পিছে অনেকগুলি ডিঙি নৌকো। কোনটিতে পাটি, কোনটিতে হোগলা আর কোনটিতে শুধু একখানা কাপড় কি কাঁথা দিয়ে ছইয়ের আব্রু তৈরী করা হয়েছে। ভিতরে রোগিণী, আর গলুইতে লুঙ্গিপরা হুঁকো হাতে তার বাবা, কি স্বামী, কি ভাই। আর এক হাতে বৈঠা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় চলেছে ওরা?'

কলম বলল "আবার কোথায়, ভুবন ডাক্তারের বাড়ি। অনেক দূর দূরগুণা সব রুগীরা আসে।'

খানিক বাদে ভুবন ডাক্তারের বাড়িতে আমরাও পৌছলাম, কিন্তু নৌকো ভিড়বার জায়গা নেই. ঘাটে। শুধু ঘাট নয়, বাড়ির চারিদিকেই ছোট ছোট কালো কালো সব ডিঙি নৌকো। বর্ষাকালে পূর্ববঙ্গের গঞ্জগুলিতে যেমন হাট মেলে এও প্রায় তেমনি।

অনেক কষ্টে এক জায়গায় নৌকো ভিড়াল কলম। গলুইর ওপর থেকে একটু লাফিয়ে ডাঙায় নামলাম।

বেশ বড় বাড়ি। উত্তরের ভিটেয় পুরোন একতলা একটা দালান। আর তিনদিকে ঘিরে আটচালা ছনের ঘর। মাঝামাঝি একটা জায়গায় সাইনবোর্ড আঁটা। লেখা আছে—'নুরুন্নেসা হাসপাতাল'।

মুখুয্যে বাড়ির হাসপাতালের নাম নুরুন্নেসা। ব্যাপারটা কি! পাকিস্তান-সরকারের প্রীতি আর বিশ্বাস অর্জনের জন্যেই কি মুখুয্যে মশাইর এই নাম-নির্বাচন? কিন্তু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার তারিখ দেখছি তেরশ আটত্রিশ সাল। পাকিস্তান হওয়ার প্রায় ষোল বছর আগে। ভুবন ডাক্তারের দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে।

দক্ষিণ-পূব কোণে বাইরের দিকের একটা ঘরে ভুবনবাবু তাঁর আউট ডোর পেশেণ্টদের দেখছিলেন, আমি গিয়ে হাজির হলাম। ডাক্তারবাবুর লক্ষ্যই নেই। আমি নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম। ডাক্তারবাবু একবার তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ভালো আছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

ডাক্তারবাবু ফের তাঁর রোগীদের নিয়ে পড়লেন। রোগ নির্ণয়ের প্রায় একই রকম প্রকরণ। কারো ম্যালেরিয়া, কারো কালাজ্বর, কারো অন্য কিছু।

আধ ঘণ্টাখানেক বসে থেকে আমি এবার একটু বিরক্ত হলাম। ভালো থাকলেই যে লোকের আর কোন কথা থাকবে না, তার কি মানে আছে?

ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একটু চড়া গলায় বললাম, 'ডাক্তারবাবু, আমি আজ চলে যাচ্ছি।'

আর একজন রোগীর নাড়ী টিপে ধ'রে ডাক্তারবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেশ তো।' বললাম, 'আমি মেডিক্যাল সার্টিফিকেট-খানার জন্যে এসেছি।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সার্টিফিকেট আবার কিসের?'

অবাক হলাম। সার্টিফিকেট কিসের মানে? ভিজিট আর ওষুধের দাম কিছুই তো বাকি রাখিনি? সার্টিফিকেটের জন্যে কি আরো টাকা আদায় করেন নাকি ইনি?

অপ্রসন্নভাবে দু'টাকার একখানা পাকিস্তানী নোট ওঁর টেবিলে রাখলাম। যদি আপত্তি করেন, তখন না হয় আরো দুটো টাকা দেওয়া যাবে। কিন্তু আগে না।

ডাক্তার ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন, 'টাকা কিসের?' বললাম, 'ওষুধের দাম সব ক্লিয়ার করে দিয়েছি। এ আপনার সার্টিফিকেটের টাকা। দু'টাকায় হবে, না কি পুরো চার টাকাই লাগবে?'

হঠাৎ ডাক্তারবাবু উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি ভেবেছ কি? আমি টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট দিই? এত স্পর্ধা তোমার? আমার বাড়ীর ওপর দাঁড়িয়ে তুমি আমাকে অপমান কর! তোমার এত সাহস!'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারজন মুসলমান আমাকে ঘিরে দাঁড়াল, 'কেডা আপনারে অপমান করবে ডাক্তারবাবু, মানুষডা কেডা? মুহের কথাডা খসায়ন আপনে। মাথাডা খসাইয়া থুই।'

ডাক্তারবাবু হাতের ইশারায় তাদের স'রে যেতে বললেন। তারপর আমার দেওয়া নোটখানা জোরে উঠানের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, বেরোও এখান থেকে। সার্টিফিকেট আমি দিই না, কাউকে দিই না। যাও, চলে যাও।'

আমি উঠানে নেমে বললাম, 'বেশ, না দিতে চান সেটা ভদ্রভাবে বললেই হোত। কিন্তু বাড়ির ওপর পেয়ে যে অপমানটা মিছামিছি আপনি করলেন, আমি তা সহজে ভুলব ব'লে মনে করবেন না। যাওয়ার

সময় থানায় রিপোর্ট ক'রে যাব। তাতে কিছু না হয় ঢাকা করাচী কোন জায়গা বাদ রাখব না।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'যাও, যাও, থানা পুলিশ আমার খুব দেখা আছে।'

কলমকে নিয়ে ফের আমাদের সেই ডিঙি নৌকোয় উঠলাম। মাত্র খানিকটা এগিয়েছি, দু' তিন খানা নৌকো আমাদের ঘিরে ধরল, 'ডাক্তারবাবু নিয়া যাইতে কইছে আপনারে।'

কলম ভয় পেয়ে বলল, 'কাম সারা, কয়েদ কইরা রাখবে। গুম কইরা ফেলবে একেবারে।'

ভয় আমিও যে না পেয়েছি তা নয়, তবু ফিরতেই হোলো।

কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ডাক্তারবাবু ঘাটের কাছে হাত জোড় ক'রে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, 'আমাকে মাফ্ করবেন। বুড়ো মানুষ রাগের বশে কি ব'লে ফেলেছি কিছু ঠিক নেই। কিছু মনে করবেন না। আসুন, ওপরে আসুন।'

মনে মনে ভাবলাম থানা পুলিশের কথাটায় কাজ হয়েছে তাহ'লে, তাতে না হোক ঢাকা করাচীর দোহাইতে হয়েছে।

বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আমি আজই কলকাতা রওয়ানা হব।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিন্তু আজ তো আপনি আর লঞ্চ ধরতে পারবেন না। আপনাকে কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। আসুন, কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

নৌকো থেকে নামলাম। তিনি আমাকে তাঁর দালানের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ বললেন, 'আপনাকে তখন বলিনি। সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই।' গলায় একটু যেন করুণ সুর বাজল।

চুপ করে রইলাম। আমি এই রকমই একটা কিছু আন্দাজ করেছিলাম। ডাক্তারবাবু নিজেই সার্টিফিকেট পান নি। পাড়াগাঁয়ে শুধু হাত-যশেই কাজ চলে যাচ্ছে।

বললাম, 'কটা চান্স নিয়েছিলেন? একটা, না দুটো?'

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ভেবেছেন, পাশ করতে পারি নি, তা নয়, পাশ করেছিলাম, ভালো পাশের সার্টিফিকেটই পেয়েছিলাম। কিন্তু তা রাখতে পারি নি।'

একটু চুপ ক'রে রইলেন ডাক্তারবাবু। তারপর হঠাৎ বললেন, 'অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনি আমার এখানে আজ এবেলার অতিথি। দুটি ডাল ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি আপত্তি ক'রে বললাম, 'না না, সেকি! মাসীমা চিন্তায় থাকবেন।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না। নাস্তা দিয়ে আমি আপনার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে গিয়ে সব খবর দেবে।'

দালানের ভিতরে ঢুকলাম। অনেক দিনের পুরোন বাড়ি। দরজার উপরে ডাক্তারবাবুর বাবা-মার বাঁধানো ফটো। চেহারার মিল দেখে অনুমান করলাম।

মাঝখানের একটা কামরায় ঢুকে ডাক্তারবাবু স্ত্রীর উদ্দেশে ডেকে বললেন, 'ওগো, শোন, এদিকে এসো। আরে, এ আমাদের ছেলের মত। এর কাছে আবার লজ্জা কি! ও পাড়ার বোস-ঠাকুরুণের বোনপো। কি যেন নাম বলেছিলেন সেদিন?'

'কল্যাণকুমার রায়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ; কল্যাণ, কল্যাণ। আর বলবেন না মশাই, পরম অকল্যাণ ঘটিয়ে ফেলেছিলাম আর একটু হ'লে। মেজাজটা আর ঠিক হোলো না।'

একটি মহিলা এসে দোরের কাছে দাঁড়ালেন। চওড়াপেড়ে আট-পৌরে একখানা শাড়ি পরনে। গায়ে সামান্য দু' একখানা গয়না। মাথায় আঁচল, কপালে সিঁন্দুরের ফোঁটা। রঙ কালো। মুখের ডৌলও সুন্দর বলা যায় না। তবে ডাক্তারবাবুর তুলনায় বয়স অনেক কম ব'লেই মনে হোলো। চল্লিশের বেশি হবে না।

মহিলাটি স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু আগে অত চেঁচামেচি করছিলে কেন?'

স্বর মৃদু কিন্তু মিষ্টি।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আর বলো না, আজ একটা কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছিল। স্বভাবটা আর শোধরাতে পারলাম না।'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী একটু হাসলেন, 'আর কবে পারবে?'

একথার জবাব এড়িয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন, 'কল্যাণবাবু আজ আমাদের অতিথি। আমি ওঁকে কেবল তেতো তেতো ওষুধ আর ইনজেকশন দিয়েছি, তুমি একটু পথ্যটথ্যের ব্যবস্থা কোরো। আমি যাই, রোগীরা সব বসে আছে।'

তারপর আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কিন্তু মশাই আমার জন্যে অপেক্ষা করবেন না! আমার ফিরতে ফিরতে বেলা তিনটে।'

ব'লে ডাক্তারবাবু বেরিয়ে গেলেন।

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী আমার সঙ্গে আরো দু' একটা কথা ব'লে ভিতরে চলে গেলেন। আমি ওঁদের বসবার ঘরে ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খানিকক্ষণ ডাকের বাসি খবরের কাগজ ওলটালাম। কাচের আলমারি-ভরা যে সব বই দেখলাম তার সবই চিকিৎসাশাস্ত্র। ম্যাগাজিনগুলিও তাই।

একটু বাদে ফের এলেন মহিলাটি। নিজেই চা নিয়ে এসেছেন।

খুশী হয়ে বললাম, 'আপনি নিলেন না?'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমরা নিজেরা কেউ চা খাইনে।'

খানিক বাদে স্নানাহারে সেরে নিতে হোলো। একটু ঘুমিয়েও নিলাম। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হোলো ফের সেই বিকেল পাঁচটায়। ছোট গড়গড়াটা হাতে নিয়ে তিনিই আমাকে ডেকে তুললেন, বললেন, 'উঠুন। কার্তিক মাসের দিনে এত ঘুম ভালো নয়, মাথা ধরবে।'

আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন এসে আমার সামনে। হেলান দিয়ে নয়, মেরুদণ্ড সোজা ক'রে স্থির হয়ে বসলেন। আমি ইঁদারার জলে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। তারপর ফের এক কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে শুনলাম ওঁর গল্প। ভুবন ডাক্তারের সার্টিফিকেট হারাবার কাহিনী। সে কাহিনী ডাক্তারবাবু নিজের মুখে উত্তমপুরুষে বলেছিলেন, ফরিদপুরের ভাষায়। কিন্তু কলমের মুখে তাঁর কথাগুলিকে ঠিক ঠিক তুলে দিলে নানা অসুবিধে হবে ভেবে আমি কেবল তাঁর কথিত বস্তুটিকেই ধ'রে দিলাম।

মেডিসিনে গোল্ড মেডাল নিয়ে ভুবনমোহন যখন মেডিকেল কলেজ থেকে বেরুল তখন তার বয়স ছাব্বিশ। তখনও নামের সঙ্গে চেহারার বেশ মিল। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গৌর, টানা টানা নাক চোখ। মাথায় ঘন কালো চুল। ঠোঁটের ওপর সুন্দর সুকৃষ্ণ একটি গোঁফ। কিন্তু মুখে স্বাভাবিক প্রসন্ন হাসিটুকু নেই। কারণ মাস তিনেক আগে বাবা মারা গেছেন। আর মাত্র অল্প ক'দিনের জন্যে তিনি ভুবনের সাফল্যের খবরটুকু শুনে যেতে পারলেন না। অথচ এই দিনটির জন্যে তিনি ছ' বছর ধ'রে অপেক্ষা করেছেন। শুধু ছ' বছর কেন, ষোল বছরও বলা

যায়। ভুবনের স্কুলের গোড়ার ক্লাসগুলি থেকেই তাঁর সেই প্রতীক্ষা। তখন থেকেই তিনি ভুবনকে জিজ্ঞেস করতেন, ‘আচ্ছা বলতো খোকা, বড় হয়ে কি হবে তুমি? জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার—কি হ’তে চাও বল।’

বাবার ইচ্ছে যে ডাক্তার হওয়া, তা তিনি আগেই ব’লে রেখেছিলেন। তবু জজ, ম্যাজিস্ট্রেট শব্দগুলির দিকে মাঝে মাঝে লোভ যেত ভুবনের। রোজই কি আর এক ডাক্তার হ’তে ভালো লাগে!

কিন্তু পরে যখন আরো বড় হোলো, বাবার ইচ্ছেটা মনের মধ্যে একেবারে মুদ্রিত হয়ে গেল। না, ডাক্তার ছাড়া ভুবন আর কিছু হবে না। ডাক্তার—বড় ডাক্তার।

জমিদার বাড়ির চ্যারিটেবল ডিসেপেনসারির সাধারণ একজন কম্পাউণ্ডারের ছেলের বড় ডাক্তার হওয়া বড় সোজা ব্যাপার নয়। এই নিয়ে ভুজঙ্গমোহনকে পাড়া-প্রতিবেশী সহকর্মীদের কাছে অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে। গোড়ার দিকে ভুবনের স্টাইপেণ্ডের টাকায় কিছু কিছু এগিয়ে গেলেও ভুজঙ্গমোহনকে পরে অনেকের কাছে হাত পাততে হয়েছে, অনেক রকম সাহায্য নিতে হয়েছে। ধার-দেনাও কম হয় নি। সে ধার যে শুধু হাতে জুটেছে তা নয়। সামান্য যা কিছু জোত জমি ছিল, যে ক’খানা গয়না ছিল স্ত্রীর গায়ে, সব বন্ধক পড়েছে, সব কিছুর বদলে এই সোনার মেডাল। তবু এই মেডাল দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না ভেবে মনে মনে বিমর্ষ হোলো ভুবন।

মা লিখেছেন, ফল বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসবে। কিন্তু তার আগে আরো একজনকে মেডালটা দেখিয়ে আসা দরকার। প্রীতি-লতাকে। ব্যারিস্টার নগেন বাঁড়ুয্যের মেয়ে প্রীতিলতা। বেথুন কলেজ থেকে গতবার বি. এ. পাশ করেছে।

কাঠগোলাপ

তাদের ভবানীপুরের বাড়িতে বাবাই এক দিন নিয়ে গিয়েছিলেন, ভুবনকে। ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার সময় সে বাড়িতে দূর সম্পর্কের আত্মীয় আর দরিদ্র ছাত্র হিসাবে ভুবন বছর দুই স্থানও পেয়েছিল। তখন থেকেই আলাপ। তারপর মেডিক্যাল মেসে এসে আশ্রয় নেয় ভুবন। কারণ, তাকে বেশী দিন নিজের বাড়িতে রাখা নগেনবাবু যে পছন্দ করছেন না তা ভুবন টের পেয়েছিল। আর টের পাওয়ার পর সেখানে থাকাটা নিজের সম্মান-রক্ষার পক্ষে মোটেই তার অনুকূল মনে হয় নি, তবু যাতায়াত দেখাশোনা মাঝে মাঝে, এমন কি, সপ্তাহে সপ্তাহে চলেছে। বাড়ির অন্য সব যুবক আগন্তুকদের তুলনায় ভুবনের ওপরই যে প্রীতির পক্ষপাতিত্ব বেশী, তাও কারো অজানা থাকে নি।

ভুবনের মেডাল দেখে প্রীতির বাবা-মা খুব খুশির ভাব দেখালেন। কিন্তু প্রীতির খুশিটা নিজের চোখে দেখল ভুবন।

একটা নির্জন ঘরে প্রীতি ভুবনকে ইসারা ক'রে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর বলল, 'কই, দেখি কি মেডাল পেয়েছ?'

ভুবন স্মিতমুখে মেডালটা ওর দিকে এগিয়ে দিল। প্রীতি তার সুন্দর ছোট মুঠির মধ্যে মেডালটাকে লুকিয়ে বলল, 'যদি আর না দিই?'

ভুবন বলল, 'আমিও তো তা-ই চাই। ওটা তোমার কাছেই থাকুক।'

আলাপে ব্যাঘাত ঘটল। দোর ঠেলে আর একটি যুবক এসে ঘরে ঢুকল, 'প্রেটি, তুমি এখানে? আর আমি সারা বাড়ি ভ'রে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

অরুণ চক্রবর্তী। বিলেত থেকে সদ্য ব্যারিস্টারি পাশ ক'রে এসেছে। হাইকোর্টে বেরুচ্ছে। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। বড় কথা ওর বাবার

খান দুই বাড়ি আছে কলকাতা সহরে, আর ব্যাঙ্কে টাকা। প্রীতিদের চাইতে আর্থিক আভিজাত্যে ওরা অনেক বড়। তবু যে প্রীতির ওপর তার হৃদয় এতখানি উন্মুখ হয়ে উঠেছে, প্রীতির বাবার ধারণা, তা শুধু অরুণের সহৃদয়তার জন্যেই। নইলে ওদের সমাজে প্রীতির মত অমন শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ের তো আর অভাব নেই!

ভুবনকে দেখে অরুণ 'সরি' বলে ভদ্রতার ভাণ ক'রে চলে আসছিল, প্রীতিই তাকে ডাকল, 'দেখ, ভুবন কেমন সুন্দর একখানা মেডাল পেয়েছে।'

অরুণ বলল, 'তাই নাকি! কিন্তু বিষয়টা তোমার কাছে যেমন নতুন লাগছে, আমার কাছে তেমন মনে হচ্ছে না। বছর বছর ছাত্রেরা অমন অনেকগুলি ক'রে মেডাল পায়। ছাত্র বয়সে আমিও কম পাইনি।'

ব'লে অরুণ বেরিয়ে আসছিল, মেডালটা তাড়াতাড়ি ভুবনের হাতে গুঁজে দিয়ে প্রীতি বেরিয়ে এল তার পিছনে পিছনে। অরুণকে চটাতে তার সাহস নেই। তাতে বাবা চটবেন।

ভুবন সবই বুঝল। অলক্ষ্যে এক সময় বেরিয়ে এল ব্যারিস্টারের বাড়ি থেকে। এক মুহূর্তও তার আর কলকাতায় থাকবার ইচ্ছে রইল না।

তবু মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রে ফের আসতে হোলো কলকাতায়। মেডিকাল কলেজে হাউস সার্জন থাকতে হবে মাস কয়েক। ছ' মাসের জায়গায় বছর খানেক রইল। আরো ক'বার ঘোরাঘুরি করল ভবানীপুরে। কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। প্রীতির বাবা-মা অরুণের পক্ষে। প্রীতির যুক্তি-বুদ্ধির সায়ও সেই দিকে। শুধু অবুঝ মন মাঝে মাঝে একটু কেমন কেমন করে। কিন্তু সেই কেমন করার ওপর আর কতখানি নির্ভর করা যায়।

তবু প্রীতি একদিন ভুবনকে ডেকে বলল, 'তুমি একবার বিলেত থেকে ঘুরে আসতে পারো না? বাবা বলছিলেন, শুধু এখানকার একটা সার্টিফিকেটের কী মূল্য আছে?'

বিলাত যাওয়ার স্বপ্ন ভুবনের মনেও ছিল। সরকারী বৃত্তিটা যাতে জোটানো যায়, তার জন্যে চেষ্টা-চরিত্র কম চলছিল না। অধ্যাপকেরাও যথেষ্ট সাহায্য করছিলেন। কিন্তু প্রীতির কথার ভঙ্গিতে ভুবনের মন বেঁকে দাঁড়াল, রূঢ়স্বরে বলল, 'তোমার বাবার মতামতটা আমার কাছে খুব মূল্যবান নয়। তুমি নিজে কি বল?'

প্রীতি বলল, 'কেন, বাবা কি এমন অন্যায় বলেছেন? বাইরের ডিগ্রী ছাড়া প্রেস্টিজ বাড়ে নাকি?'

ভুবন জবাব দিল, 'বাইরে যদি যাই, প্রেস্টিজের লোভে যাব না, শিক্ষার জন্যেই যাব। তোমার বাবাকে ব'লে দিয়ো কথাটা।'

প্রীতি না বললেও কথাটা তার বাবার কানে গেল। তিনি মুখ গম্ভীর ক'রে মনে মনে সঙ্কল্প স্থির ক'রে ফেললেন।

কি একটা কারণে বৃত্তিটা ভুবনের হাত থেকে ফস্‌কে গেল। অরুণের সঙ্গে প্রীতির এনগেজমেণ্টের খবরটা যথাকালে ভুবনের কাছে পৌঁছল। এত তাড়াতাড়ি এসব ঘটবার কোন কথা ছিল না। প্রীতির বাবার জেদের জন্যেই যে এমন হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। কিন্তু প্রীতিকেও ভুবন ক্ষমা করতে পারল না। প্রীতির কি বয়স হয়নি, সে কি লেখাপড়া শেখেনি? তার কি কোন স্বাধীন মতামত নেই? সে কি তার বাবার হাতের একটি রঙীন খেলনা? স্প্রিং-দেওয়া পুতুলের মত তাদের ওই ছোট সামাজিক গণ্ডীর মধ্যে ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াবার জন্যেই কি তার সৃষ্টি? এতদিনের এত প্রতিশ্রুতি, এত আশ্বাস, এত বৈপ্লবিক কল্পনা, বাঁধ ভেঙে বেরুবার এত সাধ—সব

এত সহজে মিথ্যে হয়ে গেল? এতদিন ধ'রে প্রীতি কি তার সঙ্গে শুধু ছলনা করেছে? সমস্ত মেয়েজাতটার ওপর ঘৃণা আর বিদ্বেষে মন ভ'রে উঠল ভুবনমোহনের। কলকাতা সহরটাকে মনে হোলো রসহীন রঙহীন ছেলেবেলার ভূগোলে পড়া আরব্য মরুভূমি। কোথাও কোন জায়গায় মরূদ্যানের চিহ্ন মাত্র নেই।

আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার বাবার উপদেশের কথা। 'পাশ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে সহরে থেকো না, গাঁয়ে চলে এসো। সহরে তো ডাক্তার কবরেজের অভাব নেই। কিন্তু বিশ পঁচিশ গ্রাম খুঁজলেও একজন বড় ডাক্তার বের করা যাবে না। সবই আমার মত কম্পাউণ্ডার, আর না হয় হাতুড়ে। সহরে কে কাকে চেনে? কিন্তু এখানে একবার পশার জমিয়ে বসতে পারলে দেশ সুদ্ধু নাম-যশ ছড়িয়ে পড়বে। লোকে বলবে ভুজঙ্গ মুখুয্যের ছেলে যাচ্ছে। তা ছাড়া গাঁয়ের গরীব-দুঃখীর উপকারও করা হবে। এত কষ্ট এত পরিশ্রম বৃথা যাবে না। ধর্মও হবে, অর্থও হবে। মুখ উজ্জ্বল হবে পিতৃ-পুরুষের।'

মনে মনে অনুতাপ হোলো ভুবনের। সেই উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ব'লেই তার ভাগ্যে এই দুঃখ, এই বঞ্চনা। সঙ্কল্পের কথা বন্ধুদের জানাল ভুবন, বলল, 'এখানে আর নয়। আমি গ্রামে গিয়ে প্র্যাকটিস করব ঠিক করেছি।'

বন্ধুরা হেসে উঠল, 'বল কি হে! পাগল না মাথা খারাপ, সহরে বর্তমান না থাকলেও ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু গ্রামে গেলে যে ভূত হয়ে যাবে। এখানে ব্যারিস্টার-কন্যা না জুটুক, উকিল-মুহুরীর কন্যাদের নেহাৎ অভাব হবে না। কিন্তু গ্রামে নোলক-পরা পাঁচী-পদ্মী ছাড়া যে আর কিছু জুটবে না কপালে।'

বন্ধুদের প্রগলভ পরিহাসে কান না দিয়ে মন স্থির ক'রে ফেলল ভুবন। সোজা চলে এল গ্রামে। মাকে বলল, 'আমি এখন থেকে এখানেই থাকব। আমাদের বৈঠকখানা ঘরে ডিসপেনসারি খুলব, মা। বাবারও সেই ইচ্ছেই ছিল।'

মা বললেন, 'কিন্তু এখানে কি কেউ তোকে ডাকবে? মান মর্যাদা দেবে কেউ? অন্ততঃ একটা মহকুমা সহর টহরে—'

ভুবন মাথা নেড়ে বলল, 'না সহরেও না, মহকুমাতেও নয়। হয় এখানে, না হয় কলকাতায়।'

মা একটু চিন্তা ক'রে বললেন, 'আচ্ছা, তাহ'লে এখানেই বোস। যে কদিন আছি, থাক আমার চোখের সামনে। বড়লোক হওয়া আমাদের কপালে নেই, তা আমরা হবও না। মায়ে পোয়ে কাছাকাছি যদি থাকতে পারি সেই ভালো। এখন দেখে শুনে একটা বিয়ে থা কর।'

বিরক্ত হয়ে ভুবন ধমক দিল মাকে, 'ও সব কথা বাদ দাও, ও সব কথা পরে হবে।'

কিন্তু আদর্শের অনুসরণ কল্পনায় যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবে তেমন হোলো না। পাড়াপড়শীরা, চাটুয্যেরা, বাঁড়ুয্যেরা, দত্তেরা, চৌধুরীরা সবাই কানাঘুষা করতে লাগল—কলকাতায় ডিসপেনসারি দিয়ে বসবার পয়সা জুটছে না ব'লেই ভুবনের এই দেশপ্রীতি। তা ছাড়া শুধু কি কাগজে কলমে ভালো ছেলে হলেই হয়, ডাক্তারীটা হাতেকলমের বিদ্যে। পশার জমাতে হ'লে সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, ক্ষমতা চাই আলাদা জাতের।

বছর খানেক কেটে গেল। এর মধ্যে দু' চারটি ছাড়া কল পেল না ভুবন। তাও পুরো ভিজিট আদায় হোলো না। ও পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তার নন্দ দাস ঠিক আগের মতই আসর জাঁকিয়ে রইল। বঙ্কী

জমিগুলি একটার পর একটা বিক্রি হয়ে যেতে লাগল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সবই ভাগ্য! এবার কি একটা চাকরি-বাকরি খুঁজবি! সরকারী হাসপাতালগুলিতে দেখবি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে?'

ভুবন গম্ভীর মুখে বলল, 'দেখি ভেবে।'

কিন্তু ভাববার অবকাশই কি সব সময় মেলে? রোগীহীন শূন্য ডিসপেনসারিতে ভুবন সেদিন আগাগোড়া ব্যাপারটা ভেবে দেখবার চেষ্টা করছিল, ফতুয়া গায়ে, কপালে তিলক কাটা পাশের গাঁয়ের হরিচরণ কুণ্ডু এসে হাজির হোলো, 'এই যে বাবাজী, বাড়িতেই আছ দেখছি।'

ভুবন বলল, 'হ্যাঁ, কলে এখনো বেরুই নি। তা কি ব্যাপার কুণ্ডু মশাই? বাড়িতে অসুখ বিসুখ আছে না কি?'

হরিচরণ বলল, 'না বাবাজী, মহাপ্রভুর কৃপায় দেহ সকলের সুস্থই আছে। কিন্তু মনে শান্তি নেই।'

ভুবন বলল, 'কেন বলুন তো?'

হরিচরণ বলল, 'না, বাবাজী, মহাপ্রভুর পত্র একেবারে বন্ধ হয়ে গেল যে। এই তো সেদিন ফতেপুরের কাছে লবণের নৌকোটা অমন ক'রে ডুবে গেল। যাকে বলে একেবারে ঘাটে এসে ভরাডুবি। একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছি বাবাজী। আমার টাকা ক'টা এবার ফেলে দাও। আর তো দেরি করতে পারিনে। তা হ'লে উপোস ক'রে মরব।'

তার পড়ার খরচ জোগাবার জন্যে এই মহাজনের কাছ থেকেও শ' পাঁচেক টাকা ভুবনের বাবা এক সময় ধার নিয়েছিলেন। ভুবনের হিসেব মত তার শ' তিনেক টাকা শোধ দেওয়াও হয়েছে। কিন্তু হরিচরণ বলে, সে সব গেছে সুদের থেকে। আসলটা পুরোপুরিই রয়ে গেছে। টাকাটা তো আর কম দিন ফেলে রাখেনি হরিচরণ! ভুবন বলল, 'আচ্ছা, আজ তো যান আপনি।'

হরিচরণ বলল, 'আজ যাচ্ছি। কাল বাদে পরশু দিনই কিন্তু আমি আবার আসব। তুমি এর মধ্যে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা রেখো। না হ'লে আমি আর পারব না।'

ভুবন বলল, 'আচ্ছা ভেবে দেখি।'

টেবিলের ওপর পা তুলে আর গালে হাত দিয়ে ফের ভাবতে বসল ভুবন। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারল না, বিটের পিওন এসে ডেকে তুলল, 'ঘুমুচ্ছেন না কি ডাক্তার বাবু? চিঠি আছে আপনার।'

খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে রঙীন চিঠিখানা বের করল ভুবন। দার্জিলিং থেকে প্রীতি লিখেছে, 'অরুণকে যত অনুদার ভেবেছিলাম আসলে সে তা নয়। বিয়ের পর থেকে সে প্রায়ই বলছে তোমার কথা। বিশেষ ক'রে এখানে এসে সে রোজই তোমাকে আসতে বলছে। এই চিঠিও তার অনুরোধেই লেখা। সত্যি, ক'দিনের জন্যে এসোনা এখানে? আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে না হয় ক'দিন থাকলেই বা। দোষ কি? যা ঘটে গেছে, তা তো ঘটেই গেছে। ব্যাপারটাকে Sportsman-এর মত নেওয়াই ভালো। জীবনে খেলার মাঠে গেলে না। এবার জীবনটাকেই খেলার মাঠ হিসেবে দেখতে শেখ।

আর একটা কথা। গাঁয়ে গিয়ে অমন ক'রে অজ্ঞাতবাস করছ কেন? কেন জীবনটাকে নষ্ট করছ? লোকে বলে নাকি আমার জন্যেই! ছি ছি ছি! আমি লজ্জায় আর বাঁচিনে। পুরুষ মানুষের কি এমন আত্মহত্যা সাজে! সব ছেড়ে ছুড়ে কলকাতায় যাও। আর তার আগে এসো এই দার্জিলিংএ। দেখ এসে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় সূর্যোদয়। মনের সব অন্ধকার ঘুচবে।

কোন রকমে গাড়ি-ভাড়াটা জুটিয়ে চলে এসো। আর কিছু তোমাকে ভাবতে হবে না।'

কাঠগোলাপ

চিঠিটা মুচড়ে ঘরের কোণে ফেলে দিল ভুবন।

তবু তার প্রত্যেকটা লাইন যেন ছুঁচ হয়ে বিঁধতে লাগল ভুবনের গায়ে। স্বামী-স্ত্রীতে মিলে যুক্তি ক'রে নিশ্চয়ই এই চিঠি লিখেছে। ভুবনকে উপহাস করার জন্যে, তাকে আঘাত দেওয়ার জন্যেই প্রীতির এই চেষ্টা। আত্মহত্যা! বয়ে গেছে ভুবনের তার জন্যে আত্মহত্যা করতে। বরং প্রীতিকে যদি সে সামনে পেত একবার, নারীহত্যা ক'রে দেখত হাতের সুখ মিটিয়ে। হ্যাঁ, প্রীতিকে সামনে পেলে সে নিশ্চয়ই হত্যা করত। শোধ নিত সব জ্বালার, সব অপমানের।

দুপুর গেল, বিকেল গেল, উতরে গেল সন্ধ্যা; অশান্তি আর অস্বস্তি যেন আর কাটে না ভুবনের। দু'খানা মুখ কখনো পর পর, কখনো পাশাপাশি ভেসে উঠতে লাগল ভুবনের চোখের সামনে। হরিচরণ কুণ্ডু আর প্রীতি। এখন প্রীতিলতা চক্রবর্তী। মুখের আদল একজনের গোল, একজনের লম্বা। কিন্তু ভিতরটা একরকম, দুজনেই শঠ, দুজনেই শয়তান। ওদের দুজনের বিয়ে হ'লে বেশ হোত। সেই অপূর্ব মিলন-দৃশ্যটা কল্পনা ক'রে নিজের মনেই হেসে উঠল ভুবন ডাক্তার।

আর একটু বাদেই দেখা মিলল তৃতীয় একখানা মুখের। ঘন কালো চাপ দাড়িতে সে মুখ আচ্ছন্ন, তবু তার হিংস্রতা যেন একটুও চাপা পড়েনি। একটা চোখ না থাকায় সে মুখের বীভৎসতা আরো বেড়েছে।

পরনে লুঙ্গি, গায়ে মেরজাই, হাতে সাধারণ একখানা ছড়ি, সেখপাড়ার জনাব আলী খাঁ এসে ঘরে ঢুকল, 'এই যে ডাক্তারবাবু, নিজে নিজেই হেসে কুটি-পাটি। খোয়াব দেখছেন নাকি? দুনিয়ার কোন্ রঙ্গ তামাসা দেখলেন খোয়াবের মধ্যে?'

ভুবন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'আসুন খাঁ সাহেব, বসুন এসে, অসুখ বিসুখ আছে নাকি বাড়িতে? এত রাত্রে যে? ব্যাপার কি?'

এর আগে জনাব আলীই তাকে বার দুই কল্ দিয়েছে। তাই ভুবন খুব খাতির করল জনাবকে। চেয়ারটা এগিয়ে দিল সামনে।

জনাব আলী চেয়ারটায় বসে বলল, 'অসুখ বিসুখ তো আছেই, বিনা অসুখে কি কেউ ডাক্তারের বাড়ি আসে? বড় শক্ত ব্যামো ডাক্তার, বড় শক্ত ব্যামো। সারিয়ে দিতে পারলে—' হাতের পাঁচটা আঙুল উঁচু ক'রে দেখাল জনাব; মুখেও বলল, 'পাঁচ শ' টাকা। তোমাদের মায়ে-পোয়ের সংসার। পুরো একটা বছর পায়ের ওপর পা তুলে ব'সে ব'সে খাবে। রোজগারের চেষ্টা করতে হবে না।'

ভুবন বলল, 'তা তো বুঝলুম। অসুখটা কি?'

জনাব আলী বলল, 'বলছি।'

তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে ডেকে বলল, 'ও মনাই, ঘরে আয়। বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলি নাকি? দুঃখে সরমে ছেলেটা একেবারে মনমরা হয়ে রয়েছে ডাক্তার। কাউকে মুখ দেখাতে চাইছে না, আয় মনাই, ঘরে আয়। ডাক্তারবাবুর কাছে সব খুলে বল।'

জনাই খাঁর ছেলে মনাই খাঁ এল ভিতরে। তাকেও একটা চেয়াব দিল ভুবন। চব্বিশ পঁচিশ হবে মনাইর বয়স। কালো শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখের আদলটা বাপের মত। চাপ দাড়ির বদলে নূর আছে থুতনিতে।

ভুবন ভাবল ওরই কোন গোপন অসুখ বিসুখের কথা হবে বুঝি, ঘরে স্ত্রী থাকলেও বাপ-বেটা দুজনেরই দুশ্চরিত্রতার অপবাদ আছে।

ভুবন বলল, 'কি, তোমার অসুখটা কি মনাই? এখানে তোমার বা'জানের সামনে বলবে, না ভিতরে যাবে?'

বাপের ইশারায় মনাই খাঁ কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'নুরু আমাকে নাথি মেরেছে ডাক্তারবাবু। এলোপাথারি নাথি মেরেছে।'

ভুবন বিস্মিত হয়ে বলল, 'নুরু! নুরু কে?'

জনাই খাঁ উঠে এসে ভুবনের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'চল, ডাক্তার, তোমার ভিতরের কামরায় চল। আমি সব বলছি। ও এক ফোঁটা ছেলে। ওর কি সব কথা গুছিয়ে বলবার বুদ্ধি হয়েছে!'

জনাই খাঁকে নিয়ে ভুবন উঠে এল পাশের কামরায়, তারপর তার সব কথা মন দিয়ে শুনল।

নুরু মানে নুরুন্নেসা। জনাই খাঁর উনিশ কুড়ি বছরের ভাইঝি। মৃত জমির আলী খাঁর একমাত্র মেয়ে। খাঁ-দের মাঠের এক শ' বিঘা জমির অর্ধেক অংশীদার। এত সম্পত্তির মালিক হয়ে মেয়েটার মাথা বিগড়ে গেছে। না হ'লে চাচার কথা অমান্য করে! যে চাচা কোলে পিঠে ক'রে তাকে মানুষ করেছে, ভালো-মন্দ খাইয়েছে পরিয়েছে। জনাই খাঁ ভালো প্রস্তাবই করেছিল, 'আমার মনাইকে তুই সাদি কর নুরু। দুজনে মিলে মিশে বাড়িতে এক ঘরে থাকবি। আমার মাঠের জমিও ভাগ হয়ে অন্যের চাষে যাবে না।'

কিন্তু নুরুন্নেসার সে কথা পছন্দ হোলো না, সে জিভ কেটে বলল, 'তুমি কও কি চাচা! মনাইরে আমি তো সে চোখে দেখিনি।'

আরে সম্পর্ক বদলালে চোখ বদলাতে কতক্ষণ লাগে? কিন্তু মেয়েটা আসলে দজ্জাল। সব ওর বদমায়েসি। প্রথমে সাদি বসল হোসেনপুরের আফাজদ্দি সেখের সঙ্গে। সে যতদিন ছিল, মোটেই সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করেনি। দজ্জাল মেয়েটার স্বভাব তো

ভালো নয়। মারপিট ঝগড়া-ঝাটি খুব চলত। তারপর আফাজদ্দি ম'রে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এখন জনাই খাঁ ফের তুলেছে সেই প্রস্তাব। সাদি কর মনাইকে। মনাইর আগের যে বউটা আছে, তাকে তালাক দিতে কতক্ষণ! ছেলেপুলের ঝামেলা তো কারোরই নেই, মনারইও না, মুরুন্নেসারও না। তাই এ নিকে সেই প্রথম বয়সের সাদির মতই মধুর হবে। কিন্তু বদমাস মেয়েটা এবারও গররাজী। বলে, 'না, আমি আর নিকে সাদির মধ্যে নেই।' অথচ ভিন্ গ্রাম থেকে দু' একটি ক'রে বিয়ের সম্বন্ধ ওর আসছেই। আনাগোনা চলছে ঘটকের। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ও নিজেই তাদের সঙ্গে কথা বলছে। ঘুরঘুর করছে সুন্দর সুন্দর সব তরুণের দল। মুরু তাদের অনেকের সঙ্গেই নষ্ট। নিজের চোখের ওপর সব সহ্য করতে হচ্ছে জনাই খাঁকে। মনাইকে পাঠিয়েছিল একটু বুঝিয়ে শুনিয়ে বলতে, সাবধান ক'রে দিতে। মুরু তাকে অপমান ক'রে ঘর থেকে বের ক'রে দিয়েছে। মেয়ে মানুষের এই বেলাল্লাপনা কি সহ্য করতে হবে? ভুবন ডাক্তার কি বলে? সংসারে যত দুর্গতি, যত দুঃখকষ্টের মূল এই মেয়েমানুষ। এ কথায় কি ভুবন ডাক্তারের সায় নেই?

ভুবন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কিন্তু আমি এর কি করতে পারি?'

করতে পারে বইকি। ডাক্তারের এতে কিছু করবার আছে ব'লেই তো জনাই খাঁ এত রাত্রে তার কাছে ছুটে এসেছে। ক'দিন ধ'রে মুরুন্নেসা জ্বরে বড় কাতর। গায়ে পায়ে ব্যথাও আছে। তার জন্যেই দাওয়াই নিতে এসেছে জনাই খাঁ। এমন দাওয়াই কি ডাক্তারের আলমারীতে নেই, যাতে সব দুঃখ, সব জ্বালার শান্তি হয়? এক সঙ্গে সকলেই জুড়োতে পারে?

ভুবন শিউরে উঠল, 'তুমি বলছ কি খাঁ সাহেব?'

জনাই খাঁ বলল, 'আস্তে ডাক্তার, আস্তে। ঠিক কথাই বলছি। দাওয়াই তুমি না দাও, আর কেউ দেবে। কিন্তু তোমাকে আর জীবনে দাওয়াই দিতে হবে না। তোমার দাওয়াই আমিই আজ রাত্রে বাতলে দিয়ে যাব।'

ব'লে জামাটা তুলে ফেলে একখানা ছোরা বার করল জনাই খাঁ। আর একদিক থেকে বার হোলো এক তাড়া নোট।

তারপর জনাই খাঁ হেসে বলল, 'নাও ডাক্তার, বেছে নাও যা তোমার পছন্দ।'

মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে থেকে ভুবন বলল, 'কিন্তু একথা যদি কেউ জানতে পারে?'

জনাই খাঁ ফের একটু হাসল, 'ক্ষেপেছ ডাক্তার? এসব কাজ কি জনাই খাঁর নতুন, যে কেউ জানতে পারবে? কাক পক্ষীটিও জানতে পারবে না। কাঁচা বয়স থেকে জনাই খাঁ কোনদিন কাঁচা হাতে কাজ করেনি। আর এখন তো হাত পেকে গেছে। তোমাকে কষ্ট দিতাম না ডাক্তার, নিজের হাতেই সব দিতাম শেষ ক'রে। কিন্তু নেহাত কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, তাই। আজ থেকে তুমি আমার ডান হাত হয়ে রইলে ডাক্তার, দোস্ত ব'লে। তোমার কোন ভাবনা নেই আর।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'কত আছে এখানে?'

জনাই খাঁ বলল, 'পাঁচ শ'।'

ভুবন বলল, 'পাঁচ শ'তে কি হবে! আমার ওষুধের দাম পাঁচ হাজার।'

জনাই খাঁ হেসে বলল, 'সাবাস, সাবাস! এই তো ঠিক দোস্তের মত কথা বলছ, কোলাকুলি হচ্ছে সেয়ানে, সেয়ানে। তুমি যা চাইছ, তাই

দেব ডাক্তার। তবে এক সঙ্গে পারব না। ক্রমে ক্রমে। আজ এই রাখ। কাল আবার ফের পাঁচ শ। ভালোয় ভালোয় সব চুকে যাক। তোমার সব পাওনা মিটিয়ে দেব, জনাই খাঁর জবানকে কেউ অবিশ্বাস করে না। সঙ্গী-সাকরেদদের কাউকে এক পয়সা ঠকায় না জনাই খাঁ। তাহ'লে কি কারবার চলে ডাক্তার?'

ভুবন নোটের তাড়াটা কম্পিত হাতে টেনে নিল। হ্যাঁ, জনাই খাঁর দোস্তই সে হবে, সেই ভালো। এ ছাড়া তার আর কোন গতি নেই।

খানিক বাদে ওষুধের শিশি নিয়ে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ বাড়ি গেল।

যাওয়ার আগে জনাই খাঁ বলল, 'শেষ রাত্রের মধ্যেই সব মিটে যাবে তো? আমি আর সব ঠিক ক'রে রেখেছি। যত গোলমাল মাটির ওপরে। মাটির তলে আর কোন গোলমাল নেই ডাক্তার। সেখানে সব শান্তি। আজ রাত্রেই সব মিটবে তো?'

ভুবন ডাক্তার ফের ঘাড় নেড়ে সায় দিল, 'আজ রাত্রেই সব মিটে যাবে।'

রাত্রে খেতে গিয়ে খেতে পারল না ভুবন ডাক্তার, ঘুমুতে গিয়ে ঘুম এল না। সারা রাত এপিঠ ওপিঠ করতে লাগল।

পাশের ঘর থেকে মা বললেন, 'তোর কি বায়ুচড়া হয়েছে নাকি ভুবন? না কি ছারপোকায় কামড়াচ্ছে?'

ছারপোকার চেয়েও যে শক্ত বিষাক্ত পোকায় ভুবনকে কামড়াতে সুরু করেছে, সেকথা আর সে মাকে জানাল না।

পরদিন বেলা ন'টা দশটার সময় সেখ-পাড়ায় গোলমালটা খুব জোর শোনা গেল।

তার অনেকক্ষণ আগেই কবর দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে জনাই খাঁ আর মনাই খাঁ দুজনেই চোখের জল মুছছে। বাড়ির মেয়েরাও কাঁদছে উচ্চ চীৎকারে। এই সময় থানা থেকে দারোগা আর কয়েকজন পুলিশ-সেপাইকে নিয়ে এল লতিফ সিকদার। লতিফের সঙ্গেই সম্বন্ধ এসেছিল নুরুন্নেসার। আনাগোনাও চলছিল তার সঙ্গে কিছুদিন ধ'রে। মাত্র ক'দিনের সাধারণ জ্বরে নুরুন্নেসার মত স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে মারা গেছে, একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে অবিশ্বাস করেছে। কাউকে কিছু না ব'লে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটেছে থানায়। ছোটখাট একটি তালুকের মালিক লতিফ সিকদার। সম্পন্ন গৃহস্থ। থানাওয়ালাদের সঙ্গে আনতে তার বেশী বেগ পেতে হোলো না। জনাই খাঁর বিরুদ্ধে থানার আক্রোশও আগে থেকেই ছিল। গোটাকয়েক যোগা-যোগের কথা শোনা গিয়েছিল, তবু জনাই খাঁকে ধরা যায়নি। এই সুযোগ দারোগা সাহেব ছাড়লেন না। এসে জনাই খাঁর বাড়িঘর খানাতল্লাসী করলেন। কিছু পেলেন না। নুরুন্নেসার ঘর আর তার আনাচে কানাচে তল্লাস ক'রে ভাঙা একটা মিকশ্চারের শিশি মিলল। তিনি সেটাকে পকেটে পুরলেন। তারপর সব শুনে সব জবানবন্দী নিয়ে বললেন, 'এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে। কবর খুঁড়ে শব বার করতে হবে।'

জনাই খাঁ অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে যে কেউ থানা-পুলিশ করবার সাহস করতে পারে, একথা সে ভাবতে পারেনি। লতিফ সিকদারের ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, জনাই খাঁ তা সময় মত দেখে নেবে।

দারোগা সাহেবের প্রস্তাবে সে জিভ কেটে বলল, 'একি বলছেন আপনি! নিজেও তো আপনি মুসলমান। মুসলমান হয়ে এমন কথা

আপনি বললেন কি ক'রে! এমন গুণাহ্‌র কাজ আমি করতেই দিতে পারিনে। সমস্ত মুসলমান তাহ'লে দোজখে যাবে।'

দারোগা সাহেব বললেন, 'কিন্তু এর একটা ফয়সালা না করলে আমাকেও দোজখে পচে মরতে হবে। সন্দেহ যখন হয়েছে, কবর না খুঁড়লে চলবে না।'

জনাই খাঁ স্থানীয় মোল্লা-মুন্সী-মৌলভীদের সভা বসাল। তারা সবাই রায় দিল, এমন অশাস্ত্রীয় কাজ চলতেই পারে না। মুসলমানের কবর ভাঙার নিয়ম নেই। যে শান্তিতে ঘুমিয়েছে, তার শান্তিভঙ্গ ক'রে পাপের ভাগী হ'তে যাবে কোন্ মূর্খ?

কিন্তু লতিফ সিকদার আর একদল মোল্লা-মুন্সীকে এনে হাজির করলো, তারা ঠিক উল্টো কথা বলতে লাগল। নজীর দেখাল, সন্দেহস্থলে এমন আরো কোন্ কোন্ জায়গায় কবর খুলে ফেলা হয়েছে।

জরুরী টেলিগ্রাম ক'রে দারোগা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি আনিয়ে নিলেন।

ঠিক সন্ধ্যার সময় কবর খোঁড়া সুরু হোলো। বড় একটা চটান জায়গায় খাঁ-দের কবরখানা। পাঁচ সাত জন লোক কোদাল হাতে খুড়তে লাগল।

গ্রামের সবাই এসে ভেঙে পড়েছে সেই কবরখানায়, গ্রেপ্তার ক'রে আনা হয়েছে জনাই খাঁ ও মনাই খাঁকে। জনকয়েক পুলিশ-সেপাইর পক্ষে জনতা-নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে। কিন্তু খুব যে তেমন একটা গোলমাল হচ্ছে তা নয়, খানকয়েক কোদালের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। রুদ্ধশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করছে কবর থেকে কি ওঠে তাই দেখবার জন্যে।

এদিকে বড় হয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। পূর্ণিমার কাছাকাছি তিথি।

সমস্ত মাঠ ঘাট, আশেপাশের গাছপালাগুলির ডাল-পাতা জ্যোৎস্নায় চিক চিক করছে। তাল তাল জ্যোৎস্না জমে রয়েছে নুরুন্নেসার কবরের চারদিকে।

তারপর ধীরে ধীরে তোলা হোলো শবদেহ। আর একবারের জন্যে শুধু সরিয়ে ফেলা হোলো নুরুন্নেসার মুখের আবরণ। আকাশের আর একখানা চাঁদ। কিন্তু মরা চাঁদ, ছেঁড়া চাঁদ, বিষে নীল বিবর্ণ চাঁদ।

ভুবন ডাক্তার হঠাৎ অস্ফুট এক আর্তনাদ ক'রে উঠল। তারপর দু'-হাতে ঢাকল নিজের চোখ। জ্যোৎস্না-ঘেরা পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য মুছে গিয়েছে। পৃথিবীর অপরূপ সুন্দর প্রত্যেকটি মুখের ওপর কে যেন একখানা বিষাক্ত হাত দিয়েছে বুলিয়ে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হোলো জনাই খাঁর, কিন্তু যার সবচেয়ে বেশী শাস্তি হওয়ার কথা ছিল—সেই ভুবন ডাক্তারের হোলো মাত্র সাত বছর। প্রীতির বাবা আর স্বামী দুজনেই যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। অর্থ দিয়ে, বড় বড় আইনজ্ঞ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে সবরকম আনুকূল্য দেখিয়েছিলেন তাঁরা। কারণ ভুবনের মা তাঁদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিল, 'এবিপদে আপনারা ছাড়া আর আমার কেউ নেই।'

প্রীতি কোনদিন ভুবনের সামনে আসেনি, শুধু আড়াল থেকে সাহায্যের প্রেরণা জুগিয়েছে। একবার কেবল এসেছিল। নানা জেল ঘুরে আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে ভুবন তখন বদলী হয়েছে। একদিন পড়ন্ত বিকেলে ভুবনের মনে হোলো বড় বড় রড-দেওয়া দরজার ওপাশে প্রীতিলতা। হালকা চাঁপা ফুলের একখানা শাড়ি পরনে। গা-ভরা গয়না, সিঁথিতে সিঁদুর।

প্রীতি আস্তে আস্তে বলল, 'চিনতে পারছ?'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যাবে, দেখতে পেল ওর মুখের ওপর সেই নুরুন্নেসার মুখ। সেই নিহত নীল বিবর্ণ সৌন্দর্য। চেনা আর হোলো

না, কথা বলা আর হোলো না। ভুবন দু' হাতে ফের চোখ ঢাকল। খানিক বাদে চোখ যখন খুলল, প্রীতি চলে গেছে। প্রীতি চলে গেল, কিন্তু হুস্নেআরা গেল না। সে রোজ রাত্রে, গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে পা টিপে টিপে আসে। জেলের এতগুলি প্রহরীর চোখে ধূলো দিয়ে কি ক'রে যে আসে, সে-ই জানে!

প্রথমে খানিকক্ষণ কোদালের শব্দ হয় ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্—ঝপ্ ঝপ্ ঝপ্। হৃৎপিণ্ডের শব্দ হয় ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্—ঢিপ্ ঢিপ্ ঢিপ্ কবরের বাঁধ খুলে যায়, হৃদয়ের বাঁধ খুলে যায়। গুঁড়ো গুঁড়ো রাশ রাশ, চাপ চাপ মাটি দু'পাশে উথলে পড়তে পড়তে পথ খুলে দেয়। আর সেই অতল গভীর সুড়ঙ্গ-পথ বেয়ে পা টিপে টিপে উঠে আসে পরমা সুন্দরী, যৌবনবতী এক কন্যা। তার জাত নেই, ধর্ম নেই, কাল নেই, বয়স নেই, নাম নেই, পরিচয় নেই, আছে শুধু অফুরন্ত যৌবন আর পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোৎস্নায় গড়া সৌন্দর্য। ভুবনের সামনে সে এসে দাঁড়ায়। তার সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে প্রাণ-চাঞ্চল্য উদ্বেল হয়ে ওঠে। কাজল-কালো দুই চোখে ফুটে ওঠে কাতর মিনতি—'কথা বলো, কথা বলো। আমি যে তোমার কথা শোনার জন্যেই এতদূর থেকে এসেছি।'

কিন্তু ভুবন যেই কথা বলতে যায় অমনি দেখে সেই যৌবনবতীর দেহে প্রাণ নেই। তার দেহ শবদেহ। সেই জ্যোস্না-ধৌত, স্বর্ণবর্ণ মুখ বিবর্ণ, —নীল বিষে বিবর্ণ। ভুবন শিউরে চীৎকার ক'রে ওঠে।

কিছুদিন কথা চলেছিল কয়েদীর গারদ থেকে ভুবনকে পাগলা গারদে পাঠাবার। কিন্তু দিনের বেলায় ওর সুস্থ স্বাভাবিক ব্যবহার দেখে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হোলো, ওর পাগলামিটা আসলে পাগলামির ভান। এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রহরীদের প্রহারের মাত্রা দিনকয়েক বেশ বেড়েও গিয়েছিল।

তারপর একদিন খুলে গেল জেলগেট। ছাড়া পেল ভুবন। মা তার আগেই মারা গেছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন দেখে এল মাতৃভূমিকে। বাড়ি-ভরা আগাছার জঙ্গল আর কাঁটা গাছ। আর কোথাও কিছু নেই। শুধু নুরুন্নেসা নয়, জন্মের মত ভুবন ডাক্তারও কবরস্থ হয়েছে।

ফের কিছুদিন ঘুরে বেড়াল এখানে ওখানে ভবঘুরের মত। কিন্তু কোথাও শান্তি নেই, কোথাও পরিত্রাণ নেই নুরুন্নেসার হাত থেকে। কোথাও বিরাম নেই, শেষ নেই তার নৈশাভিসারের।

অবশেষে ভুবন ফের এল গাঁয়ের বাড়িতে। মুখের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভিটের কাঁটা গাছের জঙ্গল ফেলল কেটে। নিজেদের বারান্দায় চুপ-চাপ বসে থাকে, কারো কাছে যায় না। কারো সঙ্গে কথা বলে না। কিন্তু গ্রামবাসীরা তার চারপাশে ভিড় ক'রে আসে। এক অলৌকিক রহস্য যেন ঘিরে ধরেছে ভুবন ডাক্তারকে। সে রহস্যের কাছে যাওয়ার কারো সাহস নেই। শুধু দূর থেকেই তাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা চলে। আরো অলৌকিক, আরো আজগুবী গল্প বানিয়ে বানিয়ে সেই রহস্যকে আরো বিচিত্র ক'রে তোলা যায়। কিন্তু খুনী ভুবন ডাক্তারের কাছে যাওয়া যায় না, তাকে কাছে ডাকা যায় না। কি জানি যদি গলা টিপে ধরে! গলা টিপবারই বা দরকার কি, তার সংস্পর্শই যথেষ্ট। তার নিঃশ্বাসে বিষ, প্রশ্বাসে বিষ, ভুবন ডাক্তার বিষসিদ্ধ পুরুষ।

ভুবনের নিজেরও কোন উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই মানুষের সঙ্গে মিশবার। সামাজিক মানুষের সঙ্গে আদান প্রদানের সম্পর্ক রাখবার। গ্রামের প্রান্তে গরীব একঘর বুনো থাকে। তাদের শিকারের সঙ্গী হয় ভুবন। ভাগ পায় অন্নজলের।

এমনি ক'রে প্রায় বছর খানেক কাটবার পর হঠাৎ একদিন এক কাণ্ড ঘটল। দিনে নয় রাত্রে। বেশ খানিকটা রাত আছে। অমাবস্যার কাছাকাছি তিথি। নিকষ কালো অন্ধকার সমস্ত গ্রামটায় ছড়িয়ে পড়েছে। আশে-পাশের অতি-পরিচিত গাছপালাগুলির চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এক একটা গাছ যেন এক একটা ভূত। আর সেই ভূত-লোকে ভূতনাথ হয়ে বারান্দায় একটা বেতের মোড়া পেতে চুপচাপ ব'সে আছে ভুবনমোহন, ব'সে ব'সে দেখছে। নিঃশব্দে উপভোগ করছে এই প্রেতলোককে।

হঠাৎ সেই গাছপালার জঙ্গলের ভিতর থেকে একটি সত্যিকারের প্রেতিনী ছুটে এসে ভুবনের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, 'রক্ষে করো বাবা, রক্ষে কর, আমাকে বাঁচাও।'

ভূতাধীশ হয়েও ভুবন প্রথমটায় ভয় পেল, চমকে উঠল। ব্যাপার কি! প্রেতলোকেও মৃত্যুর ভয়! ঘর থেকে হ্যারিকেন নিয়ে এল ভুবন। এনে ধরল প্রেতিনীর মুখের সামনে। দেখল প্রেতিনী নয়, পাশের বাড়ির হারাণ ভট্টাচার্যের প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রী। কিন্তু প্রেতিনীর সঙ্গে তার বিশেষ তফাৎও নেই। রোগা, অস্থিসার চেহারা। পরনে খাটো আধময়লা ছেঁড়া একখানা থান। পিঠে কাঁধে চোখে মুখে শণের নুড়ির মত একরাশ চুল ছড়িয়ে পড়েছে।

তিনি আবার বললেন, 'আমাকে রক্ষে করো বাবা, আমাকে বাঁচাও।'

ভুবন ডাক্তার মনে মনে বলল, 'বাঁচাবার আমি কে? আমি তো মৃত্যু-সাধক, মৃত্যু-সিদ্ধ। কি করে বাঁচতে হয়, বাঁচাতে হয়, আমি ভুলে গেছি।

কিন্তু হারাণ ভট্টাচার্যের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলল অন্য ভাষায়, বলল, 'কি হয়েছে আপনার?'

'সর্বনাশ হয়েছে বাবা, সর্বনাশ হয়েছে! আমার নিমি বিষ খেয়েছে। নন্দ ডাক্তার বাড়িতে নেই। আর কেউ নেই তাকে রক্ষে করবার। শুধু তুমি পারো। তুমি পারো তাকে বাঁচাতে। তুমি নাকি অনেক মন্তর তন্তর শিখে এসেছ, অনেক গাছড়া পাথর নিয়ে এসেছ! সেই সব নিয়ে চল। তোমার সব গুণজ্ঞান দিয়ে আমার নিমিকে তুমি বাঁচিয়ে তোল।'

ভুবন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আচ্ছা চলুন।'

গোটা কয়েক জংলা পরিত্যক্ত ভিটে আর বাঁশঝাড় পার হয়ে ভুবন এসে পৌঁছল হারাণ ভট্টাচার্যের বাড়ি। সে বাড়িও জংলা, সে বাড়িও প্রায় পরিত্যক্ত। শুধু উত্তরের ভিটেয় জীর্ণ একখানা ছনের ঘর পড়ো-পড়ো হয়েও কোনরকমে আত্মরক্ষা করছে।

ভুবনকে নিয়ে তার ভিতরে ঢুকল নিমির মা। আঠার-উনিশ বছরের কালো রোগা কুদর্শনা একটি মেয়ে মেঝের ওপর একটা ছেঁড়া মাতুরে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। গাঁজলা বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে, ভুবন জিজ্ঞেস করল, 'কেন, বিষ খেল কেন?'

নিমির মা বললেন, 'সে কথা বলবার নয় বাবা। চাটুয্যেদের বীরেন বিয়ের লোভ দেখিয়ে ওর সর্বনাশ ক'রে সরে পড়েছে। আমি গোড়া থেকেই সাবধান করেছিলাম। অভাগী শুনল না, মরল, তারপর বিষ খেয়ে মরল।'

ভুবন ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে নাড়ী ধরল নির্মলার। এখনো জীবনের স্পন্দন আছে। আশা আছে এখনো। মুখ তুলে বলল, 'শিগ্‌গির লোকজনকে খবর দিন। নন্দ ডাক্তারের বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র আর ওষুধ-টষুধ নিয়ে আসুক, আমি লিখে দিচ্ছি।'

নির্মলার মা অবাক হয়ে বললেন, "তোমার গাছড়া, তোমার পাথর!"

ভুবন ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, 'যা বলছি তাই করুন আগে।'

খানিক বাদে উঠানে লোক ভেঙ্গে পড়ল। দরকারী জিনিসপত্রগুলিও পৌছল এসে। নির্মলার শিরা-উপশিরা থেকে সমস্ত বিষ নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়ার জন্যে তার সব জ্ঞান, সব বিদ্যে-বুদ্ধি প্রয়োগ করল ভুবন ডাক্তার।

শেষ রাত্রের দিকে রোগিণীর জ্ঞান হোলো, সে কথা বলল। প্রথমেই বলল, 'আমাকে বাঁচালে কেন?'

ভুবন ডাক্তার তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রত্যক্ষ করছিল প্রথম প্রাণসত্তাকে, রোগিণীর কথার জবাবে বলল, 'আমিও বাঁচব ব'লে।'

রোগিণীর মুখে মৃদু একটু হাসি ফুটে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুবন ডাক্তারের মনে হোলো, এ মুখ তার চেনা, এ মুখ সে দেখেছে, রোজ রাত্রে দেখেছে। এ সেই ন্যুরুন্নেসার পরম সুন্দর মুখ। কিন্তু এখন আর মৃত নয়, বিবর্ণ নয়, প্রাণবন্ত। জীবনের রসে, রঙে রূপময়। সেই রূপ অপলক চোখে ব'সে ব'সে দেখতে লাগল ভুবন ডাক্তার।

তারপর শুধু ওদের ঘরে ব'সে দেখলেই চলল না, নিজের ঘরেও নির্মলাকে নিয়ে আসতে হোলো।

নির্মলার মা বললেন, 'এত কলঙ্ক-কেলেঙ্কারীর পর ও হতভাগিনীকে আর কে নেবে? তুমি যখন বাঁচিয়েছ, তুমিই ওকে উদ্ধার কর। একা থাকলে অভাগী আবার কি কাণ্ড ঘটাবে কে জানে!'

দ্বিধাগ্রস্ত ভুবন ডাক্তার বলল, 'কিন্তু আমার তো বয়স হয়েছে।'

নির্মলার মা হেসে বললেন, 'পুরুষ মানুষের এ বয়স আবার একটা বয়স নাকি?'

কৃতজ্ঞ নির্মলার চোখেও একথার সাম্নুরাগ সমর্থন মিলল।

জনাই খাঁ ও মনাই খাঁর মৃত্যুর খবর গ্রামে আগেই এসে পৌঁছেছিল। কিন্তু বেঁচে ছিল লতিফ সিকদার। তখন ঘরে তার দু-দু'জন বিবি, আর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। তবু ভুবন ডাক্তারকে সামনে দেখে তার দুই চোখ আরক্ত হয়ে উঠল, রূঢ়স্বরে বলল, 'কি চান আপনি?'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'একটা হাসপাতাল খুলতে চাই। আপনি তার সেক্রেটারী হবেন। যে বিষ তাকে একদিন দিয়েছিলাম, প্রত্যেক রুগ্ন স্ত্রী-পুরুষের ভিতর থেকে সেই বিষ প্রাণপণে নিংড়ে বার করব। এ ছাড়া বাকী জীবনে আমার আর কোন কাজ নেই।'

লতিফ সিকদার বলল, 'সাহায্য আমি করতে পারি; কিন্তু সেক্রেটারীর পোস্টটি যেন ঠিক থাকে। শেষে যেন নড়চড় না হয়।'

ভুবন ডাক্তার বলল, 'মোটেই তা হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

লতিফ সিকদার তখন খুশী হয়ে বসতে দিল ভুবন ডাক্তারকে। পান-তামাকের ফরমায়েস পাঠাল অন্দরমহলে।

সোনারূপার মেডেলগুলি, সার্টিফিকেট, লাইসেন্স সবই বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। সেগুলি আর ফিরে এল না। কিন্তু একটু একটু ক'রে আসতে লাগল ভুবন ডাক্তারের খ্যাতি। রোগ-নির্ণয় আর চিকিৎসায় তার অসাধারণ দক্ষতার কথা সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ল। শুধু যশ নয়, অর্থাগমও হ'তে লাগল প্রচুর। বিপদই যে শুধু দল বেঁধে আসে তা নয়, সম্পদও দলবল ভালোবাসে।

কাহিনী শেষ করলেন ভুবন ডাক্তার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নুরুন্নেসাকে এখনও কি স্বপ্নে দেখেন আপনি?'

সাদা মাথা নেড়ে সায় দিলেন ভুবন ডাক্তার।

দেখেন বইকি। তাকে এখনও মাঝে মাঝে দেখতে পান ভুবন ডাক্তার। সেই স্বপ্নচারিণীর নৈশাভিসার আজও শেষ হয় নি। এখনও মাঝে মাঝে আসে এক একটি জ্যোৎস্না-ধবল রাত। কোদালের কোপে দ্বিধাবিভক্ত মাটি তার সুড়ঙ্গ-পথ খুলে দেয়। আর তার ভিতর থেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে আসে সেই অপরূপ লাবণ্যবতী, পরম রমণীয়া কন্যা। ভুবন ডাক্তারের বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ ঢিপ ঢিপ শব্দ হয়। ঘামে ভিজে যায় সর্বাঙ্গ। শেষে স্ত্রী তাঁকে ডেকে জাগিয়ে তোলেন।

'আমার স্ত্রী বলে কি জানেন?—নুরুন্নেসা আমার সতীন।'

ভুবন ডাক্তার উঠে দাঁড়ালেন।

আমি হেসে মুখ তুলে তাকাতেই দেখলাম আর একখানা হাসি-মুখ দরজার ওপাশ থেকে স'রে গেল।

সারিবদ্ধ কালো কালো তালগাছগুলির পূবদিকে ওপারে সোনালী আভাস দেখা দিয়েছে। এক্ষুনি চাঁদ উঠবে।

ভুবন ডাক্তার বাইরের দিকে পা বাড়ালেন। হাসপাতালে যাওয়ার সময় হয়েছে।

টর্চ

ছটায় শো, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে সুরমা যখন শো-হাউসের সিঁড়িতে এসে পা দিল তখন দেয়াল-ঘড়িতে ছ'টা বেজে বার মিনিট হয়ে গেছে।

স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সুরমা বলল, 'তোমার মত কুঁড়ে তো আর দু'টি নেই, উঠতে বসতেই ছ' মাস। বই বোধ হয় অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

নিরুপম স্ত্রীর সুন্দর প্রসাধিত মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। স্বভাবে অবশ্য নিরুপমের মন্থরতা আছে কিন্তু আজকের দেরি যে নিজের মন্থরতার জন্য নয় সে কথাটা আর উল্লেখ করল না নিরুপম, হাসি আর দৃষ্টি দিয়েই বোঝাতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, 'অত ব্যস্ত হচ্ছো কেন। আরম্ভ হয়েছে তো কি হয়েছে। শেষ তো আর হয়নি। তার নিশ্চয়ই অনেক দেরি।'

কাউণ্টার থেকে দু'খানা প্রথম শ্রেণীর টিকেট নিল নিরুপম, তারপর সস্ত্রীক গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কালো পর্দার সামনে টর্চ হাতে দ্বারী নিরুপমের হাত থেকে টিকেট দুখানা নিয়ে টর্চ জেলে একটু দেখে অর্ধেকটা ছিঁড়ে রাখল, বাকি খণ্ডাংশ নিরুপমের হাতে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

কাঠগোলাপ

অন্ধকার হলের ভিতরে ঢুকতেই খানিক দূর থেকে আর একটা টর্চ এগিয়ে এল। নিরুপম টিকেটের অর্ধাংশ দু'খানি লোকটির হাতে দিতে দিতে হঠাৎ বলে উঠল, 'আরে মানিক যে, তুমি এখানে কবে থেকে?'

মানিক বলল, 'আজ্ঞে, মাস ছয়েক হোল এসেছি।'

নিরুপম বলল, 'আগে যেন শ্যামবাজারের দিকে কোন্ হাউসটায় কাজ করতে? মীনারে না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

নিরুপম বলল, 'তারপর তোমার দাদা প্রমথবাবু ভালো আছেন তো? বাড়িওয়ালা আর কোন গোলমাল টোলমাল করে না তো?'

মানিক বলল, 'আজ্ঞে না। আসুন উকিলবাবু, এই দিকে সীট আপনাদের।'

টর্চ হাতে এগিয়ে গেল মানিক। নিরুপম চলল পিছনে পিছনে। কিন্তু সুরমার পা যেন তখনো একটু আটকে রইল মাটিতে, সেই মানিক মুখুয্যে। কোন ভুল নেই। মাথায় সেই কোঁকড়ানো চুল। কপালের ডান দিকে সেই কাটা দাগ। আগের চেয়ে আরো একটু যেন রোগা হয়েছে, না মাথায় একটু বেড়েছে ব'লেই মনে হচ্ছে এখন, কি জানি। বেশবাসেও অবশ্য তখনকার দিনের মত সৌখীনতা নেই। আধময়লা হাফসার্ট গায়ে। পায়ে স্যাণ্ডাল, তবু পাঁচ বছর আগের মানিককে এখনো বেশ চেনা যায়। মানিকও কি তাকে চিনেছে?

নিরুপম একটু পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কই, এসো।' মানিকের হাতের টর্চটা আর একবার যেন ঝলসে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সপ্রতিভতা ফিরে এল সুরমার। স্বামীর পিছনে পিছনে এগিয়ে গিয়ে তার বাঁ দিকের সীটে বসে পড়ল। মানিক ততক্ষণে সরে গেছে।

আসল বই তখনো আরম্ভ হয়নি। একটা ইংরেজী বইয়ের ট্রেলার

দেখানো হচ্ছে পর্দায়। কূলহীন নীল সমুদ্রে ঝড়ের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মাথার উপর দিয়ে উড়ে পালাচ্ছে শঙ্খচিলের ঝাঁক। জেলে ডিঙিগুলি ভিড়তে চেষ্টা করছে তীরে।

নিরুপম সিগারেট ধরিয়ে হাসল, 'যাক, ভাবনা দূর হোল তো তোমার? বই সুরু হ'তে এখনো দেরি আছে বোঝা যাচ্ছে।'

দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর প্রবেশ-পথ দিয়ে তখনো দু'একজন করে দর্শক ঢুকছে। আর অন্ধকার ঘরে জোনাকির আলোর মত ছোট ছোট টর্চ জ্বলছে আর নিভছে। নীল সমুদ্র থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে টর্চের আলো-বেঁধা অন্ধকার কালো ঢুকবার-পথগুলির দিকে সুরমা একবার তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বিরক্তির স্বরে বলল, 'আঃ, সিনেমা দেখবার এত সখই যদি থাকে, কেন যে লোকে দেরি করে আসে বুঝিনে। দু'মিনিট আগে আসলেই তো হয়। ভারি খারাপ লাগে আমার যাই বলো।'

নিরুপম সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'কি খারাপ লাগে?'

সুরমা বলল, 'লোকের এই দেরি করে আসা। আর গেটকীপার-গুলির ঘন ঘন এই টর্চ জ্বালা। ভারি চোখে লাগে।'

নিরুপম একটু হাসল, 'তুমিও তাহ'লে ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ?'

'কি?'

নিরুপম বলল, 'মানিক টর্চটা বেশ একটু উঁচু ক'রে ধরেছিল। যাতে, পথ দেখাবার সঙ্গে মুখও দেখে নেওয়া যায়।'

সুরমা ধমকের সুরে বলল, 'কি যে বল।'

নিরুপম বলল, 'আহা, লজ্জার কি আছে, ও তো কেবল তোমার মুখই দেখেনি। যত মেয়ে ছবি দেখতে আসে হাতের কায়দায় টর্চ ঘুরিয়ে

সবাইর মুখই ও দেখে নেয়। এই দেখ আরো দু'টি মেয়েকে পাকড়াও করেছে।'

ইসারায় দোরের দিকটা দেখিয়ে দিল নিরুপম—যে দোর দিয়ে সুরমারা এসেছিল ঠিক সেই দোর দিয়ে আরো দু'টি মেয়ে হলের ভিতরে ঢুকছে। টর্চ জ্বেলে তাদের হাতের টিকেটের নম্বর দেখে নিচ্ছে মানিক।

সুরমা চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমার যত বাজে কথা আর যত আলাপ বাজে লোকের সঙ্গে। সিনেমা দেখতে এসে গেটকীপারের সঙ্গে কেউ আলাপ জুড়ে দেয়? চারদিকের লোক অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল আমাদের দিকে, এত লজ্জা করছিল আমার।'

নিরুপম বলল, 'কি করব বল, তোমার মত অতখানি আভিজাত্য তো নেই, ছোট আদালতের ছোট উকিল। ঘটিচোর বাটিচোর নিয়ে কারবার।'

সুরমা একটু হাসল, 'থাক্ থাক্! রেণ্ট কন্‌ট্রোলের কেস না হয় দু'একটা আজকাল পাচ্ছই, তাই ব'লে অত অহংকার ভালো নয়। কিন্তু ওকালতি কি মানুষে করে না? তাই ব'লে পানওয়ালা বিড়ি-ওয়ালার সঙ্গে পথে-ঘাটে তোমার মত গল্প জুড়ে বসে নাকি।'

নিরুপম বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়; একেবারে পানওয়ালা বিড়িওয়ালা ক্লাসের লোক নয় মানিক। রীতিমত কুলীন বামুনের ছেলে। আমার মক্কেল প্রমথ গাঙ্গুলীর কি রকম কাজিন হয় সম্পর্কে। সেবার তার কাছেই শুনেছিলাম গল্পটা।'

ট্রেলার শেষ হয়ে গেছে। মূল বই 'মায়ামৃগে'র ভূমিকালিপি জানানো হচ্ছে দর্শকদের। নায়কের ভূমিকায় তরুণ এক অভিনেতা। কিন্তু নায়িকা প্রবীণা, সহরের খ্যাতনামা নটী।

নিরুপমের পাশের জন দুই ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে তার দিকে

তাকালেন। মুখে কিছু না বললেও বক্তব্যটা তাঁদের চোখে অস্ফুট রইল না, 'দাম্পত্যালাপের জন্য ঘরে কি যথেষ্ট জায়গা নেই আপনাদের?'

কিন্তু পার্শ্ববর্তীদের সেই সবাক দৃষ্টি অবজ্ঞা ক'রে নিরুপম স্ত্রীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'ভারি মজার গল্প। অন্তত তোমার এই সিনেমার গল্পের চাইতে যে অনেক ভালো তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। জানো, মানিক ইচ্ছা ক'রে এই চাকরি নিয়েছে? পৃথিবীতে যত মেয়ে আছে সকলের চোখ টর্চের আলোয় ঝলসে দেবে এই ওর পণ। আর এই ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার মূলে আছে বিশ্বাসঘাতিনী এক মেয়ে।'

সুরমা একটু যেন শিউরে উঠল, তারপর বলল, 'আঃ, থামো এবার। বই আরম্ভ হয়ে গেছে দেখ।'

নিরুপম হাসল, 'তোমার আরম্ভ কি আর এখন থেকে হয়েছে নাকি?'

তারপর দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে নিরুপমও ছবিতে মন দিল।

মন দিতে চেষ্টা করল সুরমাও। কিন্তু কিছুতেই যেন কাহিনীটা বুঝে উঠতে পারল না। কয়েকজন স্ত্রীপুরুষ হাত নাড়ছে, মুখ নাড়ছে, হাসছে, কথা বলছে, গান গাইছে। ছবির পর ছবি আসছে। কিন্তু বিষয়টা কি, বক্তব্য কোথায় কিছুতেই যেন ধরতে পারল না সুরমা। তারপর খানিক বাদেই সব যেন ফের পরিষ্কার হয়ে গেল। পর্দায় যে ছবিগুলি আসতে সুরু করছে তার কোনটাই যেন আর সুরমার কাছে অপরিচিত নয়। সব চেনা সব জানা। এবার আর কাহিনীটা দুর্বোধ্য লাগল না সুরমার। নিবিষ্ট মনে সে ছবি দেখতে লাগল। টেরও পেলনা চিত্তপট কখন চিত্রপটকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়েছে।

বড় একটা সার্চলাইটে নদীর দু'দিকের নারকেল আর সুপারি গাছগুলি

ঝলসে দিতে দিতে সন্ধ্যার পর স্টীমারখানা এসে থামল গোলোকগঞ্জ স্টেশনে। যেমন স্টীমার তেমনি স্টেশন। একদিকে কাঠের গুদাম, আর একদিকে ছোট ছোট খানকয়েক টিনের ঘর। সামনে একটা গ্যাসপোস্টের মাথায় চৌকো অপরিচ্ছন্ন কাঁচের লণ্ঠনের মধ্যে টিম টিম ক'রে জ্বলছে আলো।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে নতুন সহরের দৃশ্যটা একটু দেখে নিয়ে স্থরমা বলল, 'বাবা, তোমাকে ভালো মানুষ পেয়ে তোমার সিভিল সার্জন বন্ধু এমন ক'রে ঠকালে তোমাকে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বদলি করলে ?'

স্থরমার বাবা বাকস্ তোরঙ্গ বিছানা কুলির মাথায় তুলে দিচ্ছিলেন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। এসময় অন্য কোন ছেলে মেয়ে এমন কি স্ত্রী যদি এমন ঢঙে কথা বলত তার গালে ঠাস ক'রে চড় বসিয়ে দিতে পারতেন স্থবিমলবাবু। কিন্তু স্থরমার ওপর তাঁর একটু বেশি পক্ষপাত আছে—ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সব চেয়ে স্থন্দরী বলে নয়, পড়াশুনো, সেলাই, গানে সব চেয়ে ভালো বলে নয়, স্থরমার মত এমন মমতাভরা মন তার আর কোন ভাই-বোন পায়নি, এমন কি তার মাও নয়।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে তাই স্থবিমলবাবু একটু হাসলেন, 'কেন, জায়গাটা মন্দ কি রমি। নদীর ধারে নারিকেল-স্থপারির কুঞ্জ। দিব্যি ব'সে ব'সে কাব্যচর্চা করতে পারবি। কেউ বাধা দেবে না। তোর পক্ষে তো ভালোই হলো,. আমি তোর কথা ভেবেই গোলোকগঞ্জে আসতে আপত্তি করলুম না।'

স্থরমার মা ধমক দিয়ে উঠলেন, 'মেয়ের সঙ্গে গল্প পরেও করতে পারবে। এবার এই বড় ট্রাঙ্কটা কুলিকে তুলে দাও তো।'

'এই দিচ্ছি।'

মাল তোলা হয়ে গেলে দল বেঁধে সবাই নিচে নামল সুরমারা। বড় দুই ভাই চাকরি করে কলকাতায়। তারা আসেনি। বাপ-মায়ের সঙ্গে এসেছে কেবল সুরমা আর তার ছোট দুই বোন, এক ভাই।

সহরের জন-দুই ভদ্রলোক অভ্যর্থনা জানালেন সুরমার বাবাকে, 'আসুন ডাক্তারবাবু। এই যে গাড়ি আপনাদের। একখানাতেই হবে বোধ হয়।'

সুবিমলবাবু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তা হবে। হাসপাতাল কত দূর এখান থেকে?'

'তা মাইল দেড়েক তো হবেই।'

'বলেন কি, অত? সহরের বাইরে নাকি?'

'আজ্ঞে না। সহরের মধ্যেই। যত ছোট মনে করছেন, গোলোকগঞ্জ তত ছোট সহর নয় ডাক্তারবাবু। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় বিজনেস-সেণ্টার।'

সবাই মিলে ঘোড়ার গাড়িতে উঠল—সুরমারা। চাবুক খেয়ে পিচ-বাঁধানো একটা নাতিপ্রশস্ত রাস্তা দিয়ে মন্থরগতি অশ্ব দু'টি খানিকটা বেগবান হোল। জানলা দিয়ে সহর দেখতে দেখতে চলল সুরমা। বেশির ভাগই টিনের ঘর। মাঝে মাঝে দু' একটি একতলা পাকা বাড়ি। স্কুল, বাজার, বইয়ের দোকান, মনোহারী দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেল, রেস্টুরেণ্ট সবই আছে। কেবল গায়ে মফঃস্বল সংস্করণের ছাপ। দেখতে দেখতে হঠাৎ বড় একখানা সাইনবোর্ডে চোখ আটকে গেল সুরমার। বিজয়া স্টোর্স। চশমা, সাইকেল, গ্রামোফোন, ঘড়ি সুলভে বিক্রয় ও মেরামত হয়।

সুরমা বলল, 'বাবা, আমার চশমাটা কিন্তু কাল সারিয়ে নিতে হবে।'

মাঝখানের একটা স্টেশন থেকে স্টীমারে উঠবার সময় বাকস্ মাথায় করা একটা কুলির সঙ্গে ধাক্কা লেগে সুরমার চশমার ডান দিকের হাতলটা ভেঙে অকেজো হয়ে রয়েছে। আর একটু হ'লে চোখই যেত। কিন্তু চোখ বেঁচে গেলেও চশমাহীন চোখ, মাথার যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছে সুরমা। জ্বালা করছে, চোখের মধ্যে কট্‌কট্‌ করছে। স্টীমারের মধ্যেও শারীরিক অস্বস্তির কথা বার দুই বাবাকে জানাতে বাধ্য হয়েছে সুরমা। সুবিমলবাবু আশ্বাস দিয়েছেন, 'গোলোকগঞ্জে নেমেই আগে তোমার চশমার ব্যবস্থা করব।'

হিরণবালা বলেছেন, 'হ্যাঁ, তাই কোরো, নইলে তোমার মেয়ের জ্বালায় রাত্রে আর কারো সুস্থ থাকা যাবে না।'

মেয়ের কথায় সুবিমলবাবু বললেন, 'কাল কেন, দোকানে নেমে আজই তোর চশমাটা ঠিক ক'রে নিয়ে যাই, এই গাড়োয়ান রোকো হিঁয়া পর।'

কিন্তু সুরমার মা ধমক দিলেন, 'মেয়ের সঙ্গে তোমারও কি মাথা খারাপ হোল নাকি! এই রাত্রে চশমা সারাতে যাবে। বুলু টুলুরা ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে উঠেছে। নতুন জায়গা। কি রকম কোয়ার্টার, কি বন্দোবস্ত আছে না-আছে তুমিই জানো। একটা রাত চশমা চোখে না থাকলে কি মরে যাবে নাকি তোমার মেয়ে?'

সুবিমলবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আচ্ছা থাক তাহ'লে, কালই আসব কি বলিস রমি।'

সুরমা কানের কাছে রগটা একটু টিপে ধ'রে বলল, 'থাক বাবা, কোন কালেই আর আসবার দরকার নেই, আমি বিনা চশমাতেই চলতে পারব।'

গাড়ি ফের চলতে সুরু করল। জানলা দিয়ে সুরমা আর একবার

তাকাল দোকানের দিকে। রাস্তায় যে ক'খানা দোকান চোখে পড়েছে তার মধ্যে এইখানাই সব চেয়ে ভালো। দোতলা বাড়ির নিচের তলায় সব চেয়ে বড় একখানা ঘরে বেশ সাজানো গুছানো দোকান। সুরমাদের গাড়ি দোকানের সামনে থামতে দেখে আঠার উনিশ বছরের শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারার কৌতূহলী একটি ছেলে দোরের কাছে এগিয়ে এসেছিল। গাড়ি ফের চলতে আরম্ভ করায় দোকানের মধ্যে সেও ফিরে গেল। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, টিকোল নাক, বড় বড় দুটি চোখ। শ্যামবর্ণের ওপর ভারি মিষ্টি মোলায়েম মুখ। চোখের জ্বালাটা মুহূর্তের জন্য যেন জুড়িয়ে গেল সুরমার। মনে হোল ছেলেটিও যতক্ষণ গাড়ির দিকে তাকিয়েছিল তার চোখে পলক ছিল না, গাড়ি নয় গাড়ির আরোহিণীই যে তাকে মুগ্ধ করেছে তা বুঝতে দেরি হয়নি সুরমার!

ছোট ছোট টিনের ঘরে সরকারী অস্থায়ী হাসপাতাল। আশেপাশে সনের ঘরও আছে খান কয়েক। তারই লাগা বড় একখানা আটচালা বাংলো প্যাটার্ণের সনের ঘরে বড় ডাক্তারের কোয়ার্টার।

রান্নাখাওয়া, বিছানা বাণ্ডিল খুলে সাজানো গুছানোয় রাত অনেক হোল। অল্পদিনের নোটিশে বাসা গুটানো, আর অল্পদিনের জন্য বাসা বাঁধা বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে সুরমার বাবা-মার।

পরদিন ভোরে উঠে বাবা বললেন, 'চল, তোর চশমাটা সারিয়ে নিয়ে আসি, সেই সঙ্গে টুকটাক জিনিসগুলিও কিনে আনা যাবে। সবই ভালো, কেবল ইলেকট্রিক লাইট নেই এই হোল মহা অসুবিধা।'

মা বললেন, 'আর যাই আনো না-আনো, আর একটা হ্যারিকেন, বোতল খানেক কেরোসিন তেল কিন্তু যে ভাবেই পারো জোগাড় ক'রে এনো।'

সুরমা বলল, 'আমার আর গিয়ে দরকার কি বাবা।'

মা হেসে বললেন, 'এখনো তোর রাগ পড়ল না রমা। কই রাত্রে খাবার সময়, ঘুমাবার সময় তো রাগের কথা মনে ছিল না। এখন ভোরে উঠে ফের বুঝি মনে পড়েছে। তুই ওঁর সঙ্গে না গেলে ফর্দের অর্ধেক জিনিস আসবে, অর্ধেক আসবে না।'

সুতরাং সঙ্গে যেতেই হোল সুরমাকে। কাছাকাছি ভালো দোকান নেই। সবাই বলল চশমা সারাবার এখানে একমাত্র জায়গা চৌরাস্তার মোড়ের বিজয়া স্টোর্স।

দোকান সবে খুলেছে। বাবার সঙ্গে সুরমা সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই কোঁকড়ানো চুলের ছেলেটি সাদর অভ্যর্থনা জানায়, 'আসুন, আসুন।'

যেন অনেকক্ষণ ধ'রে এই খদ্দেরদেরই সে প্রতীক্ষা করছে। সুরমারা যে আসবে তা যেন তার জানা কথা।

তারপর দু'চার কথায় সুরমার বাবা আলাপ করলেন মানিক মুখুয্যের সঙ্গে। দোকানের মালিক নয়, মানিক কর্মচারী। মালিকের সঙ্গে দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে।

খাপের ভিতর থেকে হাতল-ভাঙা চশমাটা বের ক'রে দিল সুরমা।

মানিক একটু দেখে পরীক্ষা ক'রে বলল, 'এ ধরণের ফ্রেম তো আমাদের নেই, কিন্তু যা ক'রে দেব এর চেয়ে সুন্দর হবে।'

সুরমার বাবা বললেন, 'একটা হাতল বদলে নিলে হয় না?'

মানিক মাথা নেড়ে মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'না, সে বড় বিশ্রী দেখাবে, তার চেয়ে নতুন ফ্রেম করিয়ে নিলে অনেক ভালো হবে দেখতে।'

একটা পীজবোর্ডের বাকসের ডালা সুরমাদের সামনে খুলে ধরল মানিক, বলল, 'দেখুন, কোনটা পছন্দ।'

সুরমা এবার কথা বলল, 'কোনটার কি দাম?'

মানিক তেমনি স্নিগ্ধ হেসে বলল, 'দামের জন্য ভাববেন না। আগে পছন্দ করুন। আমাদের চেয়ে সস্তায় কেউ দিতে পারবে না। প্রায় কলকাতার দরেই আমরা সব জিনিস বিক্রি করি এখানে।'

নিতান্তই বেচাকেনার ব্যাপার। কিন্তু তাও যে এমন মধুর ক'রে বলা যায়, মধুর লাগে শুনতে তা যেন সুরমা এই প্রথম অনুভব করল। ফ্রেম একটা নিজের পছন্দমত বেছে নিল সুরমা।

ইতিমধ্যে মালিক বিপিন সরকার এসে পৌঁছলেন। বেঁটে কালো গোলগাল চেহারা। হাতাকাটা ফতুয়া গায়ে। ভুঁড়ির কাছে বোতামগুলি খোলা।

সুরমার বাবা সুবিমলবাবু বললেন, 'জিনিসটা কিন্তু এক্ষুনি ক'রে দিতে হবে।'

বিপিনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েক দেরি হবে, মিস্ত্রী এখনো আসেনি কি না।'

সুবিমলবাবু বললেন, 'আবার তাহ'লে হাসপাতাল থেকে এতটা পথ আসতে হবে। আচ্ছা, কাউকে না হয় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে।' দোকানের মালিক এবার সহাস্যে বললেন, 'ও, আপনি হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু বুঝি, নমস্কার, নমস্কার। আমি চিনতেই পারিনি। আপনাকে আসতে হবে না ডাক্তারবাবু। আমার দোকান থেকেই লোক গিয়ে দিয়ে আসবে। এর আগে সদাশিববাবুও চমৎকার লোক ছিলেন। ভারি অনুগ্রহ ছিল আমাদের ওপর। সব এই দোকান থেকেই নিতেন।'

চমৎকার লোক ব'লে গণ্য হবার ইচ্ছা সুরমার বাবারও হোল, বললেন, 'আচ্ছা, হ্যারিকেন আছে আপনাদের এখানে? আমার একটা হ্যারিকেন দরকার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যারিকেন আছে টর্চ আছে। সব পাবেন এখানে।'

স্থরমা বলল, 'একটা টর্চও নাও বাবা। রাত্রে কোথাও বেরুতে টেরুতে হ'লে টর্চেই স্থবিধা।'

স্থবিমলবাবু হাসলেন, 'হ্যাঁ, নাম যখন শুনেছ টর্চ, একটা না নিয়ে তুমি কি আর ছাড়বে। ছেলেবেলায় টর্চ একটা পাশে জ্বেলে না রাখলে তোমার ঘুম হোত না।' মনে মনে ভারি লজ্জিত হোল স্থরমা। খেলনা হিসাবে টর্চটা সে পছন্দ করত মনে আছে। কিন্তু সে কথা আবার কেউ তোলে নাকি। বাবার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

টর্চ ছাড়া আরো দুই একটা দরকারী স্টেশনারী জিনিস কিনে নিল স্থরমা। টর্চের ভিতরে ব্যাটারী ভ'রে জ্বালিয়ে, একটু পরীক্ষা ক'রে দেখিয়ে দিয়ে মানিক স্মিতহাস্যে বলল, 'নিন। খাঁটি জার্মানীর জিনিস। যুদ্ধের বাজারে এসব মাল এখন আর আসে না। যেমন মজবুত তেমনি—'

স্থরমা বাবার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'বিজয়া স্টোর্সের কোন জিনিসই এঁরা খারাপ বলবেন না। চল বাবা।'

বিকেলের দিকে মানিকই গেল স্থরমার চশমার ডেলিভারি দিতে। কেবল ফ্রেম নয়, নতুন খাপও নিয়ে এসেছে একটা।

স্থবিমলবাবু হাসপাতালে গেছেন। টাকা দিয়ে স্থরমাই রাখল জিনিস। বলল, 'একি, আবার খাপ কেন, আর একটা খাপ তো আমার ছিল।'

মানিক বলল, 'নিন না। নতুন ফ্রেম করালেন। নতুন একটা কেসও ইউজ ক'রে দেখুন না। আপনার পুরোন খাপটার রঙ উঠে গিয়েছিল, দেখতেও তেমন ভালো ছিল না।'

স্থরমা মনে মনে হাসল। জিনিস বিক্রি করবার ফন্দী। ঝানু দোকানদার মানিক। কিন্তু চামড়ার নতুন ধরণের কেসএর সবুজ রঙটা সত্যিই ভারি ভালো লাগল স্থরমার। পছন্দ আছে মানিকের, রঙ চেনে।

তারপর মাসের পর মাস চেনাজানাটা এগিয়ে চলল। স্থরমার মা-বাবা দু'জনেই মানিককে পছন্দ করলেন। ভারি চালাক চতুর ছেলে। বাপ-মা অল্প বয়সেই গেছেন ব'লে পড়াশুনোটা তেমন অগ্রসর হ'তে পারেনি, কিন্তু বিদ্যার অভাবটা বুদ্ধি দিয়ে অনেকখানি পুষিয়ে নিয়েছে মানিক। আলাপ টালাপে সহজে ধরা পড়ে না, যে মানিকের বিদ্যা থার্ডক্লাস পর্যন্ত। মফঃস্বল সহরের একটা স্টেশনারী দোকানে সাধারণ সপ-এ্যাসিস্টান্টের কাজ করে।

স্থরমার মা একদিন বললেন, 'পড়াটা যদি না ছেড়ে দিতে মানিক—'

মানিক হেসে জবাব দিল, 'তাহলে নির্ঘাৎ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হতাম মাসীমা। পড়াশুনোর ফল যে কি তা তো রমাদিই দেখাচ্ছেন। যে ভাবে বই নিয়ে উপুড় হয়ে আছেন দিনরাত তাতে এবার আর ফ্রেম পাল্টালে চলবে না, গ্লাস পালটাতে কলকাতায় ছুটতে হবে।'

স্থরমা বই-এর পাতায় চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, নিজে অকাট মূর্খ হয়ে আছ কিনা, তাই আর কারো পড়াশুনো দেখতে পার না। ভাবো সবই তোমার মত—'

ইণ্টারমিডিয়েট সিভিকসের পাতা থেকে চোখ তুলে এবার মানিকের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থরমা হাসল। কিন্তু মানিকের মুখে হাসি নেই, সে মুখ বেদনার্দ্র যন্ত্রণাকাতর। যেন অকস্মাৎ ঘা খেয়েছে অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে।

স্থরমার মা ধমকে উঠলেন, 'ঈস্, গরব দেখ মেয়ের। ভারি তো পড়াশুনো তার আবার—। সবাই কি সমান স্থযোগ স্থবিধা পায় সংসারে?'

স্থরমা লজ্জিত অনুতপ্ত স্বরে বলল, 'আমি ঠাট্টা করছিলাম মানিক।'

মানিক জবাব দিল, 'জানি রমাদি, ঠাট্টা ছাড়া আপনি আর কি করবেন।'

বয়সে হয়ত বছর খানেকের চেয়ে বেশি ছোট হবে না মানিক। কিন্তু বিদ্যায়, পদমর্যাদায় একেবারেই নগণ্য। তাই বাবা-মার সঙ্গে স্থরমাও কেমন ক'রে যে একদিন তাকে তুমি বলতে স্থরু করেছিল খেয়াল ছিল না। কিন্তু মাঝে মাঝে কেমন যেন ক্ষোভ হোত স্থরমার সত্যি সত্যিই যদি ওকে এমন তুচ্ছার্থে 'তুমি' বলতে না হোত। 'আপনি' সম্বোধনের যোগ্য হ'লে যেন আরো বেশি আপন হয়ে উঠত মানিক। স্থরমার পড়াশুনো নিয়েও মানিক মাঝে মাঝে নিজের ধরনে ঠাট্টা তামাসা করত। সে তামাসাটা তীক্ষ্ণ এমন কি বিদ্বেষমূলকও হোত একেক সময়। কতকগুলি বইয়ের রাশ যে দু'জনের মাঝখানে এমন একটা ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রাখবে তা যে মানিকেরও সহ্য হোত না একথা স্থরমার বুঝতে বাকি থাকত না। বুঝেও চুপ ক'রে থাকত স্থরমা।

কিন্তু চুপ ক'রে থাকবার ছেলে মানিক নয়। যখনই আসত হৈ চৈ ক'রে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলত। বিজয়া স্টোর্সের মালিক যাতায়াতটা অপছন্দ করতেন না। মানিকই যে একটা গ্রামোফোন আর একটা দেয়াল-ঘড়ি ডাক্তারবাবুদের গছিয়েছে তা তিনি জানেন। তাছাড়া ফি মাসেই কিছু না কিছু দরকারী জিনিস মানিক বিক্রি করছে স্থরমাদের কাছে। এমন ক'রে ধরে পড়ত মানিক, এমন ক'রে জিনিসের গুণ আর অপরিহার্যতা বর্ণনা করত যে না নিয়ে জো থাকত না, নিজেদের দোকানের জিনিস স্থরমাদের দিয়ে কেনাতে পারলে যেন তার আনন্দের সীমা থাকেনা।

এ সব সত্ত্বেও স্থরমার মা-বাবা যথেষ্ট খুশী ছিলেন মানিকের ওপর। বাজারে কোথায় কোন্ জিনিস সস্তায় মিলবে সব মানিকের নখদর্পণে। একবার মুখের কথাটি বললেই হোল মানিক তখনি ছুটবে তার সাইকেল

নিয়ে। কোথায় খাঁটি সর্ষের তেল মেলে, স্বরমার দেড় বছরের রোগা ছোট ভাইয়ের জন্মে কোথায় পাওয়া যায় ছাগলের দুধ, গাছপাকা পেঁপে আর বেল ভালো খান স্বরমার বাবা, বাজারের চেয়েও বেশী সরেস অথচ সস্তা দামে গাঁয়ের চাষী বউদের কাছ থেকে কি ক'রে তা সংগ্রহ ক'রে আনতে হয় মানিকের মত কেউ জানে না।

কিন্তু কেবল বেল আর পেঁপে নয় সেই সঙ্গে অদরকারী কিছু না কিছু ফুলও নিয়ে আসে মানিক। সাত মাইল দূরের খাড়াডাঙার বিল থেকে তুলে নিয়ে এল হয়ত একরাশ শ্বেত পদ্ম, চৌধুরীদের পুকুর থেকে দুর্লভ দু'টি লাল সাপলা কি মল্লিকাদের লম্বা লম্বা ডাটা শুদ্ধ এক গোছা সাদা চন্দ্রমল্লিকা। ব্লাউজের হাতায় লতানো নীল বর্ডার তুলতে তুলতে স্বরমা বলে, 'এসব আবার তোমাকে কে আনতে বলল।'

মানিক হাসে, 'জানেন না বুঝি। টুলুটা ফুলের জন্মে একেবারে ঝুলোঝুলি। তাই আনলাম।'

টুলু স্বরমার ছ'বছরের বোন। মানিকের কথার ভঙ্গিতে স্বরমাও হাসে, তারপর মানিকের হাত থেকে ফুলগুলি নিয়ে তার সামনেই নিজের টেবিলের দু'টো ফুলদানি সাজিয়ে রাখে।

কাটল বছর দেড়েক। আই-এর রেজাল্ট বেরুল স্বরমার। বাড়িতে পড়েও ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে। সবাই খুশী। মানিক বলল, 'এমন কি আর বাহাদুরী। দিন রাত পড়ে থাকতে পারলে আমি আরো এক ডিভিসন ওপরে উঠতে পারতুম।'

স্বরমা হেসে বলল, 'তা তো পারতেই। আপাতত এই তক্তাপোশের ওপরে উঠে বড় ঘড়িটাকে একটু ঠিক ক'রে দাও দেখি। দুদিন ধ'রে ঘড়িটার নড়ন চড়ন নেই। যেমন বাজে মার্কা জিনিস—'

মানিক বলল, 'বিজয়া স্টোর্সের কোন জিনিসই বাজে মার্কা নয়—'

সুরমা অপূর্ব ভঙ্গিতে ভ্রু কুঁচকালো, 'তার মানে বলতে চাও বিজয়া স্টোর্সের বাইরে যা কিছু আছে সবই বাজে। আমিই ঘড়ি হ্যাণ্ডেল করতে জানি না।'

মানিক বলল, 'তাই তো মনে হচ্ছে। যারা ওস্তাদ, যাদের হাতের গুণ আছে তাদের হাতে বাজে জিনিসও বেশিদিন লাস্ট করে। আর—'

সুরমা ঠোঁট টিপে হাসল, 'আচ্ছা তোমার ওস্তাদী, তোমার হাতের গুণটা একবার দেখি।'

দেয়াল-ঘড়ি সুরমার ঘরে। মানিক সুরমার বিছানাটা নিজের হাতে একটু গুটিয়ে নিয়ে তার ওপর উঠে ঘড়িটা পেড়ে আনল। তারপর ঘরের মেঝের ওপরই খুলে ফেলল সমস্ত কলকব্জা।

সুরমার মা বললেন, 'তুই তো আচ্ছা মানুষ রমি। পাগলকে ক্ষেপিয়ে দিলি। এবার সারা রাত ভুগবে কে?'

সুরমা মানিকের দিকে তাকিয়ে ছদ্ম কোপে বলল, 'ভুগবে আবার কে। যে ওস্তাদীর বড়াই করছিল সেই ভুগে মরুক, আমাদের কি। ঘড়ি ঠিক ক'রে না দিলে উঠতে দেব না, রাত যতই হোক।'

উঠতে না দিলেও গা ধোয়া চুলবাঁধা শেষ ক'রে চাঁপা ফুলের রঙের শাড়িখানা প'রে নিজের হাতে সুরমা চা আর জলখাবার এনে দিল মানিককে।

মানিক একবার একপলক তাকিয়ে কি দেখল তারপর ফের মুখ গুঁজল ঘড়ির কলকব্জার মধ্যে।

সন্ধ্যা উৎরে গেল। সাতটা বাজল, আটটা বাজল, সুরমার বাবার হাতঘড়িতে ন'টা বাজল রাত।

সুরমা বলল, 'কি ব্যাপার, ঘরখানা পুরোপুরি দখল করবার মতলব আছে নাকি? তোমার ঘড়ি বন্ধ আছে ব'লে বিশ্বশুদ্ধ লোকের ঘড়ি অচল হয়েছে। রাত কত হোল দেখতো।'

মানিক চমকে উঠে স্থরমার মুখের দিকে তাকাল। যেন রাত ক'টা হয়েছে তা লেখা আছে স্থরমার মুখে।

একটু বাদে মানিক ঘড়িটাকে তুলে ফের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'এবার চলছে।'

স্থরমা চেয়ে দেখল সত্যিই চলা স্থরু করেছে ঘড়ি। তারপর ফিরে দেখল মানিক একেবারে দোরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্থরমা বলল, 'ওকি পালাচ্ছ যে। খেয়ে যাবে না?'

মানিক বলল, 'না যাই।'

মানিক চলতে স্থরু করল।

কিন্তু ছুটে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল স্থরমা, 'এই শোন শোন। এত অন্ধকারে কি ক'রে যাবে একা একা? আলো নিয়ে যাও।'

'না না, আলো লাগবে না, বেশ যেতে পারব।'

কিন্তু গেল না মানিক। একটু যেন থেমে দাঁড়াল জানলার ধারে।

স্থরমা বলল, 'হুঁ, যেতে পারবে বললেই হোল আর কি। যাওয়া যেন অতই সোজা।' তারপর বালিসের তলা থেকে টর্চটা এনে জানলার শিকের ভিতর দিয়ে গলিয়ে জোর ক'রে মানিকের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা সঙ্গে নিয়ে যাও।'

খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে শুতে এগারটা হোল। ঘরের আলো নিবিয়ে দিল স্থরমা। পাশে বাবার ঘরেরও আলো নিবেছে। গরমের দিন। ঘরের সবগুলো জানলা খুলে দিল স্থরমা। এতক্ষণ গুমোট ছিল, এবার বেশ বাতাস আসছে, কিন্তু কেবল বাতাস নয়, হঠাৎ এক ঝলক আলোও এসে পড়ল ঘরের মধ্যে।

ব্যাপার কি, কিসের এ ভুতুড়ে আলো। সাহসের অভাব নেই স্থরমার। বিছানা থেকে জানলার ধারে উঠে এসে বলল, 'কে!'

সঙ্গে সঙ্গে টর্চটা আবার জ্বলে উঠল, 'আমি।'

শিউরে উঠল সুরমার সর্বাঙ্গ, মানিক। তার হাতেই কেবল টর্চ জ্বলছে না। টর্চের চেয়েও হিংস্রভাবে জ্বলছে দুটো চোখ।

'তুমি? কি চাও এখানে? তুমি এখনো যাওনি!'

'না যাইনি, যেতে পারিনি। যাওয়া কি অতই সোজা?'

পাশাপাশি ঘর, সুরমার বাবা ঘর থেকে ওঠে এলেন, 'কে, কে ওখানে? দরজা খোল রমি!'

অত্যন্ত তিক্ত স্বর সুবিমলবাবুর।

সুরমা বলল, 'দরজা খুলে কি হবে বাবা। চোর ঘরে ঢুকতে পারেনি। জানলার বাইরে দাঁড়িয়েছে।'

বাজের আওয়াজ বেরুল সুবিমলবাবুর গলায়, 'বাহাদুর সিং, পাকড়াও শূয়োরের বাচ্চাকো।'

বাহাদুরের আগে আগে ছড়িহাতে ছুটে গেলেন সুবিমলবাবু।

আশ্চর্য, মানিক ছুটে পালাতে পারত কিন্তু পালাল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল নেপালী দারোয়ান বাহাদুরের হাতে।

বাহাদুর টর্চটা কেড়ে নিল মানিকের হাত থেকে। তারপর ডাক্তারবাবুর হাতে সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'দিদিমণির টর্চ। চোট্টা চুরি ক'রে নিয়ে পালাচ্ছিল।'

সুবিমলবাবু টর্চটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শান-বাঁধানো সিঁড়ির ওপর। সামনের কাঁচটা চৌচির হয়ে ফেটে গেল।

পরদিন মেথর এসে ভাঙা টর্চটা দেখতে পেয়ে বলল, 'নেব দিদিমণি?'

সুরমা কোন কথা বলল না, কেবল ইসারা করল হাতের।

কাঠগোলাপ

বই শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও বুঝি মিনিটখানেক বসে ছিল সুরমা। নিরুপম তার কাঁধে আলগোছে আঙুল ছোঁয়াল, 'ব্যাপার কি, একেবারে তন্ময় হয়ে গেছ দেখছি। আর কিছু দেখবার নেই। এবার ওঠো। যত সব রাবিশ বাজে গল্প। ব'সে ব'সে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে আমার। প্রেমের সঙ্গে পলিটিক্সের জগা খিচুড়ী। কিচ্ছু হয়নি।'

সুরমা একটু যেন অবাক হোল, 'পলিটিক্স!'

নিরুপম বলল, 'তবে দেখলে কি এতক্ষণ ধ'রে?'

সমস্ত হল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সুসজ্জিত তরুণ তরুণীর দল বেরুচ্ছে সদর দরজা দিয়ে। যেন রঙের ধারা। আর এক দল ঢুকবার জন্য অপেক্ষা করছে বাইরে। স্বামীর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এসে ভারি স্বস্তি বোধ করল সুরমা। অন্ধকার ঘরে ভুতুড়ে টর্চের আলো আর দেখতে হবেনা।

কিন্তু টর্চের কথাটা নিরুপম ভোলেনি দেখা গেল। বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'তার চেয়ে আমার গল্পটা যদি শুনতে, বাজি রেখে বলতে পারি অনেক ভালো লাগত। কিন্তু বলতেই দিলে না আমাকে।'
সুরমা জোর ক'রে একটু হাসল, 'আচ্ছা, এবার না হয় বলো।'

নিরুপম বলল, 'না বলবার মুড আর নেই, 'মায়ামৃগ' সমস্ত মেজাজ নষ্ট ক'রে ফেলেছে। মোট কথা অল্প বয়সে টর্চের আলোয় একটি সুন্দরী মেয়ের মুখ দেখতে গিয়ে তাড়া খেয়েছিলো মানিক। অথচ গোড়ার দিকে নাকি মেয়েটির ভারি সহানুভূতি ছিল। মুখ দেখতে দিতে খুব যে আপত্তি ছিল তার রকম-সকমে মনে হোত না। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বাপ-মার ধমক আর চোখ রাঙানিতে মেয়েটি বেশ নির্বিবাদে ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢাকল। মেয়েদের মত সেয়ানা জাত তো আর নেই।'

সুরমা একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আর ছেলেটি?'

নিরুপম বলল, 'ছেলেটিকে তো দেখলেই। ধরা পড়ে কেবল তাড়াই নয় বেদম মারও খেতে হোল তাকে। দম নেওয়ার জন্য পালাল দেশ ছেড়ে। বছর কয়েক ভ্যাগাবণ্ডের মত এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াল। চুরি-জোচ্চুরি না করল এমন কাজ নেই। তারপর কি ক'রে জোটাল এই শো হাউসের চাকরি। আবার হাতে পেল টর্চ। পথ দেখাবার ছলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরতে লাগল মেয়েদের মুখের ওপর। কেউ কেউ মুখ বুজে সইল, কেউ কেউ প্রতিবাদ করল। ফের তাড়া খেল মানিক কিন্তু বাংলাদেশে সিনেমা হাউস তো দু'একটা নয়। টর্চ হাতে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াল মানিক, সহরতলী থেকে সহরে উঠে এল। হাতে টর্চ। আর টর্চের সামনে বিব্রত লজ্জিত ত্রস্ত এক একখানি মুখ।'

সুরমা বলল, 'খুব হয়েছে, এবার থাম।'

নিরুপম হাসল, 'কিন্তু এক-একখানি মুখ নয়, মাত্র একখানি মুখই তার লক্ষ্য। টর্চের আলোয় মানিক আজও সেই মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

সদর দরজার কড়া নাড়তে ঝি এসে দোর খুলে দিল। স্বামী স্ত্রী ভিতরে ঢুকল দু'জনে। দোতলায় পাশাপাশি দু'খানা ঘর। একখানা বৈঠকখানা। নিরুপমের মক্কেলরা এসে বসে। আর একখানা শোয়ার ঘর। স্ত্রীকে কাপড় ছাড়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য খানিকক্ষণের জন্য নিরুপম বসবার ঘরে গিয়েই ঢুকল। সুরমা ঢুকল নিজের ঘরে। দামী খাট, চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, শাড়ি আর সৌখীন জিনিসে বোঝাই কাঁচের আলমারী, বইয়ের সেলফে ঘর সাজিয়েছে সুরমা। পৈতৃক পেশার সঙ্গে কিছু পরিমাণ পৈতৃক বিত্ত-সম্পত্তিরও নিরুপম উত্তরাধিকারী হয়েছে। মোটামুটি সচ্ছল সুখের সংসার দু'জনের কিন্তু আজ ঘরে ঢুকে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সুরমা।

কি যেন একটা মনের মধ্যে মুহুর্মুহু বিঁধছে। সত্যিই স্বরমা দায়ী মানিকের এই অধঃপতনের জন্য? সত্যিই কি অন্যায় করেছিল সে? সত্যিই কি আর কিছু তার করবার ছিল?

বাথরুমে ঢুকে আর একবার ভালো ক'রে স্নান ক'রে নিল স্বরমা। সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু মন ঠাণ্ডা হয় না।

খাওয়া দাওয়া শেষ হোল। নিবল ঘরের আলো। খানিকবাদে নিরুপম ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম আসে না স্বরমার। যতবার চোখ বোজে ততবার যেন ঘরের মধ্যে টর্চের আলো দেখতে পায়। শো হাউসের সেই ভুতুড়ে জোনাকির আলো। বারবার জ্বলছে আর নিবছে। আবার উঠে বাথরুমে গেল স্বরমা। ভালো ক'রে চোখ মুখ আর মাথা ধুয়ে এল। এবার ছু'চোখ ভেঙে ঘুম এল। কিন্তু ঘুম ভাঙতেও দেরি হোল না। একটা তিন ব্যাটারীর টর্চ কে যেন স্বরমার মুখের ওপর জ্বেলে ধরেছে। ভাল ক'রে চোখ মেলতে পারছে না স্বরমা, চোখ বুজতেও পারছে না।

সত্যি সত্যিই যখন ঘুম ভাঙল, ঘরের মধ্যে নরম নীলাভ আলো জ্বলছে শেডের আড়ালে। নিরুপম তাকে সস্নেহে ছু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে, 'কি ব্যাপার, এমন চীৎকার ক'রে উঠলে কেন?'

স্বরমা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ও তুমি! কিছু না, স্বপ্ন দেখছিলাম,' একটু হাসতে চেষ্টা করল স্বরমা, 'তোমার সেই টর্চের স্বপ্ন।'

একটু যেন ছায়া পড়ল নিরুপমের মুখে তারপর সেও হাসতে চেষ্টা করল, 'আচ্ছা ভয়কাতুরে মানুষ তো! কিন্তু গল্প বলতে পারি স্বীকার করো তাহ'লে?'

স্বরমা চোখ বুজে বলল, 'তা পার।'

অবশ্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিরুপমের কাছে টর্চের ব্যাপারটা নিতান্তই গল্প। তারপর গোলোকগঞ্জের পরেও আরো দু'তিন জায়গায় বদলি হয়েছিলেন সুরমার বাবা। কিন্তু সুরমা আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেরায়নি। দাদা-বউদির কাছে কলকাতায় একটানা কাটিয়েছে। দাদার বন্ধু নিরুপম দত্ত। সেই সূত্রে আগেও আলাপ ছিল। পরে আরো ঘনিষ্ঠতা হোল। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতে বিয়ে হয়ে গেল। গোলোকগঞ্জের কোন কথাই ওঠেনি। ওঠবার মত কথা কি-ই বা ছিল। তবু একেকদিন সুরমা ভেবেছে স্বামীকে সব খুলে বলবে। কিন্তু কোথায় যেন বেঁধেছে। কাহিনীটা কৌতুকের, তবু সবটুকু যেন কৌতুকের নয়।

পরদিন বেলা দশটায় খেয়ে দেয়ে কোর্টে বেরুল নিরুপম; সুরমা নতুন টাই পরিয়ে দিল স্বামীকে। কেসে ভরতি করল সিগারেট।

কিন্তু স্বামী বেরিয়ে যেতেই মনটা ফের কেমন এক ধরণের অস্বস্তিতে ভ'রে উঠতে লাগল। কাল মানিককে না দেখলেই যেন ভালো হোত, স্বস্তি পেত ওর কাহিনী এমন ক'রে না শুনলে। অবশ্য নিজের দায়িত্বই যে সুরমার ষোল আনা তা সে স্বীকার করে না। মানিক তার নিজের কৃতকার্যের ফল ভুগছে। শাস্তি পাচ্ছে নিজের দুষ্কর্মের। কিন্তু পরক্ষণেই সুরমার মনে হোল শাস্তিটা যেন বড় বেশি নিষ্ঠুর। মানিকের সেই একদিনের চাপল্যের অপরাধে সুরমাদের পরিবার থেকে সে চিরদিনের জন্য বিতাড়িত হয়েছিল, তার এতদিনের সেবা-পরিচর্যা সব ধুয়ে মুছে গিয়েছিল, এতদিনের স্নেহ, সহানুভূতি, অনুকম্পার কিছু মাত্র চিহ্ন ছিল না সুরমার মা-বাবা, এমন কি সুরমারও মনে—তা সুরমা সহজভাবেই মেনে নিয়েছিল। এই তো স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু চিরজীবনের জন্য মানিকের এই উচ্ছন্নে যাওয়া,

তার এই মনোবিকৃতি যেন সুরমাকে বারবার পীড়া দিতে লাগল। ঘরের কাজে মন বসল না, মন বসল না আধখানা পড়া নতুন নভেলে।

পাড়ার মধ্যেই সিনেমা। নিরুপমের বলা আছে যখন একা একা মন খারাপ লাগবে তখন সিনেমায় গিয়ে বসবে। কিন্তু কোনদিন স্বামীর এ পরামর্শ সুরমা গ্রহণ করেনি। আজ ভাবল যায়। কাল অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় বইটা ভালো ক'রে কিছু বুঝতেই পারেনি, আজ আবার গিয়ে দেখবে। তারপর ফের যদি দেখা হয় মানিকের সঙ্গে, আজ একা পেয়ে সত্যিই সে যদি তার মুখের ওপর টর্চ জ্বেলে ধরে, সুরমা চেঁচিয়ে উঠবে না, বাধা দেবে না, অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে পরম শুভাকাঙ্ক্ষিনীর মত উপদেশ দেবে, 'এসব চপলতা ছাড়ো মানিক, বিকৃতি দূর কর মনের। সৎ হও, সুন্দর হও, বলিষ্ঠ হও, সুখী হও জীবনে।'

একটু যেন পা কাঁপল সুরমার, কিন্তু নিজের চিত্তদৌর্বল্যের জন্য পরমুহূর্তে নিজেই সে হেসে উঠল। দিনে দুপুরে কিসের এত ভয়। দেখাই যাক না, কি বলে মানিক, কি করে। সুরমা আর কিছুতে ঘাবড়াবে না। ভয় পাওয়ার দিন আর তার নেই।

আড়াইটায় শো আরম্ভ। কিন্তু টিকেট কেটে আজ প্রায় মিনিট পনের আগে গিয়েই হলে ঢুকল সুরমা। ঢুকেই নিজের ভুল বুঝতে পারল। পরিষ্কার দিনের আলো ঘরের মধ্যে। এ-ঘরে তো টর্চ জ্বলবে না। অন্য একটি ছেলে এসে টিকেট দেখে আসন দেখিয়ে দিয়ে গেল সুরমাকে। সমস্ত ঘরটায় একবার চোখ বুলিয়ে দেখল সুরমা। কোথাও মানিকের দেখা নেই। সময় আর কাটে না। দু'আনা দিয়ে একখানা বই কিনল সিনেমার। নিল আইসক্রীম।

অবশেষে দোর বন্ধ হোল, অন্ধকার হোল ঘর। ফের ঢুকতে লাগল বিলম্বিত আগন্তুকের দল। আট দশটা টর্চের আলো ফের জ্বলতে নিবতে সুরু

করল। সুরমা লক্ষ্য করল মানিক এসেছে। হ্যাঁ, কালকের মত প্রথম শ্রেণীর দ্বাররক্ষক হয়েই দাঁড়িয়েছে সে। বুকের মধ্যে একটু যেন কেঁপে উঠল সুরমার। বেশীর ভাগ আসনগুলিই ফাঁকা। ম্যাটিনী শোয় উঁচু শ্রেণীর খুব কম লোক এসেছে ছবি দেখতে। স্ত্রীপুরুষ দু'চার জন যারা ঢুকছে টর্চের সাহায্যে তাদের মানিক বসিয়ে দিয়ে গেল। দু'একজনের সীট একেবারে কাছাকাছি চেয়ারগুলোতে। গাটা শিরশির ক'রে উঠল সুরমার। কিন্তু মানিকের যেন কোন দিকে কোন লক্ষ্য নেই। সুরমা ভাবতে লাগল, মানিক কি তাকে সত্যিই লক্ষ্য করেনি, চিনতে পারেনি, নাকি চিনেও না-চিনবার ভান করছে?

পর্দায় ফের মায়ামৃগের অভিনয় চলতে লাগল। দর্শকেদের উল্লাসে মাঝে মাঝে চমক ভাঙতে লাগল সুরমার। কিন্তু আজও তার অন্য-মনস্কতা ঘুচল না। আজও বইয়ের বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না সুরমা। বিরক্ত হয়ে বই শেষ হবার অনেক আগেই সে উঠে পড়ল।

দোরের কাছে আবার ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠেছে। হ্যাঁ, মানিকের হাতেরই টর্চ। কিন্তু মুখের কাছে নয়, পায়ের কাছে।

মানিকের চোখে কোন ঔৎসুক্য নেই, কৌতূহল নেই, পরিচয়ের চিহ্ন নেই। কিংবা মানিক তাকায়নি তার দিকে, নিতান্ত অভ্যস্তভাবে স্যুইচ টিপেছে টর্চের। সুরমা একটু থামল, একটু ইতস্তত করল। মানিক যন্ত্রবৎ দোরের দিকে টর্চটা আরো একটু বাড়িয়ে ধ'রে কালো পর্দাটা ফাঁক ক'রে দিয়ে বলল, 'যান, এই তো রাস্তা।'

আধোখোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সুরমা। কিসের একটা ব্যর্থতা আর অপমানে বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে। আজও মানিক তাকে অপমান করেছে। মুখের ওপর টর্চের আলো জ্বেলে নয়, না-জ্বেলে। আজ আর দুঃসহ রকমের উজ্জ্বল নয় মানিকের টর্চ। ভারি ক্ষীণ, নিবুনিবু। আর পরিচয়ের আলো একেবারেই নিবে গেছে।

কাঠগোলাপ

সাদা কাপড়ের চার ধারে সরু পেনসিলে নক্সা কেটে সেই পেনসিলের দাগ সবুজ স্থতোয় ঢেকে দিচ্ছিল অণিমা।

ছেলে-মেয়ে ছ'টি পাশের ভাড়াটের ছেলেপুলের সঙ্গে খেলতে বেরিয়েছে গলিতে। নির্জন ঘর। ঠিক নির্জন নয়। আরো একজন আছে, কিন্তু সে না থাকার-মতই। জানলার ধারে তক্তাপোশ পেতে শিয়রের বালিসে কন্থুই ডুবিয়ে, হাতের তেলোয় মাথা রেখে, খবরের কাগজে সারাটা মুখ ঢেকে রেখেছে সে ব্যক্তি। দাঁতের আগায় স্থতো কেটে অপাঙ্গে সে-দিকে একবার তাকিয়ে দেখল অণিমা। আজ দিন ভ'রেই কি কাগজ পড়বে নীরদ! হকার ভোরে দিয়ে গেছে কাগজ। নীরদ সকালে পড়েছে, ঘুমের আগে ছপুরে দেখেছে, বিকেলেও কি পোড়া ছাইর কাগজ শেষ হোল না?

এমব্রয়ডারীটি হাতে ক'রেই অণিমা উঠে এল স্বামীর কাছে। একবার ভাবল কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে, কিন্তু সাহস পেল না, মেজাজটা কেমন আছে কে জানে। অণিমা একটু কাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি দেখল, তারপর কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'কাগজ এখনো ফেল বলছি। না হ'লে হাতের স্থচ বিঁধিয়ে দেব আঙুলে।'

কাঠগোলাপ

কাগজ এবার সরিয়ে রাখল নীরদ, তারপর স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই এখন বাকি। তারপর হচ্ছে কি ওটা?'

'কোনটা?' হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অণিমার, 'এই এমব্রয়ডারীর কথা বলছ? বল দেখি কি তুলছি?' লতা-পাতা-ফুলের নক্সাওয়ালা কাপড়টা স্বামীর মুখের কাছে আরো একটু এগিয়ে দিল অণিমা, 'দেখ দেখি চিনতে পার নাকি, বলতে পার নাকি ফুলের নাম?'

"না।"

অণিমা বলল, "পারবে না, আমি আগেই জানতাম। একে বলে কাঠগোলাপ, দেখেছ কোন দিন?"

"না"

অণিমা একটু হাসল, "আমিও দেখিনি। শুনে শুনে আন্দাজে আন্দাজেই তুলছি, বেশ মানাবে টেবিলক্লথের বর্ডারে, তাই না?"

নীরদ বলল, "হুঁ। নতুন ক'রে আবার এমব্রয়ডারীর সখ স্বরু হোল বুঝি?"

অণিমা বলল, "হবে না? ওবাসার মায়ার ধারণা কি জান? গেঁয়ো মেয়ে ব'লে আমরা যেন আর কিছু জানি না। গান নয়, বাজনা নয়, কোন রকম হাতের কাজ নয়। কেবল জানি রাঁধতে আর খেতে। সেলাইর কাজের দেখলুম তো নমুনা। এখনো দু'বছর আমার কাছে ব'সে ব'সে ওরা কাজ শিখতে পারে।"

নীরদ একটু হাসল, "তাতো পারেই।"

"তাতো পারেই মানে? ওরা ভাবে আমি এই নতুন এসেছি কলকাতায়। ওদের চেয়ে ঢের বেশি এসেছি, তা ওরা জানে না। ক'বছর আগেও তো শ্যামবাজারে মামা-বাড়িতে বছর বছর আসতুম। কলকাতার দেখিনি এমন কিছু নেই, যাইনি এমন জায়গা নেই। তা'ছাড়া

গাঁয়ে থাকলেই বা। এদের এই নদীয়া-চব্বিশ পরগণারও গ্রাম, আর আমাদের ফরিদপুর-বরিশালেরও গ্রাম।”

“তাই নাকি ?”

“তা'ছাড়া কি ? স্কুলে, পোস্ট-অফিসে, হাটে-বাজারে ওদিককার গ্রাম এদিককার সহরের সমান। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এদিকের হাঁড়ির খবর বের ক'রে নিয়েছি তো সব, আজই না হয় পাকিস্তান, আজই না হয় কপাল পুড়েছে পোড়া দেশের।” হঠাৎ কান খাড়া ক'রে কি যেন শুনল অণিমা, “ওমা, জল এসেছে তো কলে! যাই, পেতে দিয়ে আসি বালতি। এখুনি তো আবার কাড়াকাড়ি-মারামারি স্বরু হয়ে যাবে।”

এমব্রয়ডারীর কাজ ফেলে অণিমা তাড়াতাড়ি বালতি নিয়ে ছুটল। মাথার আঁচল খসে পড়ল, দুলে উঠল কানের ঝুমকো দুটো।

নীরদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীর ব্যস্ততা। যেন নতুন জোয়ার এসেছে অণিমার সর্বাঙ্গে। যেন তার সাত-আট বছর বয়স কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ষোল সতেরয়। পাড়ার অনেক ষোড়শী সপ্তদশী স্কুল-কলেজের ছাত্রীর সঙ্গে, ইতিমধ্যেই অণিমার ভাব হয়েছে। চালচলনে, আচারে আচরণে, বেশে, ভূষায় অণিমাও যেন তাদেরই একজন। তার ভাব-ভঙ্গি রকম-সকম দেখে মনে হয়, যেন কেরাণীর ঘরের ঘরণী নয় সে, রাজধানীর রাণী—সম্রাজ্ঞী।

রাজধানীই বটে, অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই সহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘর, চুণ-বালি-ঝরা কত কালের পুরোন দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে,

আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা-ভরা উঠান। মশা আর দুর্গন্ধভরা ঘর। গন্ধে, গানে এই তো কলকাতা।

তবু তো রাজধানী। তবু তো সহরে এসেছে অণিমা। তার মুখে সহর ছাড়া কথা নেই, তার চোখে সহর ছাড়া বস্তু নেই দেখবার। অণিমা প্রায়ই বলে, 'শাপে বর হ'ল। ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে, হিড়িক লাগল গ্রাম ছাড়বার। নইলে কি আনতে, নইলে কি আসতে পারতুম কলকাতায়? এমন স্থায়িভাবে বাসা বেঁধে বাস করতে পারতুম? সারাটা জীবন গাঁয়েই ফেলে রাখতে। আট বছর ধ'রেই তো দেখছি, ক'দিন এনে রেখেছ কলকাতায়?'

সে কথা ঠিক, স্থায়িভাবে এর আগে এখানে বাসা বাঁধতে পারেনি নীরদ। কেবল আয়ে কুলোযনি ব'লে নয়, মনও স্থির হয়নি ব'লে। মন কেবল সহর থেকে গ্রামে, গ্রামে থেকে সহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথায় যে ডেরা বাঁধবে ঠিক করতে পারেনি। ফলে আধা-আধি সহরে রয়েছে, আধা-আধি গ্রামে। বছর দশেক ধ'রে সহরেই আছে নীরদ, পড়াশুনো করেছে, চাকরি-বাকরি করেছে, তবু সে নাগরিক নয়, মনে মনে গ্রামিক। এখনো সেই নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-জঙ্গল, বেতের ঝোপ, বাঁশের ঝাড় তার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মিলেছে স্মৃতিতে আর স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তবে মেলেনি। ছুটিছাটায় দু-এক সপ্তাহ, দু-এক মাস গ্রামে থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নীরদ, পালাই পালাই করেছে তার মন, পালিয়ে এসেছেও। কিন্তু সহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বাঁশের ঝাড়, গাছের ছায়া মনকে ঢেকে ফেলেছে, ছেয়ে ফেলেছে। সহরে যে সে কিছু ক'রে উঠতে পারল না, বোধ হয় এই জন্মই। এত বড় রাজধানী সারা দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার কাছে গাঁয়ের বাজার ছাড়া বেশি কিছু নয়। এখানে লোকে আসে,

চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তারপর খেয়া পার হয়ে ফের যায় গ্রামে। থাকবার ঘুমাবার ঘর-গৃহস্থালী, চাষবাসের জায়গা সেখানে। এত বড় কলকাতা নীরদের মনে সেই হাটুরে গঞ্জের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়তে পারেনি।

তবু শেষ পর্যন্ত আসতে হয়েছে। বাসা বাঁধতে হয়েছে শহরে, কেবল পাকিস্তানের গোলমাল ব'লে নয়, মেস-হোটেলে খেয়ে খেয়ে কতদিন আর চলে? আপোস করতেই হয় বস্তুজগতের সঙ্গে। কেবল নিজেকে নিয়ে থাকলে চলে না, কেবল নিজের খেয়ালখুশী দেখলে চলে না। সমাজে সংসারে আর কাউকে না দেখলেও দেখতে হয় নিজের স্ত্রী-পুত্রকে, তাদের ভবিষ্যৎ—দেশের, সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

বাড়ি-ঘরের অবস্থা দেখে অণিমা প্রথম ভ্রু কুঁচকেছিল।

"এ কোথায় এনে তুললে? এই নাকি কলকাতা?"

নীরদ জবাব দিয়েছিল, "হুজুগে, হিড়িকে যারা দেশ ঘর ছেড়ে এসেছে, তাদের কলকাতা এইখানেই, এইরকম।"

"হুঁ, এই রকম না ছাই। আসলে মোটেই জোগাড়ে লোক নও তুমি, না কি ইচ্ছে ক'রে এখানে এনে তুলেছ? কলকাতায় আসতে চেয়েছি ব'লে শোধ তুলছ?"

কিন্তু দু'দিনেই ভুল ভেঙেছে অণিমার। চোখ-কান তার খোলা। দেশের অবস্থা দু-এক দিনেই বুঝে ফেলেছে। বাড়ি পাওয়া যায় না কলকাতায়, নিজেদের আর আশে পাশের চারিদিকের গ্রাম থেকে যারা উঠে এসেছে, তাদের অনেকেই কাছাকাছি আছে, ছড়িয়ে রয়েছে এইসব বেলেঘাটা, নারকেলডাঙা, চড়কডাঙা অঞ্চল নিয়ে। বাসে যেতে যেতে আলাপ হয়েছে অণিমার তাদের গাঁয়ের ঘোষেদের বড় বউ মল্লিকার সঙ্গে।

মল্লিকা বলেছিল, "তুমি তো অনেক ভালো আছ। আমরা কোথায় আছি জান? মিঞাবাগানের এক বস্তীর মধ্যে, আলো নেই, জল নেই বাড়িতে। রাস্তার টিউব ওয়েল থেকে জল আনিয়ে নিতে হয়।"

বাঁড়ুয্যেদের ছোট মেয়ে তিলোত্তমার সঙ্গে খুব ভাব অণিমার। এখন সে বাসুখালির মুখুয্যে বাড়ির বউ, দেশে জমি-জায়গা বিষয়-আশয়, ভালো অবস্থা মুখুয্যেদের। কলকাতায় তিলোত্তমার বরও ভালো চাকরি করে ব্যাঙ্কে। ঠিকানা পেয়ে বরের সঙ্গে একদিন বেড়াতে এসেছিল তিলোত্তমা। ঘুরে ঘুরে দেখল সব ঘরদোর, তারপর বলল, "যাই বলিস, তবু তোকে দেখে হিংসা হয় অণু। আমরা যেখানে আছি, তার তুলনায় এতো স্বর্গ। কোঠাবাড়ি নয়, আপাততঃ টিনের ঘরেই এসে উঠতে হয়েছে। ভিতটা কেবল বাঁধানো, আলো নেই, বাতাস নেই, গলি ঘিঞ্জির মধ্যে অন্ধকূপ। তুই তো স্বর্গে আছিস ভাই।"

স্বর্গে না থাকলেও ঝেড়ে-পুছে সাজিয়ে গুছিয়ে ঘরদোরকে স্বর্গ প্রায় বানিয়ে ফেলল অণিমা। কিন্তু ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখল না। ঘুরে ঘুরে দিন কয়েকের মধ্যেই পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলল, কয়েকজনের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব। তিন ঘর ভাড়াটের সঙ্গেই শুধু নয়, এপাশে ওপাশে আরো দুইটি সরু গলির খান কয়েক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হ'ল অণিমার। গাঁয়ের মেয়ে হলেও লজ্জা-সঙ্কোচের আধিক্যে আড়ষ্ট ভাব তার ছিল না। তা'ছাড়া পাছে গাঁয়ের কুণো মেয়ে ব'লে অপবাদ রটে, সেই আশঙ্কায় অণিমা কেবল ঘরের কোণেই আবদ্ধ হয়ে রইল না, বাইরেও বেরুতে লাগল। কখনো বা নিজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, কখনো বা অল্পবয়সী সখীসঙ্গিনী-দের হাত ধরে। তারপর ক্রমে ক্রমে অণিমাদের ঘর আর দাওয়ায়ও লোকজন আসতে লাগল। এ বাড়ির বউ, ও বাড়ির মেয়ে, সে বাড়ির

মাসীমা। অণিমা আসন পেতে দেয়, পিঁড়ি পেতে দেয়, দু'একজনের বেশি হ'লে দেয় মাদুর বিছিয়ে, এগিয়ে দেয় পান-সুপুরি, খয়ের-জর্দা ভরা পিতলের বাটি।

শুধু মেয়েরাই যে আসে তাই নয়, পাড়ার দু'একজন কলেজে-পড়া যুবকদেরও আসতে দেখা যায়। তিন ঘর ভাড়াটের মধ্যে গুটিচারেক দেবর জুটেছে অণিমার, তারা জুটিয়েছে আবার আরো দু'তিনজনকে। অবসর মত তারা দু'একজন প্রায়ই জল-চৌকি অথবা মাদুর পেতে এসে বসে অণিমার ঘরে। গল্প চলে, আলাপ চলে, চলে পাকিস্তান আর ভারতের তুলনামূলক আলোচনা। মাস কয়েকের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছে অণিমা। এমন আলাপী বউ পাড়ায় আর নেই। অণিমার গানের গলা বেশ মিষ্টি, অণিমার চায়ের হাত মধুরতর। সাজ-সজ্জার সখটাও বেশ একটু বেড়ে গেছে অণিমার। কখন কোন বাড়ির কোন ঠাকুরপো এসে পড়ে, কখন কোন ঠাকুরঝি ডাকতে আসে তার আনারসী নক্সার সোয়েটারের ঘরগুলি দেখিয়ে নিতে, সেই জন্য বিকাল হ'লেই বেশ একটু সেজে-গুজে, ছিমছাম, ফিটফাট হয়ে থাকতে চেষ্টা করে অণিমা। দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোন দিন খোপা বাঁধে, কোন দিন বিনুনি করে, পাউডারের পাফ্ বুলোয় মুখে।

একদিন এমনি প্রসাধন করছে অণিমা, হঠাৎ পাশের বাড়ির একুশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে 'বউদি' ব'লে এসে হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল বাইরে। কেবল অণিমাই যে একটু অগোছালভাবে আছে তাই নয়, ঘরের মধ্যে নীরদও রয়েছে জানলার পাশে বই হাতে। কিন্তু এই আকস্মিক আবির্ভাব-তিরোভাবের পর হাতের বই বন্ধ হ'ল নীরদের, অণিমার পাউডারের ছোপ-লাগা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছেলেটি কে?'

অণিমা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, ওকে চেন না? আমাদের বাড়িওয়ালার ছোট ছেলে। এতদিন ধ'রে আছ বাড়িতে আর বাড়িওয়ালার ছেলেকেই চেন না? কি ক'রে চিনবে? মানুষ তো আর দেখ না, মানুষের মুখের দিকে তো আর তাকাও না ভালো ক'রে! নিজের ভাবের রাজ্যেই আছ। নভেল-নাটকের মানুষগুলিই চোখের সুমুখ দিয়ে নড়াচড়া করে, আসল মানুষের দিকে চোখ মেলে তাকাবার ফুরসুৎ কই?'

নীরদ বলল, 'হুঁ। চোখ মেলে আসল মানুষ দেখবার জন্যে তোমাকে রেখেছি। ছেলেটি এসেছিল কেন, আর এসেছিল তো ওভাবে পালিয়েই বা গেল কেন?'

'পালিয়ে গেল?' এবার যেন একটু আরক্ত হয়ে উঠল অণিমার মুখ। বলল, 'পালিয়ে গেল তোমার ভয়ে। তুমি তো আর মানুষ-জন দু'চোখ পেতে দেখতে পার না। তাছাড়া মানস ঠাকুরপোই সবচেয়ে বেশি ভয় করে তোমাকে।'

'কেন?'

অণিমা বলল, 'কেন বলব? ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব?'

নীরদ বিরসমুখে বলল, 'বল তোমার যেভাবে খুশি।'

অণিমা বলল, 'তাহ'লে কথা দিচ্ছ? রাগ করবে না? আমার কাছে একখানা শাড়ির দাম পাবে মানস ঠাকুরপো।'

'শাড়ি?'

'হ্যাঁগো, গয়নাগাঁটি কিছু নয়, সামান্য একখানা শাড়ি। কোন একটা জিনিসের নাম শুনলে তুমি এমন আকাশ থেকে পড় যে, কিছু তোমার কাছে বলতে ইচ্ছা করে না। ওই ভয়েই বলি না কোন কথা। শাড়ি-খানা কিন্তু খুব ভালো। যেমন পাড়, তেমনি কচি কলাপাতার রঙ্। মাত্র একুশ টাকায় পেয়েছি। বাইরে থেকে কিনতে হ'লে পঁচিশ টাকার

একটি পয়সাও কমে পেতে না। কেবল আমিই নয়, ও-ঘরের ললিতাও কিনেছে। সবাই বলে দুজনের মধ্যে রঙের সঙ্গে আমাকেই বেশি ম্যাচ করেছে। দেখবে ?'

বাক্স খুলে শাড়িখানা বের করল অণিমা, তুলে ধরল নীরদের মুখের সামনে, 'রঙটা খুব চমৎকার, না ?'

অণিমার চোখ-মুখ উৎসাহে এত উজ্জ্বল দেখাল যে, নীরদকে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করতেই হ'ল রঙের মনোহারিতা।

অণিমা বলল, 'টাকাটা কিন্তু ওকে কালকের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। ভারি তাগিদ দিচ্ছে। আসলে মানস ঠাকুরপো যে তাগিদ দিচ্ছে তা নয়, যে লোকটির কাছ থেকে কিনে এনেছে, সে-ই তাগিদে তাগিদে ওকে অস্থির করে তুলেছে।'

এবার চটে উঠল নীরদ, 'মাসের শেষে অত দামি শাড়ি তুমি কিনলে কেন ? কালকের মধ্যে কোথায় পাব একুশ টাকা ? দরকার নেই শাড়িতে, ওটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এস ওকে।'

অণিমা নীচু গলায় বলল, 'ছি-ছি, আস্তে আস্তে। ও হয়তো কাছা-কাছিই কোথাও আছে। ফিরিয়ে দিলে মান থাকে নাকি ? তা'ছাড়া ফিরিয়ে দিলে পরব কি ? গণ্ডায় গণ্ডায় শাড়ি আমার বাক্সে আছে, না ?'

নীরদ বলল, 'বেশ তো, শাড়ি কিনবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমাকে বললেই তো পারতে। সুযোগ-সুবিধামত আমিই দেখে-শুনে কিনে দিতাম শাড়ি। গরজ দেখে নিশ্চয়ই তোমাকে ও ঠকিয়ে গেছে।'

অণিমা বলল, 'ঠকিয়েছে না আরো কিছু। তোমার তো কেবল সন্দেহ—এই বুঝি ঠকলুম, এই বুঝি কেউ ঠকিয়ে গেল। ঠকিয়ে থাকে তো বেশ করেছে। বাড়ি বয়ে হাতের কাছে এনে দিয়েছে জিনিস। নিজে দেখে-শুনে হাতে ক'রে কিনতে পেরেছি। দু-এক টাকা যদি ঠকেও

থাকি, আমার দুঃখ নেই। নিজের হাতে জিনিসপত্র কিনতে যে কি আনন্দ, তা তো তুমি আর জানো না!'

এতক্ষণ রাগ রাগ ভাব ছিল অণিমার। এবার হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজের হাতে জিনিস কেনার আনন্দ। কিন্তু নীরদের মুখে যা ফুটল, তা ঠিক আনন্দ নয়। কারণ মাসের শেষে মাথা কুটলেও একুশ টাকা মিলবে না কোথাও। বিপদ-আপদ বলতে যে শ'খানেক টাকা আছে ব্যাঙ্কের সেভিংস এ্যাকাউণ্টে, তাব থেকেই তুলে দিতে হবে অণিমার শাড়ির দাম। তাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটু তাকিয়ে নীরদ জবাব দিল, 'তাতো ঠিকই। নিজের হাতে খরচ করবার আনন্দই কেবল বুঝে গেলে, নিজের হাতে রোজগার করবার কষ্ট তো আর পেতে হ'ল না।'

অণিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'কোন একটা জিনিসপত্র কিনতে গেলেই তোমার ওই কথা। কেবল কষ্ট আর কষ্ট। কিসের কষ্ট শুনি? অফিসে পাখার নীচে বসে কাজ কর, আর সপ্তাহে একবার ক'রে রেশন নিয়ে আস ঘরে, তাও তো একে-ওকে দিয়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে আনাই। আর, আমার বুঝি কোন কষ্ট নেই? ঝিকে ঝি, ঠাকুরকে ঠাকুর। ছেলেমেয়েদের পড়াটা পর্যন্ত আমাকে ব'লে দিতে হয়। রাঁধা-বাড়া, ঝাড়াপোঁছা, সংসারের কোন কাজটায় আমার না থাকলে চলে শুনি? ফিরিস্তি নিয়ে দেখ, তোমার কাজের চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ আমার কাজ। তোমার মাইনে সোয়াশ' হ'লে আমার মাইনে কম ক'রে ধরলেও হওয়া উচিত আড়াইশ'—তা জান?'

'তাই নাকি?' নীরদ এবার না হেসে পারল না। এই মাসকয়েক সহরবাসের ফলেই অনেক বড় বড় কথা শিখে ফেলেছে অণিমা। মেয়েদের দাবী, মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের মর্যাদা। কিন্তু যে

আড়াইশ' টাকার উপযুক্ত কাজ অণিমা করে, সে টাকা তো সরকারী মুদ্রায় চোখে দেখবার নয়। নীরদের সোয়াশ'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে টাকা তো আর সংসারের আয় বাড়ায় না, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায় না। নিজের হাতে জিনিস কিনবার আনন্দ নীরদের সোয়াশ'র মধ্যেই মিটাতে হয় অণিমাকে। বাজার, রেশন, ঘরভাড়া, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে মিটাতে হয় ওই টাকা থেকেই। তারপর ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কোন মাসে বা এক গজ ব্লাউজের কাপড়, কোন মাসে এনামেলের ছোট ডেকচি, ফলওয়ালার কাছ থেকে আতাটা, কলাটা, খাবারওয়ালার কাছ থেকে চানাচুর, চিনেবাদাম কিনে যে ক্রয়-সুখ উপভোগ করে অণিমা তা নীরদ বাসা করবার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করেছে। তেমন কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু তাকে না জানিয়ে দামি শাড়ি কিনে ফেলাটি স্ত্রীর ভারি দুঃসাহস আর অনধিকারচর্চা ব'লে মনে হ'ল নীরদের কাছে। এই নিয়ে চলল কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক, এই নিয়ে উঠল অণিমার আরো অনেক বে-হিসাবী খরচ, আরো নানারকম অবুঝ অপরিণামদর্শিতার কথা।

নীরদ বলল, 'তাছাড়া বাইরের লোক ডেকে ডেকে অত চা-পান বিলোবারই বা কি দরকার ?'

অণিমা বিজ্ঞের মত হাসল, 'কি দরকার, তা তুমি বুঝবে না। সহরে এলে এসব করতেই হয়, না করলে লোকে নিন্দা করে। শত হলেও এটুকু লোক-লৌকিকতা, সমাজ-সামাজিকতা না করলে কি ভদ্রতা থাকে নাকি ? সহরে এলে এসব দরকার হয়।'

সহরে আসবার ফলে আরো অনেক কিছু দরকার হয়েছে অণিমার। পাড়ার কোন-না-কোন মেয়েকে নিয়ে বিনা প্রয়োজনে শ্যামবাজার-বাগবাজারে ট্রামে-বাসে ক'রে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছে। ন্যায়রত্ন লেনে থাকে তার পিসতুতো বোন

চারু, দেখা করা চাই তার সঙ্গে। কাঁটাপুকুর লেনে থাকে ছেলেবেলার সাথী মল্লিকা, তাকে একবার না দেখে এলে মনটা কেমন কেমন করে। দুপুরে কোন কোন দিন না ঘুমিয়ে ঘরে তালাচাবি দিয়ে সহরে সফর করতে বেরোয় অণিমা। ছেলেমেয়ে দুটিকে কোনদিন সঙ্গে নেয়, কোন-দিন বা বাড়িওয়ালার স্ত্রী সুবাসিনী মাসীমার জিম্মায় রেখে যায়। ফেরার পথে দু-চার আনার সওদা ক'রে ফেরে।

টের পেয়ে নীরদ এক-একদিন ধমক দেয়, 'দুহাতে এত বাজে খরচ করছ, আর কিন্তু আমি চালাতে পারব না।'

'বাজে খরচ কোথায় দেখলে?'

'বাজে খরচ ছাড়া কি, ট্রামে-বাসে মিছামিছি কেন অতগুলি ক'রে পয়সা—'

অণিমা জবাব দেয়, 'ও, ট্রাম-বাসের কথা বলছ! মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসে না উঠলে সহরে আছি ব'লে মনেই হয় না। আর কি চমৎকারই যে লাগে দোতলা বাসের সামনের সীটগুলিতে গিয়ে বসলে! আমি আর কুন্তলা তো দোতলা বাস পেলে একতলা বাসে উঠিই না। বেশ লাগে চলন্ত বাসের চূড়ায় ব'সে দুদিকের দোকান-পাট, মানুষ-জন দেখতে।'

নীরদ বলে, 'ও! তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ফুটপাথ দিয়ে তখন যারা হাঁটে, ভারি অসহায় দেখায় তাদের, তাই না? যা-ই বল, নিজেরা যে গরীব, তা আর মনে থাকে না, যখন দোতলা বাসে উঠি। অবশ্য ট্রামের ফার্স্ট-ক্লাসগুলিও ভালো। ফ্যানের নীচে বসে যেতে-যেতে বেশ লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে যখন লেডীজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিক্কী ভারিক্কী সব পুরুষেরা উঠে দাঁড়ায়। তখন দয়া হয় তাদের জন্য। বুড়ো বুড়ো লোক দেখলে পাশে বসতেও

দিই। তাই দেখে অল্পবয়সী ছেলে ছোকরারা কি রকম কাতর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে! মায়াও হয়, মজাও লাগে। আমি তার জন্যও যাই মাঝে মাঝে।'

সহরের এই ছোটখাট সুখ-সুবিধার জন্য স্ত্রীর এই কাঙালপণা, হ্যাংলাপণা দেখে কেমন যেন লজ্জা হয় নীরদের। কিন্তু কিছু বলতেও বাধে। বড় বড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হদিস তো নীরদ ওকে দিতে পারেনি। স্ত্রীকে ছোট বলবার অধিকার কই তার? নীরদ মনে মনে প্রবোধ দেয় নিজেকে, বছরের পর বছর গ্রামে কাটিয়ে হঠাৎ সহরে এলে এইরকমই বোধ হয় মানুষের—বিশেষ ক'রে মেয়ে মানুষের। বয়স যতই হোক, ভিতরে ভিতরে ওদের একটা দিক বড় অপরিণত, বড় ছেলেমানুষের মত থেকে যায়। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃত জনের রুচি-বুদ্ধির যেমন মিল, তেমন মিল যেন আর কারো সঙ্গে নেই। সহরে এসেছে, একথাটি কোনও মুহূর্তেই যেন অণিমা ভুলতে পারে না, ভুলতে চায় না।

বাস-ট্রামের পর সিনেমা, মাসে গোটা তিনেক সিনেমা না দেখলে যেন পেটের ভাত হজম হয় না অণিমার। একটি নীরদকে ব'লে কয়ে, তার সঙ্গে গিয়েই দেখে। আর দুটো দেখে লুকিয়ে, ম্যাটিনি শো'তে, পাড়ার অন্য দু'একটি মেয়ের সঙ্গে দল বেঁধে। তবু টের পায় নীরদ। অণিমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সে সিনেমা দেখে এসেছে। দিন কয়েক ধ'রে নতুন গানের গুন্‌গুনানি শোনা যায় ঘরের মধ্যে, বাথ্-রুমে, প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা চলে গল্পের, অভিনয়ের। নীরদ কিছু বলবার আগে সাদর অনুরোধ জানায়, 'সত্যি, ভারি চমৎকার হয়েছে বইটা। যাও, দেখে এসো, অবশ্য দেখো কিন্তু।'

সিনেমার সব ছবিই চমৎকার। আর সহরের সব কিছুই ছবির মত সুন্দর।

নীরদ আর একবার ওয়ার্ণিং দেয়, 'এমন করলে কিন্তু সত্যিই চালান শক্ত হবে। কিছুতেই থাকা যাবে না এখানে। সিনেমার টিকেট যদি অত ঘন ঘন কেনো, আমি বাধ্য হব, শিয়ালদয় গিয়ে ট্রেণের টিকেট কিনতে।'

অণিমা বলে, 'ঈস্! টিকেট কিনলেই গাড়িতে উঠে বসেছি আর কি! দরকার থাকে, তুমি যাও—আমি আর যাচ্ছি না।'

নীরদ বলে, 'কেন, যেতে ক্ষতি কি? জেঠীমা জ্যেঠামশাই তো আছেন বাড়িতে।'

অণিমা জবাব দেয়, 'তাঁরা থাকুন। কিন্তু আমি আর যাচ্ছি না। ভেবেছ, ফের আমাদের ওই বাঁশবনে ঠেলে পাঠাতে পারবে? আর আমরা যাচ্ছি না সেখানে, কিছুতেই না।'

টেবিল-ঢাকনির চারদিকে লতাপাতা আর কাঠগোলাপের নক্সা নিয়ে ফের এসে বসল অণিমা, একটা দিক কেবল হয়েছে, আর তিন দিক বাকি।

নীরদ বলল, 'টেবিল তো নেই ঘরে। টেবিল-ঢাকনি দিয়ে করবে কি?'

অণিমা হাসল, 'ঘর ছাড়া আর বুঝি কোথাও টেবিল নেই সহরে? বল তো এ ঢাকনি দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে?'

অণিমা বলল, 'ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব, মহারাজ?'

নীরদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ! সব সময় ঠাট্টা ইয়ারকি ভালো লাগে না, কি বলবে ব'লে ফেল।'

অণিমা বলল, 'এ টেবিল-ঢাকনি কিন্তু মশাইর ঘরের জন্য নয়, বাইরের। পাড়ার ছেলেদের সঞ্জীবনী-সঙ্ঘের। মানস ঠাকুরপোরা আছে ওই ক্লাবে। তাদের বার্ষিক উৎসব হবে শিগ্‌গিরই। সেই সময় এটা প্রেজেণ্ট করব।'

নীরদ নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'বেশ তো।'

অণিমা বলল, 'বেশ তো! এদিকে হিংসেয় বুক ফেটে যাচ্ছে। ভয় নেই গো, তোমাকেও আর একখানা দেব তৈরী ক'রে। ততদিনে টেবিলও একখানা ঘরে আসবে আমাদের। টেবিল পাতার মত ঘরও হবে।'

'থাক, থাক, আমাকে দিয়ে দরকার নেই। তুমি ওইখানাই আগে শেষ কর।'

অণিমা বলল, 'পুরুষ মানুষ তো! হিংসুকের সেরা। বউয়ের হাতের জিনিস বাইরের লোকে ব্যবহার করুক, তা তোমরা আসলে সহ্য করতে পার না। তাই না?'

নীরদ বলল, 'আঃ, থাম। কি যা-তা বলছ!'

অণিমা হাসল, 'যা-তা নয় গো, যা-তা নয়। আমরা ঠিক বুঝতে পারি। কিন্তু বউয়ের হাতের জিনিস ঘরে থাকলেও তোমাদের লাভ, বাইরে গেলেও তোমাদেরই লাভ। এটি বোঝ না কেন? জিনিস ভালো হ'লে বাইরের পাঁচজন যখন প্রশংসা করবে, তখন কি আর আমার প্রশংসা করবে? না, বলবে অমুকের বউ, অমুক বাবুর বউ। কি বল, তাই না?'

কিন্তু টেবিল-ঢাকনি শেষ করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল অণিমার। ছোট মেয়ে পড়ল অসুখে। এক মুহূর্ত মার কাছ ছাড়া থাকতে চায় না মঞ্জু। আর কেবল কাছে থাকলেই হবে না, তাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে

শুয়ে থাক। কিন্তু জড়িয়ে ধরা কি যায়? মেয়ের গা যাচ্ছে আগুনে পুড়ে।

পাশেই এক উকিল ভদ্রলোকের বাড়ি ফোন আছে। ফোনটা ভিতরের ঘরে। দরকার হ'লে মেয়েরাও ব্যবহার করতে পারে। নীরদ সেখান থেকে এক ডাক্তার বন্ধুকে ফোন ক'রে দিল। অনেক দিনের পরিচিত বন্ধু। বিনা ভিজিটেই দেখতে চাইবে। হাফ্-ফীটা জোর করে দিতে হবে গছিয়ে। কিন্তু উকিল তো আর বন্ধু নন। নব-পরিচিত প্রতিবেশী। তিনি ফোনের চার্জ নিলেন ছ' আনা। অপ্রসন্নমুখে নীরদ ফিরে এল ঘরে। ভাবল, ফোনটা অফিস থেকে বিনা পয়সায় করলেই হ'ত।

দুপুর বেলায় ডাক্তার এসে দেখে গেছল কিনা জানবার জন্যে অফিস থেকে নীরদ আর একবার ফোন করল। আর আশ্চর্য, একটু বাদে ফোন ধরল এসে অণিমা। উকিল ভদ্রলোকের স্ত্রী ভদ্রতা করেছেন। ফোনে কথা বলবার জন্য ডেকে দিয়েছেন অণিমাকে। শিখিয়ে দিয়েছেন ফোনের ব্যবহার।

ফোনে অণিমা সুসংবাদই দিল, 'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেছেন। খুকু ভালো আছে, কোন ভয় নেই।'

একটু যেন আড়ষ্ট, একটু যেন বাধো-বাধো গলা অণিমার।

বাসায় ফিরে মেয়ের জ্বর কম দেখে একটু স্বস্তি বোধ করল নীরদ। ভাবল, যাক অল্পেতেই গেছে।

হেসে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফোন এই প্রথম করলে বুঝি? আমার কথা সব বুঝতে পারছিলে?'

'হ্যাঁ। আর আমার কথা?'

নীরদ একটু হাসল, 'অত জোরে, অত তাড়াতাড়ি বলছিলে কেন? একটু আস্তে বলতে হয়। তাহ'লেই ভালো শোনা যায়।'

মেয়ের অসুখ দিন দুয়েকের মধ্যেই সারল। কিন্তু ফোন সম্বন্ধে নীরদের এই উপদেশই হ'ল কাল। উকিল শ্রীপদবাবুর স্ত্রী সুভাষিণীর সঙ্গে অণিমার আগেই সামান্য আলাপ ছিল। ফোনের জন্য সেই আলাপকে আরো ঘনিষ্ঠ ক'রে তুলল।

পাবলিসিটি কোম্পানীর অফিস। গভীর মনোযোগে বিজ্ঞাপনের কপি তৈরি করছে নীরদ, অপারেটর খবর দিল, ফোনে কে ডাকছে নীরদবাবুকে। ফোন ধ'রে নীরদ বলল, 'হ্যালো, কে?'

'বলতো কে। এবারো কি বোঝা যাচ্ছে না? খুব আস্তে বলছি তো।'

নীরদ বলল, 'হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ফোন করলে যে? অসুখ-বিসুখ করল নাকি কারো? মঞ্জু কেমন আছে?'

'ভালো খুব ভালো, বালাই অসুখ-বিসুখ করবে কেন? ফোনে বুঝি আর সুখের কথা বলা যায় না?'

'তা যায়। কিন্তু ছ' আনার পয়সা লাগল তো?'

'দুত্তোর ছ' আনা। এমন ষোল আনা সুখ পাচ্ছি, ছ' আনা না হয় একদিন লাগলই। এবার আমার কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে, না?'

'তা যাচ্ছে।' ফোন ছেড়ে দিল নীরদ।

কিন্তু ফোন অণিমাকে ছাড়ল না। দু-চার দিন বাদে বাদে সামান্য অছিলা-অজুহাতে সে ফোনের পর ফোন করতে লাগল। কেবল নীরদকে নয়, পরিচিত, আধা-পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—যে যেখানে আছে, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, অফিসের কেরানী, যাকে যেখানে ফোনে পাওয়া সম্ভব, ফোন-গাইড খুঁজে তাকে দু-একবার ক'রে ফোন করতে লাগল অণিমা। জরুরী, দরকারী কোন কাজে নয়, অমনি, মিছামিছি, সাধারণ আলাপের জন্য। কিন্তু ছ' আনা খরচ-করা সাধারণ

কাঠগোলাপ

আলাপ ফোনের মধ্যে কি যে অসাধারণ হয়ে ওঠে, তা কি সকলে জানে?

বাসে-ট্রামে যাতায়াতের নেশাটা কমে গেল অণিমার। সেই পয়সায় ফোন করে। নগরের নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়েছে সে। ঘরে বসে আলাপ করা যায় বাইরের সঙ্গে। সহরকে দেখবার দরকার হয় না। সহর এখন অণিমার কানের ভিতর দিয়ে মরমে—টালা থেকে টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা থেকে ক্লাইভ স্ট্রীট—সব জায়গার সঙ্গে ঘরে বসে আলাপ করতে পারে অণিমা। দূর সম্পর্কের দেবর, সইয়ের বররা ফোন ধ'রে অবাক হয়ে যায়। চিনতে একটু সময় লাগে। তারপর অতিমাত্রায় মুখর হয়ে ওঠে তারা। অজানা কোন গৃহকোণ থেকে ফোন করছে আধো-জানা কোন বান্ধবী, কোন আত্মীয়া। রোমাঞ্চের ছোঁয়াচ লাগে অফিসে। ফাইল-পত্রে, কাজ-কর্মে ঠাসা দুপুরের অফিস হঠাৎ যেন রাত্রের ফিসফিসে ভ'রে উঠেছে।

অণিমা বলে, 'চিনতে পারছেন? বুঝতে পারছেন আমার কথা?'

জবাব আসে, 'অমন ক'রে বলবেন না। বেশি বুঝতে ভয় হয়।'

ফোনে মুখ দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে অণিমা। রিসিভারের ভিতর দিয়ে আর একজনের কানে সে হাসি মধু হয়ে গ'লে গ'লে পড়ে।

উকিল শ্রীপদবাবু একদিন নীরদকে ডেকে বললেন, 'ও মশাই, শুনুন।'

'কি?'

'বলতে লজ্জাও করে, আবার না বলেও পারিনে। ভদ্রমহিলার কাছে তো আর রোজ রোজ চার্জটা চেয়ে নেওয়া যায় না। ফোন বাবদ আপনাদের কাছে পাঁচ টাকা পাওনা হয়েছে। আজ দেবেন?

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'পাঁচ টাকা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' শ্রীপদবাবু একটু হাসলেন, 'সারা কলকাতা ভ'রে আপনাদের যে এত বন্ধু-বান্ধব, ঠাট্টা-ইয়ার্কির লোক আছে, তাতো জানতুম না। ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোনে এত হাসি-ঠাট্টা কিসের মশাই? টাকাটা কি এখনই দেবেন?'

'হ্যাঁ, এই নিন।'

পাঁচ টাকার একখানা নোট ব্যাগ থেকে বের ক'রে দিল নীরদ। দিতে কষ্ট-ই হল। মাসের শেষ। মিছামিছি কতগুলি টাকা অপব্যয় করল অণিমা। আর কি সব বিশ্রী অপবাদ উঠেছে, তার নামে! ছি ছি ছি!

বাসায় এসে স্ত্রীকে খুব ক'রে ধমকাল নীরদ, 'খবরদার! ফের যদি ফোন করতে যাও শ্রীপদবাবুর বাড়িতে, তবে আমার সঙ্গে এই তোমার শেষ কথাবার্তা।'

'কেন, হয়েছে কি?'

কি হয়েছে, স্ত্রীকে সবিস্তারে জানাল নীরদ। অণিমা শুনে মন্তব্য করল, 'ভদ্রলোক তো ভারি অভদ্র। ফোন যেন আর কারো বাড়িতে নেই, ফোন যেন আর কেউ রাখে না। দাঁড়াও, অবস্থাটা আমাদের আর একটু ভালো হলেই আমরাও ফোন নেব। রেডিও নয়, ফ্যান নয়, সবচেয়ে আগে চাই ফোন। বুঝেছ?'

কথার ভঙ্গি দেখে রাগ ক'রে থাকতে পারল না নীরদ। হেসে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অবস্থা তো ভালো হয়ে নিক আগে।',

টিফিনের পর বেলা গোটা দুইয়ের সময় আবার ক্রীং-ক্রীং ক'রে উঠল নীরদের অফিসের ফোন। আর কাউকেই নয়, নীরদবাবুকেই চাইছেন কোন এক ভদ্রমহিলা। অপারেটর মুখ টিপে হাসল।

আবার ভদ্রমহিলা! নীরদ বিরক্ত, অপ্রসন্নমুখে গিয়ে ফোন ধরল, যা ভেবেছে, ঠিক তাই, অণিমাই।

স্থান-কাল ভুলে নীরদ বলল, 'ফের তুমি গেছ ওই বাড়িতে ফোন করতে?'

অণিমা মধুরস্বরে জবাব দিল, 'গেছি তো কি হয়েছে? আগে শোনোই না আমার কথা।'

'কি আবার শুনব? তুমি জাত-কুল কিচ্ছু রাখবে না।'

'আরে আগে শুনেই নাও। মিছামিছি রাগ করছ কেন অত? স্থভাষিণীদি কি বলছেন জানো? আমি স্বচ্ছন্দে তাঁদের বাড়িতে এসে ফোন করতে পারি। বাড়ি তাঁর নামে, উকিলবাবুর নামে নয়। আর ফের যদি উকিলবাবু ওসব কথা বলেন, আমরা যেন কেস করি উকিলবাবুর নামে। পিছনে লাগিয়ে দিই ব্যারিস্টার। পাঁচ টাকা এক্ষুণি ফেরত দিতে চাইছেন স্থভাষিণীদি। আমি অবশ্য নিলুম না। বললুম কি জানো? কেস চালাবার জন্যে ও-টাকা তোমার কাছেই জমা থাক দিদি। আমি নিলে খরচ ক'রে ফেলব। কি বল, ঠিক বলিনি?' অণিমা একটু হেসে উঠল,—তারপর আবার বলল, 'স্থভাষিণীদি বলছেন উকিলবাবু বাড়ি এলে স্বামীকে আচ্ছা ক'রে বকে দেবেন। ফোন করলুম ব'লে তুমি কিন্তু আবার বকো না। তার চেয়ে একটু মিষ্টি কথা বল দেখি। তুমি তো জানো না, ফোনের ভিতর দিয়ে মিষ্টি কথা আরো কত মিষ্টি হয়ে আসে!'

তারপর মিষ্টি কথা শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল অণিমা। কিন্তু তার বদলে কিরকম একটা যেন গোলমাল শুনতে পেল। তর্ক-বিতর্ক রাগারাগি চটাচটি। ঠিক যেন বোঝা গেল না। তারপর ঝনাৎ ক'রে ফোন রেখে দেওয়ার শব্দ হ'ল।

কনেকশন কেটে দিয়েছে, একথা বুঝবার পরেও 'হ্যালো, শুনছ? কি হোল তোমাদের?'—ব'লে বারকয়েক ডাকল অণিমা। কিন্তু ও-পাশ

থেকে আর সাড়া এল না। ফের কনেকশন নিতে অণিমার ভয় হ'ল। কি জানি, নীরদ যদি পছন্দ না করে, সে যদি বকুনি দিয়ে ওঠে।

কিন্তু বকুনিরই কপাল অণিমার। ঘণ্টাখানেক বাদেই নীরদ ফিরে এল অফিস থেকে।

অণিমা সেই টেবিলক্লথ নিয়ে বসে ছিল। তিন দিকের বর্ডারে পাতার মধ্যে কাঠগোলাপ তোলা হয়েছে, আর একটা দিক বাকি। এবার শেষ ক'রে দিতে হবে। সঞ্জীবনী-সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের আর দেরি নেই। তাড়া দিচ্ছে সভ্যেরা।

স্বামীকে দেখে অণিমা বলল, 'এই যে, কি ভাগ্য! এত তাড়াতাড়ি এলে যে আজ?'

নীরদ নীরস গম্ভীর মুখে বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে?' উদ্বিগ্ন, শোনাল অণিমার গলা, 'কি যেন গোলমালের মত শুনলুম তোমাদের অফিসে? হয়েছে কি?'

'বেশি কিছু হয়নি, চাকরি গেছে।' নীরদ শান্তভাবে হাসল।

'চাকরি গেছে মানে? বলছ কি তুমি! কি সর্বনেশে কথা! চাকরি গেছে—মানে কি তার?'

নীরদ বলল, 'ওই একই কথা। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'ছেড়ে দিয়ে এসেছ? কেন?'

নীরদ নিষ্ঠুর স্বরে বলল, 'তোমার জন্য। অফিসের ম্যানেজার যে রকম অপমান করলেন, তাতে কোন ভদ্রলোকের ছেলে আর ওখানে চাকরি করতে পারে না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে না খেয়ে মরলেও না।'

'কিন্তু হয়েছে কি? আমার এখনো গা কাঁপছে।' বলতে বলতে গলা কাঁপল অণিমার।

কিন্তু নীরদের কাঁপল না। কি হয়েছে, সংক্ষেপে স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলল। অণিমা যখন নীরদকে ফোন করছিল, তখন ম্যানেজার এসে দাঁড়িয়েছিলেন পেছনে। অফিসের কাজে জরুরী একটা ফোনের দরকার ছিল তাঁর। অপারেটরের কাছে লাইন চেয়ে পাননি। ছুটে এসেছেন ফোনের কাছে। কে আটকে রেখেছে ফোন? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীরদের আলাপ শুনছিলেন তিনি। তারপর হঠাৎ কটুকণ্ঠে ব'লে উঠেছিলেন, 'মিষ্টার মজুমদার, স্ত্রীর সঙ্গে রোজ রোজ রসালাপ করবার জায়গা এটা নয়। তার জন্য আলাদা স্থান-কাল আছে।'

সেই কথার উত্তর-প্রত্যুত্তর দিতে দিতে নীরদকে শেষ জবাব দিতে হয়েছে চাকরি ছেড়ে। ম্যানেজার আর কেউ নন, অফিসের মালিকদের একজন।

সব শুনে তবু অণিমা বলল, 'তবু এক-কথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলে তুমি! একবার ভাবলে না, রাত পোহালে কি উপায় হবে আমাদের? যা দিনকাল আজকাল—কি উপায় হবে আমাদের বল দেখি?'

এতক্ষণ শান্তভাবে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সব বর্ণনা করছিল নীরদ, যেন সত্যই কিছু হয়নি, যেন আর একজনের কাহিনীর বিবরণ দিচ্ছে। কিন্তু স্ত্রীর দুঃসহ খেদোক্তি তাকে আর শান্ত থাকতে দিল না। ছোট্ট জলচৌকির ওপরে এমব্রয়ডারীর কাজটা পড়ে ছিল অণিমার। হঠাৎ তার ওপর চোখ পড়ল নীরদের, চোখ জ্বলে উঠল। উত্তেজিত স্বরে নীরদ বলল, 'উপায়? উপায় তোমার ওই কাঠগোলাপ। উপায় তোমার ওই কাঠগোলাপরা।'

অণিমা বলল, 'ছিঃ, ওসব কি বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি।' ব'লে হঠাৎ জলচৌকির ওপর থেকে টেবিলক্লথটা তুলে নিল নীরদ, তারপর হাতের মুঠোয় কুঁচকে জড়ো ক'রে জানলা দিয়ে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। জানলার নিচে কাঁচা নর্দমা। জিনিসটা তার মধ্যে গিয়ে পড়ল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অণিমা।

কিন্তু কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বেকার স্বামীর স্ত্রীকে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় সংসার। দিন পনের বাদে নীরদ একদিন বলল, 'নতুন কিছু শিগগির জুটবে ব'লে তো মনে হয় না, চল তোমাদের রেখে আসি। পরে সুবিধা মত আবার আনব।'

অণিমা ঘাড় নাড়ল, 'না, আমি যাব না।'

নীরদ বলল, 'তাহ'লে মর না খেয়ে।'

ফোন গেছে, ট্রাম-বাস গেছে, সিনেমা গেছে, পাড়াপড়শী, ঠাকুরপো-ঠাকুরঝিদের চা-জলখাবার খাওয়ানোর পর্বও শেষ হয়ে গেছে, কেউ তারা আর এদিকে ভেড়ে না। সবাই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা। দু'জনের মধ্যে দিনের মধ্যে দু'তিনবার ক'রে যে ঝগড়া লাগছে, আজকাল তা ঠিক দাম্পত্য-কলহ নয়, দু'টি অর্ধভুক্ত, বুভুক্ষু নরনারীর বিসম্বাদ—পরস্পরকে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ। ব্যাপারটা বুঝতে কারো আর বাকি নেই।

বুঝেছে নীরদের ছেলে নান্তুও। বছর ছয়েক বয়েস নান্তুর। সামনের কর্পোরেশন স্কুলে শ্লেট-পেনসিল নিয়ে সকালে পড়তে যায়। আগে আগে পয়সা চেয়ে নিয়ে যেত নীরদের কাছ থেকে, বলত, 'দু-পয়সায় হবে না বাবা, এক আনা দাও।'

সেদিন তাকে একটা আনি দিতে যাচ্ছিল নীরদ, নান্তু ঘাড় নাড়ল, 'না বাবা, থাক।'

'কেন, থাকবে কেনরে?'

নান্তু কানের কাছে মুখ এগিয়ে আনল নীরদের, ফিস ফিস ক'রে বলল, 'তোমার তো চাকরি-বাকরি নেই আজকাল। পয়সা দেবে কোত্থেকে? পাবে কোথায়? আমি কিন্তু আর কাউকে বলিনি বাবা, মা বলতে নিষেধ ক'রে দিয়েছে। তুমি ভেবো না, আমি কাউকে বলব না বাবা।'

ছেলের পিঠ চাপড়ে দিয়ে নীরদ বলল, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান, তুমি খুব বাহাদুর ছেলে। এবার চলে যাও স্কুলে। চারটে পয়সা নিয়েই যাও, কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি বলব না তোমার মাকে।'

নান্তু খুশী হয়ে হাত পাতল, 'তবে দাও।'

প্রথম মাস গেল, কিন্তু দ্বিতীয় মাস আর যায় না। নীরদ অবশ্য পুরোপুরি বেকার নেই, একটি পার্ট-টাইম চাকরি জুটিয়েছে। টাকা ষাটেক দেবে। কিন্তু তাতে হবে কি এ বাজারে?

দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর নীরদ আবার প্রস্তাব করল, 'কিছুদিনের জন্য ঘুরে এলেও তো পারতে।'

অণিমা ঘাড় নাড়ল, 'না, যাইতো অন্য সময় যাব। এই দশায় এই বেশে যাব না, কলকাতা ছাড়ব না আমি।'

নীরদ রাগে ঠোঁট কামড়াল। বড় বেয়াড়া ঘাড় অণিমার। একেক সময় মটকে দিতে ইচ্ছে করে।

কলকাতা ছাড়বে না অণিমা। বিলাস-ব্যসন, সখ-আহ্লাদ—সব গেছে, তবু আছে সহর, তবু আছে কলকাতা। কলকাতা একাই তো সব।

একদিন নীরদ কোত্থেকে ঘুরে এসে বলল, 'বেলেঘাটার বাজারে দেখলাম,—ভুবন চন্দ, ফটিক চন্দ দুই ভাই কুমড়োর ফালি কেটে নিয়ে

বসেছে। আমাকে দেখে প্রথমে ভারি লজ্জিত হ'ল। এর আগে সেদিন শিয়ালদর মোড়ে দেখে বলেছিল ফলের ব্যবসা করে। ফল যে এত বড় বড় ফল, তা তখন বুঝিনি, প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও ভুবনরা কিন্তু পরে বলল, বেশ দু' পয়সা থাকে।'

দেশে থাকতে ভুবন আর ফটিক রেজেস্ট্রী অফিসের সামনে দলিল-লেখার কাজ করত। অণিমা স্বামীর কথা শুনে চুপ ক'রে রইল, কোন কথা বলল না।

নীরদ বলল, 'দেখব নাকি চেষ্টা ক'রে? ও কাজের মধ্যে তো কোন জটিলতা নেই। বেশি মূলধনও লাগে না।'

অণিমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ভয় নেই আমি এবার সত্যিই চলে যাব। বাজারে কুমড়োর ফালি নিয়ে বসতে পারো তুমি? দু' মাস বেকার থেকেই অতখানি মনের বল হয়েছে তোমার? আমাকে আর ঘাঁটিও না।'

নীরদ সহরতলী থেকে সহরে যায়, দু' একটি অফিসে চেষ্টা-চরিত্র করে, বন্ধুবান্ধবের অফিসে গিয়ে দু' এক ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটায়। তারপর ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে জীবিকার জন্যে এই সব অদ্ভুত প্রস্তাব করে।

চরকুসুমপুরের ভদ্রেরা গামছার দোকান দিয়েছে বউবাজারের মোড়ে। মন্দ থাকে না মাসে। গুটি চার পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে তো এখনো টিঁকে। শেখরকান্দীর নবীন নন্দী ঘড়ি, ফাউণ্টেন পেন-মেরামতের কাজ শিখেছে, বাঁধা দোকান নেই কোন জায়গায়। অফিসে অফিসে ঘুরে কাজ জুটিয়ে নেয়। বলল তো বেশ দু' পয়সা থাকে। নবীন এক সময় নীরদের সঙ্গে পড়ত। এর আগে মাস্টারী করছিল দেশে, নবীন বলেছে পেন সারানো শিখতে বেশি বিদ্যা লাগে না, সময়ও লাগে না। নীরদ যদি চায়, নবীন তাকে আটঘাট সব ব'লে দিতে পারে।

অণিমা গম্ভীর মুখে বলে, 'বেশ তো, পার তো আপত্তি কি?' তারপর হঠাৎ জ্বলে ওঠে, 'কেন, সহর থেকে কি সব অফিস আদালত উঠে গেছে? লেখাপড়ির কাজের জন্য কি একজন লোকেরও আর দরকার নেই?'

খরচ যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া যায়, কমানো হয়েছে। কয়লা ধরাবার জন্য আগে কাঠ কিনত অণিমা, এখন নিজের হাতে ঘুঁটে দেয়। আগে লণ্ড্রিতে সপ্তাহে সপ্তাহে কাপড় যেত, অণিমার শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ—সব আর্জেণ্ট। এখন অন্য রকম ব্যবস্থা হয়েছে। দু' একটা জামা-কাপড় মাত্র পাঠানো হয় লণ্ড্রিতে। তাও অর্ডিনারী চার্জে। বাকি সব নিজের হাতে কেচে নেয় অণিমা। জানলার ধার দিয়ে ফেরিওয়ালারা এখনো যাতায়াত করে, মাঝে মাঝে ডাকে, 'মা লক্ষ্মী, নেবেন না কিছু? ভালো ছিট কাপড় আছে ব্লাউজের জন্য। এমন সস্তা আর কারো কাছে পাবেন না।' অণিমা কোন কোন দিন শুনতে না পাওয়ার ভান করে, কিন্তু যেদিন চোখে চোখ পড়ে, এগিয়ে যায় জানলার কাছে, মধুর হেসে বলে, 'না বাপু, আজ থাক, আমার সব আছে। যখন দরকার হবে তোমার কাছ থেকেই নেব।'

হকারকে কাগজ বন্ধ ক'রে দিতে বলেছে নীরদ। বাইরের চায়ের দোকান থেকে কাগজ দেখে আসে। আগে দেখে কর্মখালির বিজ্ঞাপন। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে বেছে বেছে পুরোন বই কেনার নেশা ছিল সখের মধ্যে। আপাততঃ ছাড়তে হয়েছে। দু' টাকার বাজার নেমেছে এক টাকায়, চৌদ্দ আনায়। তার কমে আর পারা যায় না। কিন্তু আয় যদি না বাড়ে, শুধু ব্যয় কমালে হবে কি?

বড় রাস্তার মোড়ে বসেছে রিলিফ-সেণ্টার। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণাগতদের সাহায্যকেন্দ্র। রেশনকার্ড পিছু সপ্তাহের যোগ্য চাল, ময়দা, আটা দেওয়া

হয় বিনা পয়সায়। সকাল থেকে দুপুর, বিকেল থেকে রাত আটটা 'কিউ' দিয়ে লোক দাঁড়ায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দাঁড়াতে দাঁড়াতে শেষ দিকে থলে পেতে বসে। মেয়েছেলেরা একটু দূরে কার্ড হাতে ক'রে দাঁড়িয়েই থাকে। কারো মুখ নিচু, কারো মুখ ঘোমটায় ঢাকা। দেখা যায় কেবল হাত। শাঁখা-পরা হাতে নতুন সাদা সাদা কার্ডগুলি মন্দ মানায় না। দু'চারজনকে চেনা-চেনা মনে হয় নীরদের। কিন্তু কেউ চিনতে চায় না, তারাও না, নীরদও না। যাতায়াতের পথে আজকাল যেন এই দীর্ঘ শ্রেণীটিকে বেশি ক'রে চোখে পড়ে নীরদের। চা খেতে খেতে একেক দিন স্ত্রীর কাছে তোলে এদের প্রসঙ্গ।

অণিমা বলে, 'ও সব ছাড়া কি তোমার মুখে কথা নেই? দয়া ক'রে থাম, আমার গা কাঁপে।'

একেক দিন বলে, 'আজকাল সহরের আর কোন কিছু বুঝি তোমার চোখে পড়ে না? এত গাড়ি-বাড়ি, সিনেমা, থিয়েটার—'

কিন্তু সহরে এরাও আছে, এরাও এসেছে। একথাটা মুখে উচ্চারণ না করলেও দুজনেই মনে মনে ভাবে।

পাশের বাড়িতে কলেজে-পড়া মেয়ে আছে একটি,—কেতকী গুপ্ত। তার সঙ্গেও ভাব হয়েছিল অণিমার। একদিন দেখা গেল, অণিমা সেজেগুজে তার সঙ্গে বেরুচ্ছে। বাক্স থেকে বেরিয়েছে দামী শাড়ি, ব্লাউজ, হাই হিলওয়ালা জুতোয় ফের কালি পড়েছে। মুখে, পড়েছে পাউডারের পাফ। নীরদ জিজ্ঞাসা করল, 'ব্যাপার কি? যাচ্ছ কোথায়?'

অণিমা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'সিনেমায়, এবার দেখতে নয় গো, পার্ট করতে, দেখ তো হিরোইনের ভূমিকায় মানাবে না কি?'

কিন্তু ফিরে যখন এল তখন সেই হাসিখুশী ভাব আর নেই অণিমার। ভারি ম্লান, ভারি শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে মুখ।

সিনেমায় নয়, একটি ছোট স্কুলে গানের মাস্টারীর ইণ্টারভিউর জন্য গিয়েছিল অণিমা। কেতকীর জানাশোনা স্কুল, তবু হ'ল না, কেবল গলা থাকলেই তো হবে না, ছাত্রীদের শেখাতে হ'লে গ্রামার জানা চাই গানের।

তবু আরো একদিন বেরুল অণিমা। সাজসজ্জার ঘটাটা কম হ'ল না। কিন্তু আসবার সময় আগের দিনের মতই লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে ফিরে এল অণিমা। আজও হ'ল না। শ্যামবাজারে কোন এক স্কুলে সেলাইর মাস্টার চেয়েছিল। কিন্তু ঘরের কাজ চলনসই রকম মোটামুটি জানলেও সব জিনিস শেখাবার মত বিদ্যা সেলাইতেও নেই অণিমার। সেক্রেটারীর পছন্দ হয়নি।

লেখাপড়ার মাস্টারী তো হবে না। কারণ লেখাপড়া অণিমা যা শিখেছে তা নাটক-নভেল প'ড়ে, স্কুল-কলেজে প'ড়ে নয়।

নীরদ মাঝে মাঝে ধমক দেয়, 'করো তোমার যা খুশী। যেমন পরের কথায় বারবার নাচ, তেমনি বোঝ মজা। অত সস্তা নয়, অত সহজ নয়, এর নাম সহর।'

অণিমা একদিন বলল, 'আচ্ছা, নার্সগিরিতে তোমার আপত্তি আছে?'

নীরদ বলল, 'কিছুমাত্র না, পারো তো ক্ষতি কি? দেখ না চেষ্টা ক'রে।'

অণিমা এক আধটু চেষ্টা যে না ক'রে দেখল তা নয়। রোগ-ব্যাধিতে আত্মীয়-স্বজনের সেবা-শুশ্রূষা ক'রে দেশে থাকতে সে সুনাম কিনেছিল। কিন্তু সে সুনাম এখানে যথেষ্ট নয়। নার্স হতে হ'লে আলাদা শিক্ষা চাই। চাই শিক্ষকের সার্টিফিকেট, কিন্তু সেই সার্টি-ফিকেট সংগ্রহের অর্থ কোথায়, সময়ই বা কই অণিমার?

আরো কাটল কিছুদিন। একদিন এমনি চাকরির চেষ্টা থেকে ফিরবার পথে বাসে দুই বুড়ীর সঙ্গে আলাপ হ'ল অণিমার। ঠিক বুড়ী নয়, আধা-বয়সী। থান কাপড় পরণে। মাথায় পুরুষের মত ছোট ক'রে ছাঁটা চুল, বেশ শক্তপোক্ত কাঠখোট্টা ধরণের চেহারা। তবু অণিমার কাছে তারা বুড়ী ছাড়া কি। কিন্তু বুড়ী হ'লেও অনেক হাসি-খুশী তাদের মুখ। বেশ শ্রী-ছাঁদ মুখের। হাসিতে কোন মুখ না সুন্দর দেখায়? এগিয়ে এসে আলাপ করল অণিমা। তাদেরও বাড়িও মাদারীপুর অঞ্চলে ধূলগ্রামে, এখন বাসা করেছে বিশ্বাস নার্সারী লেনে। দুই বোন মানদা, যশোদা। ব্রাহ্মণেরই মেয়ে। বোন-পো আছে সঙ্গে। দুই বোনেরই বোন-পো। যে বোনের ছেলে, সে বোন নেই, বোন-পো কোন কাজকর্ম করে না।

'কি ক'রে চলে?' অণিমা জিজ্ঞাসা করেছিল।

দু'জনেরই মধ্যে যে বড়, সে পাশে গাঁট-বাঁধা এক গাদা খবরের কাগজ দেখিয়ে দিল, পুরোন ইংরেজী কাগজ। ভাঁজ করা। নারকেলের দড়ি-বাঁধা গাঁট। সেই বাঁধনের ফাঁকে ফাঁকে লণ্ডনের ছবি।

অণিমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ সব কি?'

যশোদা জবাব দিয়েছিল, 'এ সব কি? এস না একদিন বেড়াতে আমাদের বাসায়, সব বলব। এক দেশ থেকেই তো এসেছি। আবার এসে পড়েছিও এক জায়গায়। এস একদিন।'

অণিমা গেল এবং আজ আর ব্যর্থতায় মুখ ম্লান ক'রে ফিরে এল না।

বাসে ক'রে কাগজের মোট বয়ে আনতে হয় না। বাড়িতে লোক এসে দিয়ে যায় কাগজের গাঁট। নেওয়ার সময়ও সে-ই নেয়, টাকা-পয়সার লেন-দেনও তার সঙ্গেই চলে। নাম শ্রীবিলাস। যশোদা-মানদা

তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অণিমার। বলল, 'ভয় কি, আমরা আছি। শিক্ষিত মেয়ে, তোমার শিখতে ক'দিন লাগবে? হালচাল, কায়দা-কানুন জানতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?'

যশোদা-মানদা এসে পানের বাটা নিয়ে বসল অণিমার ঘরে। জামা-কাপড় পরে বেরুবার আগে নীরদ তাদের দিকে একবার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকাল। তারপর অণিমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'এরা আবার জুটল কোত্থেকে?'

অণিমা বলল, 'দেশের লোক, পিসী হয় সম্পর্কে।'

নীরদ বলল, 'পিস-শাশুড়ীরা এখানে এবেলা আহারাদি ক'রে যাবেন না কি?'

অণিমা হেসে ঘাড় নাড়ল, 'না, সে ভয় করো না। তার আগে জামাইকে তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবেন।'

দিন কয়েক কিছু লক্ষ্য করল না নীরদ। তারপর তার মনে হ'ল গোপনে গোপনে কি যেন অণিমা করে। নীরদের কাছে কিছু ভাঙে না, কিছু জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়। আড়াল ক'রে রাখতে চায় সব। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে যখন জিনিসপত্র কিনত, তখনো আড়াল রাখত অণিমা, অনেক কথা গোপন ক'রে যেত। এখনো যদি তাই করতে চায়, করুক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবার মত সময় আর সামর্থ্য নেই নীরদের।

দু' তিন দিন বাদে তবু একদিন নীরদ জিজ্ঞাসা করল, 'হচ্ছে কি, শুনি?'

অণিমা হাসল, 'কি আবার হবে? টেবিলক্লথে সেই কাঠগোলাপ তুলছি।'

এমব্রয়ডারীর কাজটা স্বামীকে এবারও দেখাল অণিমা। লংক্লথের নতুন কাপড়ে নতুন ধরণের কাজ। এক দিক হয়েছে, তিন দিক বাকি।

নীরদ বলল, 'আবার সুরু করেছ! ক্লাবের সেই বার্ষিক অধিবেশন এখনো শেষ হয় নি?'

অণিমা বলল, 'হয়েছে। এবার হবে বিশেষ অধিবেশন।'

নীরদ বলল, 'বেশ।'

হাঁটাহাঁটি, ঘোরাঘুরির ফলে নীরদের খুব ঘুম হয় রাত্রে। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসে। চোখ যখন খোলে, তখন রোদ উঠে যায়। চায়ের কাপের টুংটাং আওয়াজ শোনা যায় দাওয়ায়।

কিন্তু সেদিন কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে শেষ রাত্রেই ঘুম ভেঙে গেল নীরদের। বেলে-বেলে জ্যোৎস্না এসেছে ঘরে। সেই জ্যোৎস্নায় দেখা গেল বিছানায় ছেলেমেয়েরা আছে, কিন্তু অণিমা নেই। বুকটা ছাঁৎ ক'রে উঠল নীরদের। ব্যাপার কি, অণিমা গেল কোথায়! স্বপ্নে দেখেছিল একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে অণিমা জানলায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে।

ঘরের মধ্যে আবছা আবছা অন্ধকার। তক্তাপোশ থেকে মেঝেয় নামল নীরদ। নিবু নিবু হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের মধ্যে। মেঝেয় মাদুর বিছানো। একরাশ খবরের কাগজ, কাঁচি, আঁটার বাটি, আর মাঝারি ধরণের একটি ঝাঁকায় কি সব সাজানো। তার পাশে মাথার তলায় হাত দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অণিমা। ফের সন্তান হবে। ঘুমটি ইদানীং ওর একটু বেশিই হয়েছে।

হ্যারিকেনের মৃদু আলো পড়েছে মুখের আধখানায়। আলোছায়া-ঘেরা অণিমার মুখ নীরদ অনেকবার অনেকরকম ভাবে দেখেছে। এ সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই। মুখের চেয়ে ঝাঁকাটাই বেশি ঔৎসুক্য জাগাল নীরদের মনে। কি আছে ঝাঁকায়? ভালো ক'রে দেখবার জন্য ঝাঁকার সামনে নীরদ মুখ বাড়াল। আর কিছু নয়, ঠোঙা!

ঝাঁকার মধ্যে থরে থরে সাজানো ঠোঙার রাশ। কোন কোন ঠোঙার সবটাই আগাগোড়া ছবির কাগজে তৈরী। এক-রঙা নয়, নানা-রঙা।

চেয়ে থাকতে থাকতে নীরদের মনে হ'ল ঠোঙাগুলি যেমন-তেমনভাবে ঝাঁকার মধ্যে ঠেসে দেওয়া হয়নি। বেশ একটা ফুলের নক্সায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফুলটি অবশ্য শেষ হয়নি। কেবল সুরু হয়েছিল। কি ফুল কে জানে। নীরদ তো সব ফুল চেনে না। হয়তো কাঠ-গোলাপই হবে।

শুল্ক

ঢাকা মেল ছাড়বে রাত দশটায়, কিন্তু ঘণ্টা দুই আগেই লালমোহন সাহা স্টেশনে এসে হাজির হোল। সঙ্গে বড় একটা ট্রাঙ্ক, দু'টো স্যুটকেস, খাবারের চুপড়ি, আর বিছানা। রিক্সা থেকে একে একে কুলির সাহায্যে জিনিসগুলি নিচে নামিয়ে রাখল লালমোহন। তার পর কুলিকে ঠিক সময়ে আসতে ব'লে দিয়ে বিড়ি ধরাল। টিকেট অবশ্য আগেই করা আছে। কিন্তু শুধু টিকেট থাকলেই আজকাল মালপত্র নিয়ে নির্বিবাদে ঢাকা মেলে ওঠা যায় না। ল্যাণ্ড কাস্টম থেকে ছাড়পত্র নিয়ে, সেখানে প্রত্যেকটি বাক্স-পেঁটরা খুলে পরীক্ষা ক'রে দেখে যাত্রী কোন নিষিদ্ধ মাল পাকিস্তানে নিয়ে যাচ্ছে কি না, তারা তন্ন-তন্ন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে। কিছু-মাত্র মায়া-দয়া নেই। দিন পনের আগে ভারি লোকসান গেছে লাল-মোহনের। কাস্টম অফিসার তার স্যুটকেসের ভিতর থেকে পনের গজ ছিটের কাপড় আর পাঁচখানা মিলের শাড়ি কেড়ে রেখেছেন। লালমোহন অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল, হাতে-পায়ে ধরেছিল, এমন কি অফিসারের বাঁ হাতে দু'টো টাকাও গুঁজে দিতে গিয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো, অফিসার তেড়ে এসে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অনেক কষ্টে জেল থেকে সে-যাত্রা রক্ষা পেয়েছে লালমোহন। মনে মনে ভেবেছে,

এ ব্যবসা আর না। কিন্তু কলকাতায় ফের ঘুরে আসতেই প্রতিজ্ঞা ঠিক থাকেনি লালমোহনের। ব্যবসা করতে হলেই লাভ-লোকসান আছে। ঝুঁকিও নিতে হয় নানা রকম। কত মহাজনের হাজার-হাজার, লাখ-লাখ টাকা যায়, তাই ব'লে তারা ব্যবসা বন্ধ ক'রে বসে থাকে না কি? লালমোহন অবশ্য মহাজন নয়, হাজার-হাজার, লাখ-লাখ দূরে থাক, শ' খানেক টাকা লোকসান দেওয়াও তার পক্ষে দুঃসাধ্য। তবু হাত-পা কোলে ক'রে চুপচাপ বসে থাকতে পারেনি লালমোহন। পাকিস্তানে এই ব্যবসাই সব চেয়ে ভালো চলছে। তিন গুণ চার গুণ লাভ। ছোট-বড় অনেক মহাজনই এই ভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে। লালমোহন এবারেও কলকাতায় এসে শাড়ি, ধুতী, ছিটের কাপড়ে শ' তিনেক টাকা খাটিয়ে বসল। বাক্স-বিছানার মধ্যে ভরল মালপত্র। ওপরে কোনটায় ফলমূল, কোনটায় বা শাক-শব্জী, টুকি-টাকি নির্দোষ সব জিনিস। কিন্তু দেখে-শুনে খোঁজ-খবর নিয়ে এবার ভারি সতর্ক হয়ে গেছে লালমোহন। পুরুষ কাস্টম অফিসারের কাছে আর যাবে না। কোন স্ত্রীলোকের চড়নদার হয়ে মাল পাশ করাতে হবে লেডী কাস্টম অফিসারের মারফতে। ঘুরে ঘুরে ক'দিন ধরেই লক্ষ্য করছে লালমোহন, দু' তিন জন ভদ্রঘরের অল্পবয়সী মেয়ে আছে এই বিভাগে। মহিলা যাত্রীদের বাক্স-পেঁটরা তারা ওপর ওপর দেখেই ছেড়ে দেয়। ভিতরে বড় একটা ঘাঁটাঘাঁটি করে না। মেয়েদের পথটাই সব চেয়ে সুগম আর মনোরম। এই পথেই মাল পাশ করাবে লালমোহন।

নিজের সঙ্গে অবশ্য কোন মেয়েছেলে নেই। বাড়িতে বুড়ো মা আছে। আর তিনটি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে এসে ঘাড়ে পড়েছে বিধবা দিদি। লালমোহন দিনের মধ্যে তিন বার তাদের বাড়ি থেকে পথে বের ক'রে দেয়, বলে, 'এই দুর্দিনে আমি কেউকে আর খাইতে দিতে পারব না। যার যার রাস্তা দেখ ত এখন।'

তার পর ফের বটতলা থেকে, নদীর ঘাট থেকে দিদি আর ভাগ্নে-ভাগ্নীদের হাত ধ'রে টেনে নিয়ে আসে। কলকাতায় কোত্থেকে লালমোহন মেয়েছেলে কাউকে নিয়ে আসবে। কিন্তু নিজে না আনতে পারলেও আর কেউ-কেউ আনে। এই যেমন হরবিলাস শীল তার পরিবারকে স্ত্রী-ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছে। চিকিৎসা শেষ হয়ে গেছে হরবিলাসের স্ত্রীর। সপ্তাহ খানেক মাত্র হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাকে। সেই সাত দিনের মধ্যে তিন দিন গিয়ে লালমোহন বেদানা আর কমলা লেবু দিয়ে এসেছে। হেসে বলেছে, 'যাওয়ার দিন একসঙ্গেই যাব কিন্তু হরোদা।' হরবিলাস জবাব দিয়েছে, 'তা তো যাবই।'

লালমোহন হরবিলাসের স্ত্রী সুনয়নীর দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'আমার সঙ্গে কিছু মালপত্র থাকবে বউদি। যদি জিজ্ঞাসাবাদ করে, বলতে হবে কিন্তু আপন দেওর।' সুনয়নীও হেসেছে, 'তা তো বলবই। আপন ছাড়া পর না কি তুমি। কিন্তু ভালো দেইখা একখানা শাড়ি কিন্তু আমারে সস্তায় কইরা দিতে হবে ভাই।'

লালমোহন বলেছে, 'তা আপনাকে বলতে হবে না বউদি। আপনি ভালো হইয়া ওঠেন। শাড়ির জন্য ভাবনা কি আপনার।'

দিন-ক্ষণ সব ঠিক হ'য়ে গেছে। সস্ত্রীক হরবিলাসও আজই যাবে। সেই সঙ্গে দেবর লক্ষ্মণ সেজে যাবে লালমোহন। সব মাল হরবিলাসের স্ত্রী সুনয়নী শীলের মাল।

আট-ঘাঁট সব বেঁধে রেখেছে লালমোহন। আর ভাবনা নেই। বড় ট্রাঙ্কটার ওপর ব'সে লালমোহন বিড়ি টানতে লাগল, আর মাঝে-মাঝে তাকাতে লাগল, স্ত্রীকে নিয়ে হরবিলাস এবার এসে পড়লেই হয়। কেবল একই গাঁয়ে নয়, একই পাড়ায় হরবিলাস শীলের বাড়ি। লালমোহনের সঙ্গে

বেশ সৌহৃদ্যও আছে। ভারি চালক-চতুর লোক হরবিলাস। তার পর সব চেয়ে বড় ভরসা—স্ত্রী আছে সঙ্গে।

রিক্সা, ট্যাকসী, ঘোড়ার গাড়িতে সমস্ত স্টেশনটা ভরে উঠল। নানা বয়সী স্ত্রীলোক নিয়ে কত লোক নামল। কিন্তু আশ্চর্য, হরবিলাসের দেখা নেই! অধীর হয়ে ট্রাঙ্ক থেকে উঠে লালমোহন আরো একটু এগিয়ে দেখতে যাচ্ছে, হন্ত-দন্ত হয়ে বাইশ-তেইশ বছরের একটি যুবক এসে সামনে দাঁড়াল,—'আপনি এখানে লালুদা, আপনাকে যে কত জায়গায় খুঁজেছি, তার ঠিক নেই।'

হরবিলাসের পিসতুতো ভাই হরিপদ। উল্টাডাঙায় তারই বাসায় এসে উঠেছে হরবিলাস।

লালমোহন জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার দাদা বউদি কোথায় ?'

হরিপদ বলল, 'সেই কথাই তো বলতে এলাম। দাদার আজ যাওয়া হবে না। বউদির অসুখ আবার বেড়েছে। ডাক্তার বললেন, দু'-এক দিন তো দূরের কথা, দু'-এক সপ্তাহের মধ্যেও ওঁকে নড়ানো যাবে না। দাদা আপনাকে অন্য ব্যবস্থা করতে বললেন।'

হরিপদ চলে যাওয়ার পর লালমোহন খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে রইল। না, যেমন করে পারুক, আজই সে গাড়িতে উঠবে। আর অপেক্ষা করতে পারে না সে। রিক্সায় ক'রে মাল আনতে দেড় টাকা খরচ গেছে। ফিরিয়ে নিতে যাবে আরো দেড় টাকা। তার পর কলকাতা সহরে ক'দিনই বা এমন গাঁটের টাকা খসিয়ে হোটেল খরচ গুণবে। তাছাড়া গাঁটে আর টাকাই বা কই।

ইৎফাক বুদ্ধি লালমোহনের হরবিলাসের চেয়ে কম নয়। স্ত্রী নিয়ে হরবিলাস আজ না যাচ্ছে, না যাক, সস্ত্রীক আরো অনেক যাত্রী আছে ঢাকা মেলের। তাদের কারো সঙ্গ ধরলেই হবে।

ফিটফাট পোষাক আর ফুটফুটে চেহারার একটি যুবক সুন্দরী স্ত্রী আর বাক্স-বিছানা নিয়ে ল্যাণ্ড কাস্টমের মহিলা বিভাগের দিকে এগোচ্ছিল, লালমোহন সরাসরি তাকে গিয়ে বলল, 'একটা কথা শুনবেন মশাই ? আপনার বাড়ি কোথায় ?'

যুবকটি বিস্মিত হয়ে বলল, 'ফরিদপুর, কেন বলুন তো ?'

লালমোহন বলল, 'আমার বাড়িও ফরিদপুর। একই জেলার মানুষ তাহ'লে আমরা, একটু উপকার করবেন দাদা ?'

'কি করতে পারি বলুন ?'

লালমোহন তার বাক্স-বিছানাগুলি দেখিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'আজ্ঞে বেশি কিছু করতে হবে না। বউদি শুধু তাঁর মালের সঙ্গে আমার এই মালগুলিও পাশ করাইয়া নেবেন। কেবল বলতে হবে, আমি আপনাদের লোক, মালগুলিও আপনাদের।'

অবনী ভ্রূ কুঁচকে লালমোহনের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে বলল, 'দেখুন, আপনার মত সুরসিক লোককে আপন লোক বলতে আমার স্ত্রী বোধ হয় আপত্তি করবে না, কিন্তু আপনার মালগুলি সম্বন্ধে আমাদের কিছু আপত্তি আছে। জানেন তো, ভারি কড়াকড়ি সুরু হয়েছে আজকাল, ঘেঁটে একেবারে ওলট-পালট ক'রে দেখে।'

পত্নীবান আরো পাঁচ সাত জন যাত্রীর কাছে ঘুরে ঘুরে একই আবেদন জানাল লালমোহন, কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাই সেই একই জবাব দিল। যা দিন-কাল আর যা কড়াকড়ি আজকাল, তাতে সাধ ক'রে এত বড় ঝুঁকি ঘাড় পেতে নিতে যাবে কে !

লালমোহন হতাশ হোল, কিন্তু হতোদ্যম হোল না। চিরকাল একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ। গোঁ চাপলে তাকে সহজে কেউ

থামিয়ে রাখতে পারে না। রাগলে কেবল মুখ থেকে তার গালাগালই শুধু বের হয় তাই নয়, মাথা দিয়ে ফন্দি-ফিকিরও বের হতে থাকে!

লালমোহন সঙ্গের নন্দ দাসকে বলল, 'কোন্ শালা রেল কোম্পানী আমাকে আজ আটকে রাখে দেখি। তুমি একটু বোসো দেখি নন্দ। জিনিসগুলি পাহারা দাও। পুরুষদের মাল-পরীক্ষার জায়গাটা আমি একবার ঘুরে আসি।'

পাড়ার নন্দ দাসও যাচ্ছে লালমোহনের সঙ্গে। নিষিদ্ধ মালের মধ্যে তার কেবল সের খানেক আটা, বলবে, 'একাদশীতে খাবার জন্য নিচ্ছি।' নিতান্তই যদি না ছাড়ে তো যাবে, নিরীহ ভীতু স্বভাবের মানুষ নন্দ। তার ইচ্ছা নয় এ সব ঝামেলার মধ্যে থাকে, কিন্তু তার চেয়ে লালমোহনের ইচ্ছার জোর বেশি।

নন্দ বলল, 'আজ আমি যাই লালমোহন। তুমি না হয় সুবিধা মত কাইল যাইও।'

লালমোহন তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'আঃ, থাম তো। যা বলছি তাই কর। মালগুলি আগলাও। আজ আমিও যাব, তুমিও যাবা। আমার যদি না যাওয়া হয়, তোমাকেও যাইতে দেব না।'

নন্দকে মালের কাছে বসিয়ে পুরুষ যাত্রীদের মাল-পরীক্ষার জায়গায় আজকের ভিড় আর কড়াকড়ির নমুনাটা দেখতে বেরুল লালমোহন। যেতে-যেতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল, সঙ্গে স্ত্রীলোক আছে এমন কোন পরিচিত লোক যদি চোখে পড়ে।

ডান দিকে দুঃস্থ বাস্তুত্যাগীদের ছোট-ছোট জটলা। দিব্যি স্টেশনের ধারেই সবাই সংসার পেতেছে। কেউ খাচ্ছে, কেউ ঘুমাচ্ছে, স্ত্রী-পুরুষের ঝগড়া চলছে, প্রেমালাপও চলছে তার পাশে, সেদিকে তাকাতে তাকাতে

লালমোহন এগিয়ে চলল। যে যাই বলুক, এদের চাইতে পাকিস্তানে অনেক ভালো আছে লালমোহনেরা।

'বাবু,—শোনেন।'

হঠাৎ পিছন থেকে মেয়েলি-গলার ডাক শুনে ফিরে তাকাল লালমোহন, তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আঠার-উনিশ বছরের একটি মেয়ে। পরনে খাটো, জীর্ণ শাড়ি। এত ময়লা যে আসল রঙটা আর চেনা যায় না। চেহারাটাও রোগাটে। তবু ওরই মধ্যে দেহে বেশ একটু শ্রী-ছাঁদ আছে। জোড়া ভ্রূ, নাক-চোখ টানা-টানা, মাথায় একরাশ চুল। লালমোহনের মনে পড়ল, খানিক আগে একটি রুগ্ন প্রৌঢ়ার সঙ্গে এই মেয়েটিকে ঝগড়া করতে দেখে এসেছে। একটু কাল মেয়েটির দিকে তাকিয়ে লালমোহন বলল, 'কি বলছ?'

মেয়েটি একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'আইজ সারা দিনের মইধ্যে একটা দানাও পেটে যায় নাই। রোগা মা, সে-ও উপাস কইরা আছে। ক্ষিদার জ্বালায় পারে তো আমারে ধইরা খায়। দয়া কইরা কিছু দেবেন?' মেয়েটি হাত বাড়াল।

লালমোহন লক্ষ্য করল, এক গাছা নীল রঙের কাচের চুড়ি শুধু হাতে। তবু মন্দ মানায়নি। হাতের গড়নটুকু ভালো। আঙুলগুলো বেশ লম্বা লম্বা। ডগাগুলো সরু।

লালমোহন রূঢ় স্বরে বলল, 'দয়া করার সময় নাই আমার, পয়সা নাই।' সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল লালমোহন। কিন্তু পিছন থেকে মেয়েটি আবার ডাকল, 'শোনেন, কিছু দিয়া যায়ন।' লালমোহন আবার একটু লক্ষ্য ক'রে দেখল মেয়েটির সর্বাঙ্গ। না, দেখতে-শুনতে মন্দ নয় মেয়েটি। বেশ চলে ভদ্রঘরে।

লালমোহন বলল, 'দিতে পারি, আমার কথা যদি শোন।'

মেয়েটি লালমোহনের চোখের দিকে তাকাল। কি কথা যে শুনতে হবে, তা তার অজানা নেই। এমন দু'-এক জনের কথা আরো তাকে শুনতে হয়েছে। তার মুখে পেটের ক্ষিদের কথা শুনলে, এদের চোখে আর এক রকমের ক্ষিদে ফুটে ওঠে, তা তার অজানা নেই।

আরো একটু এগিয়ে এল মেয়েটি, তারপর মৃদু হেসে গলা নামিয়ে বলল, 'শোনব না ক্যান। যা কয়ন, তাই শোনব। কি কবেন কয়ন।'

লালমোহন বলল, 'এখানে কি কওয়া যায়, সাথে আইস আমার। তোমার নাম কি ?'

'চম্পা।'

লালমোহন মধুর স্বরে বলল, 'নামডা তো ভালোই, আইস সোনা, আইস।'

খানিকটা হেঁটে ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমের দোরটা একটু ঠেলে দেখল লালমোহন, ভিতরে জন-মানব কেউ নেই। লালমোহন পিছনের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'আইস।'

চম্পা পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল।

লালমোহন আরও একটু কাছে এগিয়ে দাঁড়াল। চম্পা এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'কি দেবেন, কয়ন আগে।'

লালমোহন কিন্তু চম্পার কোন অঙ্গ স্পর্শ করল না, শুধু মুখের কাছে মুখ এগিয়ে এনে ফিস-ফিস ক'রে বলল, 'আমার একটি কাজ যদি উদ্ধার কইরা দিতে পার, যা চাও তাই দেব তোমারে।'

তারপর আরও একটু ফিস-ফিস ক'রে কাজের ধরনটা চম্পাকে জানাল লালমোহন।

প্রস্তাবটা অদ্ভুত। লালমোহনের মত আরো দু' একজন তাকে কথা শোনাতে ডেকেছে। মনের কথাও বলেছে। কিন্তু এমন কথা বলেনি।

একটু ইতস্ততঃ ক'রে একটু ভেবে চম্পা বলল, 'কিন্তু যদি ধইরা ফেলায়।'

লালমোহন একটু হাসল, 'তাইলে তো বোঝই। হাত ধরাধরি কইরা দুই জনরেই জেলে যাইতে হইবে। শুনছি, জায়গাডা নেহাৎ মন্দ না সেখানে। খোরাকও মেলে, থাকার জায়গাও মেলে।'

চম্পা বলল, 'বেশ, রাজী আছি। কিন্তু পেরথমেই ধইরা ফেলবে যে। আপনার কেমন ধোপ-দুরস্ত ফর্সা জামা কাপড়, আর আমার এই নোংরা ছেঁড়া শাড়ি। স্বামী-স্ত্রীর মত মানাবে কেন?'

লালমোহন খুশী হয়ে বলল, 'ঠিকই তো কইছ। তোমার বুদ্ধি আছে চম্পা। এমন বুদ্ধি আগাগোড়া থাকলে তুমি কেবল আমার ক্যান, জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও বউ হইতে পারবা। দাঁড়াও একটু। আমি সব ব্যবস্থা কইরা আনি।'

তার পর মিনিট দুয়েকের মধ্যে টিনের ছোট স্যুটকেসটা হাতে ক'রে ফিরে এল লালমোহন। নিজের ছাড়া ময়লা জামা-কাপড়, ছোট আয়না-চিরুণী, দু'বাণ্ডিল বিড়ি-দেশলাই এবং আরো টুকটাক জিনিস-পত্রের তলায় থান কয়েক নানা রঙের নানা রকমের শাড়ি। তার ভিতর থেকে চওড়া-পেড়ে চাঁপা-রঙের একখানা শাড়ি বের ক'রে দিল লালমোহন, বলল, 'নাও, পর এইখানা। এবার বোধ হয় আর বেমানান হবে না। সতের টাকা চোদ্দ আনা কইরা পড়ছে। গ্রামে যাইয়া মুনসী-বাড়িতে তিরিশ টাকা কইরা তো বেচবই, বেশীও বেচতে পারি।'

চম্পা জিজ্ঞাসা করল, 'কেবল কি বেচবেনই, বউরে দেবেন না?''

লালমোহন হাসল, 'বউ! বউ আবার কোথায়! বউ তো তুমিই।'

চম্পা একটু লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল, তার পর আড় চোখে ফের লালমোহনের দিকে তাকাল। গৌরবর্ণ, সুন্দরপনা, ছিপছিপে চেহারা। বেশ সুপুরুষ লালমোহন। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশী হবে না।

চম্পা বলল, 'যায়ন, বাইরে গিয়া দাঁড়ায়ন এখন একটু।'

লালমোহন বলল, 'ক্যান ?'

চম্পা মনে মনে হাসল। লোকটি বিয়ে করেনি ঠিকই। মেয়েদের ব্যাপার কিছু বোঝে না।

চম্পা ভ্রূ কুচকে বলল, 'তবু কয় ক্যান, কাপড়-চোপড় পরব না ?'

লালামোহন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ও' ; তার পর বলল, 'ভালো কথা। কেবল দামী শাড়ি পরলেই তো হবে না। স্বামীর সঙ্গে চলছ, সধবা মানুষ। সীঁথিতে কপালে সিন্দূরও তো লাগবে। তুমি ততক্ষণ শাড়ি পর, আমি সিন্দূর নিয়া আসি। সেই সঙ্গে একটা প্লাটফর্ম টিকিটও কাইটা আনব।'

খানিক বাদে ফিরে এল লালমোহন। কেবল সিন্দূর নয়, দু'খিলি মিঠে পানও নিয়ে এসেছে মোড়কে ক'রে। একটা পান চম্পার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'খাও, খাইয়া ঠোঁট দুইটা রাঙ্গা কইরা লও একটু। সধবা বউ-ঝি তো। পান না খাইলে মানায় না।'

চম্পা বলল, 'তা না হয় খাইলাম। কিন্তু অবিয়াত মাইয়া। এ সিন্দূর সীঁথিতে কতক্ষণ রাখতে পারব? মাইনযের চউখে পড়বে যে।'

স্টেশনের ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা শব্দ হোল। আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল লালমোহন, 'ঈস্, সাড়ে নয়টা বাইজা গেল বুঝি। সাজ-গোজ যা করবার তাড়াতাড়ি সাইরা ফেলাও; এয়ার পর আর গাড়ী ধরতে পারব না।'

দু'-তিন মিনিট পরে চম্পা বলল, 'চলেন, আমার হইয়া গেছে।'

লালমোহন এক নজরে দেখে নিল। হলদে রঙের শাড়িতে ভালোই মানিয়েছে চম্পাকে। আঁট-সাঁট ক'রে ঘুরিয়ে-টুরিয়ে শাড়িখানা পরেছেও

বেশ ভালো। সীঁথিতে সিন্দূর, কপালে সুগোল ফোঁটা। ভদ্রঘরের লক্ষ্মী বউ ব'লে দিব্যি চ'লে যাবে।

লালমোহন বলল, 'ঘোমটাডা আরো একটু খাটো কইরা দাও। অত বড় ঘোমটা আইজ-কাল আর দেয় না। আর চুলও ভালো কইরা আঁচড়ান হয় নাই। উস্কু-খুস্কু রইয়া গেছে। সন্দেহ করতে পারে। আমি আয়নাডা উঁচু কইরা ধরি, তুমি চিরুণী দিয়া আরো গোটা দুই আঁচড় দিয়া লও।'

ক'দিন ধ'রে ভালো মত তেল পড়ে না মাথায়। চুল ভালো আঁচড়ানো হবে কি ক'রে। কিন্তু তেলের অভাবের কথা উল্লেখ না ক'রে চম্পা বলল, 'থাউক। এইয়াতেই হবে নে।'

লালমোহনের খুঁৎখুতি যায় না। সে হাতে আয়নাখানা সত্যিই মেলে ধরল চম্পার সামনে, তার পর একটু ইতস্ততঃ ক'রে নিজেই বার দুই চম্পার উস্কু-খুস্কু চুলে চিরুণী বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'এইবার হইছে। হয় নাই?'

আয়নার মধ্যে নিজের সিঁদূর-পরা বধূ-বেশের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে চম্পা বলল, 'চলেন তাইলে এবার।'

লালমোহন বলল, 'আর একটা কথা, অমন চলেন-চলেন কইলে হবে না। তুমি-তুমি কইরা কবা। আমরা স্বামী-স্ত্রী। দুই জন দুই জনের ভারি আপন। সে কথা মনে রাইখো, বোঝলা?'

লালমোহন মুখ মুচকে একটু হাসল।

চম্পাও হাসল মুখ টিপে, 'বোঝলাম। চল এখন, হইল তো?'

এদিকে ট্রাঙ্কের ওপর নন্দ দাস ছটফট করছে। লালমোহনকে দেখে বলল, 'স্যুটকেস নিয়া গেলা তো গেলাই। আইজ কি যাওয়া টাওয়ার মতলব আছে তোমার, না কি?' কিন্তু পিছনে চম্পাকে দেখে অবাক হ'য়ে থেকে বলল, 'এ আবার কেডা?'

লালমোহন বলল, ‘আমার স্ত্রী।’

নন্দ বিস্মিত হ’য়ে বলল, ‘স্ত্রী!’

লালমোহন বলল, ‘হ, হ, পরিবার। আর তুমি হইলা সম্বন্ধী, বউর ভাই। আমাগো উঠাইয়া দিতে আইছ গাড়িতে। এই ন্যাও তোমার প্লাটফর্ম টিকিট। আর গাড়ির টিকিট তুমি তো আগেই করছ। ছাও দেখি টিকিট?’

নন্দ ইতস্ততঃ করছে, লালমোহন ধমক দিল, ‘আঃ, আবার ঘেড়িমেরি করে। বাড়ি যদি যাইতে চাও, যা কই তা কর।’

কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে নন্দ আর চম্পাকে সঙ্গে ক’রে লালমোহন ল্যাণ্ড কাস্টমের মেয়েদের বিভাগের লাইনে গিয়ে দাঁড়াল। খুব বেশি ভিড় নেই! সুন্দরপনা বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে মহিলা-যাত্রীদের বাক্স-পেঁটরা খুলে খুলে পরীক্ষা করছে। সোনার চুড়ির সঙ্গে বাঁ হাতে ছোট্ট একটু হাতঘড়ি। চোখে চশমা, মুখখানা মিষ্টি-মিষ্টি।

লালমোহন চম্পাকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, ‘যাও, আউগাইয়া যাও। কি কি মাল আছে তোমার, দেখাইয়া ছাও ওনারে।’

চম্পা একবার লালমোহনের দিকে পিছন ফিরে তাকাল, তার পর সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

মহিলা কাস্টম অফিসার তার দিকে একবার তাকালেন, তার পর মালগুলির দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন, ‘দু’খানা টিকেট আপনাদের, আর এত মাল? সব নিয়ে ক’টা? এই চারটে তো?’

চম্পা বলল, ‘আইজ্ঞা হ। এই চাইরডা।’

‘লুকিয়ে-টুকিয়ে বে-আইনি ভাবে কিছু নিয়ে যাচ্ছেন না তো?’

চম্পা একটু হাসল, ‘খুইলা দেখেন।’

মহিলা কাস্টম অফিসার সহজে ছাড়বার পাত্রী নন। বললেন, 'খুলে তো দেখতেই হবে। তালা খুলুন। চাবি কই?'

লালমোহন আর চম্পা দু'জনেরই বুকের মধ্যে দুরু-দুরু করছে। কি জানি কি হয়। খুব যদি ঘেঁটে-ঘেঁটে দেখে, তাহ'লে আর রক্ষা নেই।

লালমোহন পকেট থেকে চাবিটা বের ক'রে চম্পার হাতে দিয়ে বলল, 'ন্যাও, খোল এবার। তখনই বলছিলাম, এত বড় ট্রাঙ্ক আনার দরকার নাই। আবার তো আসতেই হবে। যেমন তুমি, তেমন তোমার মা।'

তার পর মহিলা কাস্টম অফিসারের দিকে তাকিয়ে লালমোহন কলকাতার ভাষায় বলল, 'একটা জিনিসও রেখে আসবে না, বুঝলেন? আর শাশুড়ী ঠাকরুণেরও বিবেচনা ব'লে যদি কিছু থাকে। যত রাজ্যের পুরোন কাঁথা, কাপড়, আচারের বৈয়ম দিয়ে ট্রাঙ্ক একেবারে বোঝাই ক'রে ছেড়েছেন, মেয়ে যেন আর কারো পোয়াতী হয় না।'

কেবল চম্পার নয়, মহিলা অফিসারটির মুখও আরক্ত হয়ে উঠল। বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। ছোট্ট রুমাল দিয়ে মুখের সেই ঘাম মুছলেন, না কি লজ্জিত হাসির আভাস গোপন করলেন, কে জানে!

লালমোহন বিরক্তির ভঙ্গিতে চম্পার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সরো, তুমি সরে এসো এদিকে। আমিই খুলে দিই। এই শরীর নিয়ে কি দরকার ছিল আসবার, না হয় বাপের বাড়িতে দু'টো দিন থাকতেই। এই শরীরে গাড়ি-ঘোড়ার ধকল কি সয়, বলুন তো? বাসা থেকে এই স্টেশন পর্যন্ত আসতেই মুখখানা কি রকম শুকিয়ে গেছে তাই দেখুন।'

মহিলা কাস্টম অফিসারের দিকে তাকিয়ে লালমোহন বলল, 'এর পর, সারা রাত গাড়ির কষ্ট তো পড়েই আছে।'

মহিলাটি বললেন, 'থাক, থাক, ওটা আর খুলতে হবে না আপনাকে। অন্যগুলি দেখি।'

তার পর স্যুটকেস দু'টোর ডালা সামান্য একটু উঁচু ক'রে দেখলেন, নরম আঙুল দিয়ে বিছানাটা টিপলেন একটু, তার পর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, যান এবার।'

যাত্রীদের স্রোত ঠেলে ঠেলে ছ' নম্বর প্লাটফর্মের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল তিন জনকে। চেকার টিকিটগুলি দেখল কি দেখলো না। ঘাড় নেড়ে ভিতরে যেতে অনুমতি দিল। কুলির মাথায় মোট। লালমোহনের হাতে সেই স্যুটকেস। নন্দর দিকে তাকিয়ে লালমোহন বলল, 'ঈস্, গাড়ি কি রকম বোঝাই হইছে দেখছ। ভিতরে এখন ঢোকতে পারলে হয়। কুলি নিয়া তুমি সামনে আউগাও। ইঞ্জিনের পিছনের গাড়িতে ভিড় একটু কম আছে না কি দেখ গিয়া। আমি এরে বিদায় কইরা আসি।'

উত্তরের দিকে আর একটা মালগাড়ি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লালমোহন সে দিকে যেতে যেতে বলল, 'আইস, পা চালাইয়া আইস এদিকে। ঈস্, সময় একেবারে মাইরা আইছি। গাড়িতে কি আর ওঠতে পারব। ন্যাও, তাড়াতাড়ি মালগাড়ির পিছনে যাইয়া শাড়িখানা ছাইড়া ভাঁজ কইরা আন। আর ভালো কথা, কত দিতে হবে তোমারে? কত চাও?'

ভারি ব্যস্ত লালমোহন, ভারি উদ্বিগ্ন। গাড়ি ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। এদিকে মাল রয়েছে এখনো কুলির মাথায়।

লালমোহন বলল, 'কত চাও, কইয়া ফ্যালো।'

চম্পা মুহূর্ত কাল চুপ ক'রে লালমোহনের মুখের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইল, তার পর বলল, 'তখন কইছিলেন, যা চাও, তাই দেব।'

'হ্। কইছিলাম, কত চাও তুমি? কি চাও?'

চম্পা বলল, 'কি আর চাব। আপনার মন যা চায়, তাই দেবেন।'

কি একটু ভাবল লালমোহন, তার পর পকেট থেকে গুণে গুণে সিকি-আনি-দু'আনিতে মিলিয়ে এক টাকার খুচরো চম্পার হাতে দিয়ে বলল, 'ন্যাও, একেবারে ষোল আনাই দিলাম পুরাইয়া। আর আপত্তি-টাপত্তি কইরো না। মাল নিয়া গাড়িতে এখন ওঠতে পারলে হয়।'

এ কথার কোন জবাব না দিয়ে রঙীন শাড়িখানা গাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে ছেড়ে ফেলল চম্পা, তার পর পরিপাটি ক'রে ভাঁজ ক'রে লালমোহনের হাতে এগিয়ে দিল।

লালমোহন প্লাটফর্ম টিকেটখানা চম্পার হাতে দিয়ে বলল, 'এইখানা দেখাইও গেটে। চেকার পথ ছাইড়া দেবে। আর গুইনা দেখছ? ষোল আনাই আছে?'

চম্পা আবার একটু তাকাল লালমোহনের মুখের দিকে, একটু যেন হাসল, বলল, 'হ্, ষোল আনাই আছে।'

লালমোহন আর দাঁড়াল না, মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল সামনের দিকে। ইঞ্জিনের পিছনের গাড়িতে জায়গা পেলেও পাওয়া যেতে পারে। নন্দ একটা উজবুক, অকর্মার ধাড়ি, ওর ওপর কোন কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবার জো নেই।

কিন্তু গিয়ে দেখল, কুলির সাহায্যে নন্দ মালগুলি ততক্ষণে সত্যিই তুলে ফেলেছে। অন্যান্য দিনের চাইতে গাড়িতে ভিড় আজ অনেক কম। গাড়িতে উঠে বসবারও একটু জায়গা ক'রে নিয়েছে নন্দ। লালমোহনকে দেখে ডেকে বলল, 'শীগ্গির উইঠা আইস। জায়গা রাখছি তোমার জইন্যে, কুলি কিন্তু দেড় টাকাই নিল।'

মালগুলির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নন্দর গায়ে গা ঘেঁষে কোন রকমে একটু বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল লালমোহন, তার পর পকেট থেকে দু'টো সিগারেট বের ক'রে একটা নন্দর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ধরাও, উঃ! আইজ যে আর আসতে পারব, এমন আর ভাবছিলাম না।'

গাড়ির শেষ ঘণ্টা পড়ল।

আশ্চর্য, সামনের বেঞ্চে চশমা-পরা প্রথম-দেখা সেই সুদর্শন যুবকটিও সিগারেট ধরিয়েছে। পাশে তার সুসজ্জিতা স্ত্রী।

লালমোহন বলল, 'কি দাদা, আপনিও এই গাড়িতে।'

অবনী হেসে বলল, 'আপনি আসতে পেরেছেন শেষ পর্যন্ত। কি ক'রে এলেন?'

লালমোহন রহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল, 'আইলাম। আপনারা তো আর আনলেন না। পথেই ফেলাইয়া আসলেন।'

অবনী লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না না। কিন্তু অত মালপত্র নিয়ে এই শেষ মুহূর্তে আপনি এসে পৌঁছলেন কি ক'রে? কার সঙ্গে এলেন?'

লালমোহন মৃদু হেসে বলল, 'কার সঙ্গে আবার? স্ত্রীর সঙ্গে।'

অবনী বিস্মিত হয়ে বলল, 'বলেন কি, স্ত্রীর সঙ্গে? স্ত্রী আছেন না কি আপনার?'

লালমোহন বলল, 'বাঃ, নাই তয়? দুনিয়ায় কি আপনেই কেবল বিয়ে করছেন দাদা? আর কেউ করে নাই?'

অবনীর স্ত্রী সুষমা এবার কৌতূহলী হয়ে স্মিত হাস্যে সামনের দিকে তাকাল। সুন্দর মুখ। আর কপালে সুগোল সুন্দর সেই সিঁদূরের ফোঁটা।

বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠল লালমোহনের, ঠিক এই রকমই

ফোঁটা ছিল চম্পার কপালে, ঠিক এমনিই চমৎকার মানিয়েছিল তাকে।

অবনী একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'আমি ঠিক তা বলছি নে। আপনার স্ত্রী বুঝি তাহলে—'

বাকিটুকু কি বলল অবনী, লালমোহন শুনল না—শুনতে চাইল না। চোখ ফিরিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। গাড়ি অল্প-অল্প নড়তে স্বরু করেছে। কিন্তু এমন সামান্য চলন্ত গাড়িতে ওঠা-নামার খুব অভ্যাস আছে লালমোহনের। ইচ্ছা করলে এখনও সে নেমে যেতে পারে। এখনও ছুটে গিয়ে হাত ধরতে পারে তার।

কিন্তু কার হাত ধরবে লালমোহন? এই ভিড়ের মধ্যে চম্পাকে ফের কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে? ফের কি চেনা যাবে তাকে? সেই সিঁদূরের ফোঁটা কি সে এখনও ধরে রেখেছে কপালে? অপমানে, অভিমানে সঙ্গে সঙ্গেই কি মুছে ফেলেনি? কিংবা সেই অভিমানের বশেই ওই একটু সিঁদূরের ফোঁটা সম্বল ক'রে এতক্ষণে চম্পা আর একজনের সঙ্গিনী সেজে তার মাল পাশ করাচ্ছে কি না, তা-ই বা কে জানে?

কয়লার কুচি বার বার চোখে লাগতে লাগল লালমোহনের।

গাড়ি সবেগে ছুটে চলেছে।

একপো দুধ

ব্যবস্থাটা লতিকাই করল প্রথমে। স্বামীর জন্যে এক পো দুধ রোজ ক'রে বসল। দেড়পো দুধ খুকীর জন্যে রাখতেই হয়। দেড় বছরের শিশুকে খালি সাগু বার্লি খাইয়ে তো আর রাখা যায় না, তার থেকেও দু'চার চামচ চায়ে ব্যয় হয়। সস্তা মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল সন্ধ্যায় দু'কাপ চা মাঝে মাঝে একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে বিনোদের। একদিন গোয়ালা দুধ দিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে সে বললো, 'এক চামচ দুধ-দিয়ে আজ চা কর দেখি।'

দুধ দেওয়ার বদলে লতিকা মুখ ঝামটা দিল,—'তোমার যেমন কথা! দুধ পাব কোথায়? কত যেন সেরে সেরে দুধ রাখা হয়! খুকীর জন্যে এই তো এক ফোঁটা দুধ, তাও যদি তোমার চায়ে দেই, তা হলে ও খায় কি?'

বিনোদ বলল, 'থাক্ থাক, আর চেঁচিয়ো না।'

দিন দুই চুপচাপ কাটল। লতিকা দেখলো স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডী সার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ-বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দু'গাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিনের দিন ভোর বেলায় হাতল ভাঙা চায়ের কাপটি ঠিক অন্যদিনের মতই স্বামীর সামনে এনে রাখল লতিকা। বিনোদ দেখে অবাক। চায়ের কাপে চা নয়, কানায় কানায় ভর্তি দুধ!

বিনোদ বলল, 'এ আবার কি! খুকীর দুধ দিলে না কি সবটুকু!'

লতিকা বলল, 'না না, তুমি খাও। খুকীর দুধ দেব কেন, তোমার জন্যে আলাদা ক'রে রেখেছি। যা ছিরি হয়েছে তোমার, সপ্তাহখানেক কি পনের দিন খেয়ে দেখ। চেহারাটা যদি একটু ফেরে।'

এবার আর সামনে এক কাপ দুধ দেখল না বিনোদ, দেখল দুধ-সাগর। স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম-সাগরের প্রতিরূপ। কবে যে সে ললিতাকে বিয়ে করেছিল, তা ভুলেই যেতে বসেছিল বিনোদ। আজ ফের মনে পড়ল। লতিকার চোয়াল-জাগা ফ্যাকাসে মুখ, বার বছর আগেকার কুঙ্কুম-চন্দনে সাজানো আর একটি মুখের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। বিবর্ণ কোটরগত দু'টি চোখ দেখে মনে পড়ল শুভদৃষ্টির সময়কার একটি ষোড়শী কমলাক্ষীকে।

বিনোদ বলল, 'কিন্তু খরচ বেশি পড়ে যাবে যে।'

লতিকা বলল, 'যায় যাবে। তুমি রোজগার কর, তোমার জন্যে সংসারের খরচ যদি একটু বাড়ে, বাড়লই বা।'

আর কিছু না ব'লে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

একটু দূরে দরজার কাছে মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্কুলের পড়া পড়ছে সুনীল। বিনোদের ন'বছরের ছেলে। ওর পরে আর খুকীর আগে আরো যে তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারা কেউ নেই; সুনীল পাড়ার হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে। অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওর হাফ্ ফ্রী-শিপ জোগাড় করেছে বিনোদ। বইপত্রও সব কিনে দিয়েছে।

ইংরেজী গ্রামার পড়তে পড়তে বাপের দুধ খাওয়ার দিকে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে, ফের গলা ছেড়ে আরো জোরে জোরে পড়তে লাগল, Lion—Lioness, Lion—Lioness, Fox—Vixen, Fox—Vixen.

বিনোদ একটু কাল ছেলের জেণ্ডার-পাঠ কান পেতে শুনল, তারপর বলল, 'তুই একটু খাবি নাকি দুধ, ও সুনীল।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'না, তুমি খাও। আমার দুধ লাগবে না। Fox—Vixen, Fox—Vixen.'

বিনোদের লজ্জা দেখে লতিকা বলল, 'তুমি খাও, ওকে আবার আর একদিন রেখে দেব। পরীক্ষার সময় আমার সোনার জন্যে রোজ দুধ রাখব।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমার জন্যে কারো দুধ রাখতে হবে না। আমি দুধ খাইনে। Dog—Bitch, Dog—Bitch.'

বিনোদ এবার কেন যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'ওই কয়েকটা কথা মুখস্থ করতে তোর কতক্ষণ লাগবে? কাল রাত্রেও তো ওই genderই পড়েছিস।'

বিনোদের ছোট ভাই বিজন ওঠে একটু দেরিতে। হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকল; 'কি বউদি, চা-টা হয়ে গেল নাকি তোমাদের?'

বি. এ. পাশ ক'রে বিজন বছর দুই যাবৎ বেকার রয়েছে। প্রথম প্রথম ভারি ছটফট করতো। এখন গা-সওয়া হয়ে গেছে। খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত ভাবই এসেছে আজকাল।

বিজনের কথার জবাবে লতিকা বলল, 'না ভাই, তোমাকে ফেলে কি চা আমরা খাই, যে আজ খাব?'

বিজন হেসে বলল, 'দাদা বুঝি তেষ্টার চোটে না থাকতে পেরে খালি কাপে চুমুক দিচ্ছে! দাদাকে এক কাপ চা ক'রে দিলেই পার।'

বিনোদ আর লতিকা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ,বিজন কি জেনে শুনে ব্যঙ্গ করছে! কিন্তু ও তো তেমন ছেলে নয়।

বিনোদ লজ্জিত হয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'চা নয় বিজু, দুধ খেলাম এক কাপ। তোর বউদি রেখে দিয়েছিল।'

বিজু লতিকার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল, 'ও তাই বল, চুরি ক'রে ক'রে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে?'

বিজন একটু ঠাট্টা-তামাসা ভালোবাসে। তবু অভাবের সংসার ব'লে ঠাট্টাটা বিনোদ আর লতিকার কানে যেন একটু কেমন শোনাল। দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল।

বিনোদ বলল, 'ওকে এককাপ দুধ কাল দিয়ো।'

লতিকা বলল, 'দেব।'

বিজন মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আচ্ছা, তোমাদের কি হয়েছে বউদি, তোমরা কি ঠাট্টা-তামাসাও বোঝ না আজকাল? দুধ কি আমি কোনদিন খাই, যে খাব? দুধ তোমাদের কাছে কে চাইছে শুনি? চা দেবে তো দাও।'

একটু বাদে কেটলি থেকে দু'টি কাপে যখন চা ঢালতে যাচ্ছিল লতিকা, বিজন হঠাৎ বলল, 'দুধের কাপটা ভালো ক'রে ধুয়ে দাও বউদি। চায়ের কাপে দুধের গন্ধ আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে।'

লতিকা কোন কথা না ব'লে দেওরের দিকে একটু তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ধুয়েই দিয়েছি ঠাকুরপো। তোমার দাদার এঁটো কাপ তোমাকে দেইনি।'

পরের দিন লতিকা একটু আড়ালে এনে দুধের কাপটি দিল স্বামীকে।

বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

ঘরের মধ্যে সুনীল আজ আর ইংরেজী গ্রামার পড়ছে না। স্বাস্থ্যপাঠ মুখস্থ করছে, 'দুগ্ধ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।' কে জানে ইচ্ছা ক'রেই এই কথাটা পড়ছে কিনা। বিজন আজ আর বিনোদের ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। বিনোদ যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে, কে জানে ইচ্ছা ক'রেই সেইজন্যে সে দাদার সামনে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিনা। এমন আস্তে আস্তে দুধের কাপটি শেষ করলো বিনোদ, যেন চুমুকের শব্দ কারো কানে না যায়।

মাত্র দিনকয়েক এই সংকোচটুকু রইল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত লজ্জা সংকোচ ভেঙে গেল বিনোদের। এখন সে ছেলে, ভাই, স্ত্রী, সকলের সামনেই দুধ খায়। দিতে একটু দেরী হ'লে জোর গলায় হাঁক দেয়, 'কই গো, দিয়ে যাও আমার দুধ, আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে।'

লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আনছি গো আনছি। দুধ না হয় ঘুরে এসেই খেতে, তোমার দুধ তো আর কেউ নিয়ে যাবে না!'

পটলডাঙা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময় কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পরিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি ক'রে স্যাণ্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন চার হাজারের বেশী দিতে পারে না।

কিন্তু বিনোদ দাস বাইরে যতই অকিঞ্চন হোক, ইণ্টালীর এই অনরেট সেকেণ্ড লেনের ৭।৩।২-এর একতলা বাড়ির কোণের দিকের

ঘরখানায় সে সম্রাট। সংসারের সর্বময় কর্তা। এই সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে, আর এক কাপ দুধে তার অধিকার নেই! নিজের রোজগারের পয়সায় সে নিজে দুধ খাবে, তাতে অত লজ্জা কিসের?

বিনোদ দুধ খেতে লাগল।

দু' সপ্তাহ কাটল, তিন সপ্তাহ কাটল, লতিকা ভাবল বিনোদ বুঝি এবার নিজেই না করবে,—বলবে, 'আর দিয়ো না দুধ, এবার বন্ধ ক'রে দাও।'

কিন্তু বিনোদের যেন সেদিকে মোটে খেয়ালই নেই।

এক মাস বাদে গয়লা সাড়ে সাত টাকা বেশি বিল করল দুধের। লতিকা তো ভাবনায় অস্থির—কোন্ দিক থেকে ক' টাকা কেটে এই সাড়ে সাত টাকা পুরিয়ে দেবে। গোয়ালাকে দু'তিন দিন বাদে টাকা নিতে আসবার অনুরোধ ক'রে লতিকা বলল, 'এক পো ক'রে যে বেশি দুধ নিয়েছি, এ মাস থেকে তা আর দিতে হবে না। তুমি আগের দেড় পো ক'রেই দিও।'

ঘরের মধ্যে প্রুফ দেখছিল বিনোদ, এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বেরিয়ে এসে নিজেই বলল, 'না হে, এ মাসও এক পো ক'রে বেশিই দাও, দুধটা বেশ ভালোই তোমার। শরীরটা যেন একটু শুধরেছে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখি আর এক মাস খেয়ে।'

গোয়ালা চলে গেলে লতিকা বলল, 'আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি যে দুধের খরচ এমাসেও বাড়িয়ে দিলে, টাকা দেব কোত্থেকে?' বিনোদ ভারি অপমানিত বোধ ক'রে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, 'টাকা কি তুমি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ? টাকা যে দেয়, সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্যে খেটে মরছি আর এক ফোঁটা দুধ জুটবে না আমার কপালে?'

লতিকা বলল, 'জুটবে না কেন। এক পো কেন, আমি বলি এক সের ক'রে দুধ রাখ তুমি। সত্তর পঁচাত্তর টাকা তো সব দিয়ে রোজগার কর, তা নিজেই তুমি খাও,—দুধ খাও, ঘি খাও, মাংস খাও, পোলাও খাও, সংসারের আর মানুষের দিকে তোমার চেয়ে দরকার কি।'

বিনোদ চটে গিয়ে বলল, 'খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি প'রব, তাতে তোর কি।'

সকালবেলায় দুধের কাপটি ফিরিয়ে দিল বিনোদ। কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময় যখন বাটিতে ক'রে ফের খানিকটা গরম দুধ স্বামীর সামনে ধ'রে দিল লতিকা, বিনোদ আর ফিরিয়ে দিতে পারল না। সারাদিনভর আজ তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল, কি যেন খায়নি, কি যেন পায়নি, কি যেন বাদ গেছে জীবন থেকে। সারাদিনের খাটুনির শেষে অনেক বঞ্চনা, অনেক আশা-ভঙ্গের পর রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে বাজে আটার শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে শেষে যখন ছোট একটু বাটিতে সাদা তরল পানীয়টুকু দেখতে পেল বিনোদ, ওর মন ব'লে উঠল,—এই সেই হারানো বস্তু, এই সেই পরম বস্তু।

বাটিটুকু ছোট হ'লে কি হবে, আজকের দুধটুকু বেশ ঘন-আঁওটা, ওপরে একটু সরও পড়েছে। সরটুকু চেখে চেখে খেল বিনোদ। তারপর বলল, 'আরো দু'খানা রুটি দাও তো ছিঁড়ে, দুধের সঙ্গে খাই। পেটটা যেন কিছুতেই ভরছিল না। কাল থেকে দুধটা রাত্রেই দিয়ো।'

লতিকা হাসি চেপে বলল, 'তাই দেব।'

কিন্তু আশ্চর্য, পরদিন রাত্রে বিনোদ দেখে পাতের ওপর শুধু রুটির রাশই রয়েছে, পাতের কাছে দুধের বাটি নেই।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'দুধ কি হ'ল?'

লতিকা বলল, 'সুনীলকে দিয়েছি। আজ তো এক-বেলার জন্যেও আর মাছ আসেনি। খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল। রোজ দুধ চায়, আজ দিলাম ও'কে।' বিনোদ গম্ভীর ভাবে বলল—'বেশ করেছ'।

দিনকয়েক বাদে ফের একদিন বিনোদের পাতের কাছে দুধের বাটির অভাব হ'ল। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই লতিকা বলল, 'আজ কিন্তু তোমার দুধটুকু ঠাকুরপোকে দিয়েছি। চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিল। ফিরে এল দুপুরের পর। খেতে ব'সে ভাত আর পারেনা খেতে। রোজই তো ওই চিংড়ির কুচো আর পুঁই চচ্চড়ি। একটু আমসত্ত্ব ভিজিয়ে আজ দিলাম ওকে ওই দুধটুকু। বললে বিশ্বাস যাবে না, তাই দিয়ে ঠাকুরপো আধ থালা ভাত খেয়ে উঠল।'

বিনোদ বলল, 'বেশ করেছো, কিন্তু চাকরির কথা কি বলল। অত যে সুপারিশ চিঠি ফিটি জোগাড় ক'রে পাঠালাম, কি হ'ল তার?'

লতিকা বলল, 'হয়নি। ব'লে দিয়েছে খালি নেই।'

বিনোদ বলে উঠল, 'ওর জন্যে খালি আর হবেও না, দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবে না ব'লে দিলাম।' বেশির ভাগ রুটি-তরকারি ফেলে রেখে বিনোদ উঠে দাঁড়াল। পরদিন থেকে ফের দুধ পেতে লাগল বিনোদ। মাঝখানে আবার দু'একদিন বাদ গেল।

লতিকা বলল, 'ভারি দুষ্টু হয়েছে সুনীল, ভারি ছোচা হয়েছে আজকাল। টিফিন থেকে এসে রান্নাঘরে ঢুকে কড়ার মধ্যে কাপ ডুবিয়ে দুধ চুরি ক'রে খায়। ওকে নিয়ে আর পারা গেলনা।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ।'

লতিকা বলল, 'আমি ক'দিন ধরেই দেখছিলাম। আজ কড়া

শাসন ক'রে দিয়েছি। আস্ত একখানা চেলাকাট ভেঙেছি পিঠে। যদি প্রাণের ভয় থাকে, জীবনে আর দুধের কড়ার কাছে যাবে না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ, ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভালো না।'

আরও কাটল দিন কয়েক। তারপর ফের একদিন পাতের কাছে দুধের বাটি দেখতে না পেয়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'আজও কি সুনীল দুধ চুরি ক'রে খেয়েছে নাকি? ওর সাহস তো কম নয়, অত মার খাওয়ার পরেও—'

লতিকা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'না, আজ আর ও চুরি করেনি। পাশের বাড়ির সাদা বেড়ালটা এসে দুধ খেয়ে গেছে।'

বিনোদ রাগ ক'রে উঠল, 'পাশের বাড়ির বেড়ালে এসে দুধ খেয়ে গেল, আর তুমি হাসছ! এত দামী দুধ। ঢেকে-ঢেকে সাবধান ক'রে রাখতে পার না! চার আনা ক'রে এক পো দুধ। সোজা কথা! গেল তো কতগুলি পরের বাড়ির বেড়ালের পেটে! পয়সা তো আর নিজে কামাই কর না। কি বুঝবে তার মর্ম!'

লতিকা বলল, 'নিজে কামাই না করলেও বুঝি। ভয় নেই। সত্যিই আর পরের বেড়ালে কড়া থেকে দুধ খেয়ে যায় নি। আমি অত অসাবধান না। তোমার নিজের বেড়ালেই খেয়েছে দুধ। হ'ল তো!'

লতিকা ফের একটু হাসল।

বিনোদ এবারও ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে বলল, 'রাত দুপুরে কি যে মস্করা কর, ভালো লাগে না। কি হয়েছে খুলেই বল না বিষয়টা।'

লতিকা এবার বিষয়টা খুলেই বলল। ক'দিন ধ'রেই তার অম্বলের দোষটা বেড়েছে। যা খায় তাই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। টক টক ঢেঁকুর ওঠে, সারা দিন অস্থির-অস্থির লাগে। আজ দুপুরের পর একেবারে বমিই হয়ে গেল, যা খেয়েছিল, কিছুই রইল না পেটে।

বিকেল বেলায় খিদেয় আর বাঁচে না। কি খায়, কি খায়। অথচ যা মুখে দেবে তাতেই অম্বল হবে। অবস্থা দেখে দোতলার মুখুয্যেদের মাসীমা বললেন, 'এক কাজ কর বউমা, ঘরে তো তোমাদের দুধ আছে। তার মধ্যে এক মুঠ খই ভিজিয়ে খাও। তাতে অম্বল হবে না। দেহটাও ভালো থাকবে।'

লতিকা তাঁর পরামর্শই নিল। তাই কি সুস্থভাবে খাওয়ার জো আছে। স্কুল থেকে সুনীল এসে হাজির। 'মা, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কি খাচ্ছ?'

'মধু খাচ্ছি, নে।'

তার হাতেও দিতে হ'ল এক দলা।

খাওয়া শেষ ক'রে থালার ওপর সশব্দে গ্লাসটা তুলে রেখে বিনোদ বলল, 'তা খেয়েছ খেয়েছ, তার অত ভণিতার কি ছিল! বেড়াল, অম্বল, কত কি। বললেই পারতে দুধ খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তাই খেয়েছি।'

লতিকা ভেবেছিল তার দুধ খাওয়ার কথা শুনে স্বামী একটু হাসবে, হয়ত একটু ঠাট্টা পরিহাস করবে। কিন্তু স্বামীর মুখ দেখে, মূর্তি দেখে সে প্রথমে খানিকটা অবাক হ'য়ে থেকে অতিমাত্রায় সবাক হ'য়ে উঠল। 'তোমার ধারণা আমি সাধ ক'রে খেয়েছি, ইচ্ছা ক'রে খেয়েছি।'

বিনোদ বলল, 'না, ইচ্ছা ক'রে খাবে কেন। পাড়ার আর কেউ এসে তোমার গলায় ঢেলে দিয়ে গেছে।'

লতিকা বলল, 'খেয়েছি তো বেশ করেছি। তুমি তিরিশ দিন খেতে পার, আর আমি একদিনও পারিনে।'

বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে কথা। আমি যে একটু ক'রে দুধ খাই,

তা তোমার প্রাণে সয় না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পার না। সেই হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মর।'

লতিকা বলল, 'তোমার দুধ খাওয়া দেখে আমি জ্বলেপুড়ে মরি! মরি তো বেশ করি। বুড়ো বেটা তুমি, লজ্জা করে না রোজ রোজ সকলের সামনে দুধ খেতে! একদিন দুধ কম পড়লে তাই নিয়ে বাড়ী মাথায় করতে!'

এঁটো হাতেই বিনোদ রুখে এল, 'লজ্জা করবে কেনরে হারামজাদী, আমি কি তোর বাপের পয়সায় দুধ খাই, নিজের পয়সায় খাই—নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের করা উচিত।'

পাশের ঘর থেকে বিজন এল বেরিয়ে, 'কি, হয়েছে কি? রাত দুপুরে কি স্বরু করেছ তোমরা? কি নিয়ে ঝগড়া?'

লতিকা বলল, 'ঝগড়া কি নিয়ে শুনবে! ক্ষিদেয় না থাকতে পেরে আমি আজ দুধটুকু খেয়ে ফেলেছি।'

বিজন বলল, 'ছি ছি ছি, তোমরা হ'লে কি বউদি!'

গোলমালে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় স্নুনীলও উঠে দাঁড়াল। একটু কান পেতে সকলের কথাবার্তা শুনেই সমস্ত ব্যাপারটা সে বুঝতে পারল। আস্তে আস্তে গিয়ে বিজনের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ফিস ফিস ক'রে বলল, 'জানো কাকু, সেদিন একটু দুধ খেয়েছিলাম ব'লে আমাকে কি মারটাই না মারলে। আজ নিজে চুরি ক'রে খেয়েছে, আজ নিজে মার খাচ্ছে। বুঝুক মজা।'

বিজন বলল, 'ছিঃ, ওকথা বলে না কাকু। যাও তুমি ঘুমোও গিয়ে।'

স্নুনীল খানিক বাদেই ঘুমোল বটে, কিন্তু বিনোদ আর লতিকা সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজল না। এক ফোঁটা দুধের জন্যে এত কেলেঙ্কারী

ছিল ভাগ্যে! লতিকা বার বার নানা সুরে নানা স্বরগ্রামে এই কথাই বলতে লাগল। সংসারে এসে কোন্ সাধটা তার মিটেছে, শাড়ি গয়নার কোন্ সুখটা করেছে। সুখ তো ভালো—সারাদিন যদি সে না খেয়েও থাকে, কেউ আহা বলবার নেই, কেউ জিজ্ঞেস করবার নেই। লতিকা সারা রাত ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল আর বিলাপ করতে লাগল। বিনোদ বারকয়েক বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'আঃ, জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে, রাত্রে কি একটু আমাকে ঘুমুতেও দেবে না? কাল তো ভোরে উঠে আমাকে ফের কাজে বেরোতে হবে।'

ধমক খেয়ে লতিকার কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল।

বিনোদ এবার স্ত্রীকে একটু কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করল, বলল, 'সামান্য দুধের জন্যে—'

লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলে। আমি তো মরে গেলেও আর দুধ কোন দিন মুখে দেব না।' অনেক সাধ্য সাধনায় স্ত্রীকে শান্ত করল বিনোদ। শেষ রাত্রে দেখা গেল কোলের মেয়েকে বাঁ দিকে সরিয়ে রেখে লতিকা বিনোদের কোলের কাছে এসে ঘুমিয়েছে।

পরদিন ভোরে গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল। লতিকা তাড়াতাড়ি জ্বাল দিয়ে নিয়ে এল দুধ। কাপে ঢেলে বিনোদের সামনে এগিয়ে দিল। বিনোদ বলল, 'এ আবার কি!'

লতিকা বলল, 'এখনই খাও, সারাদিনভর এ দুধ আমি রাখতে পারব না। কে কখন এসে মুখ দেবে তার ঠিক কি।'

বিনোদ আর কিছু না ব'লে বাঁ হাতখানা আলগোছে স্ত্রীর পিঠের ওপর রেখে, মৃদু হেসে দুধের কাপটি তার মুখের সামনে তুলে ধরল।

লতিকা হেসে বলল, 'হয়েছে, থাক।'

'কি বউদি, চায়ের কদ্দূর।'

ব'লে বিজন ঘরে ঢুকেই থমকে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছিল, লতিকা ত্বধের কাপ হাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'পালাচ্ছ কেন ঠাকুরপো, নাও, ত্বধটুকু খাও তুমি আজ। আহা কি চেহারাখানাই করেছ। নাও ত্বধটুকু।'

বিজন বলল, 'তোমার চেহারাখানাই বা এমন কোন বীরাঙ্গনার। তুমিই খাও বউদি।'

লতিকা বলল, 'তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে, ঠাকুরপো।'

বিজন আর কোন কথা না ব'লে, ত্বধের কাপটি হাতে নিল।

পূবদিকের বারান্দায় স্থনীল মাত্বর বিছিয়ে বইপত্র নিয়ে বসেছে। আর আড়চোখে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। দেখছে বাবা মা কাকার অদ্ভুত কাণ্ড। স্থনীল একা নয়। তার কাছে এসে বসেছে পাশের বস্তীর ফটিক। সে তাদের ক্লাসেই পড়ে। কিন্তু স্থনীলদের চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। সব বই কিনে পড়তে পারে না। শুধু যে নোটবইগুলিই তার নেই তা নয়, মূল ইংরেজী বইখানা পুরোন কিনেছিল ব'লে, একটা গল্পের খানতিনেক পাতাই তার মধ্যে নেই, বোধ হয় আগের মালিক নকল করবার জন্যে ছিঁড়ে নিয়েছিল। ফটিক পেনসিল দিয়ে নিজের খাতায় গল্পের সেই ছিঁড়ে-যাওয়া অংশটা লিখে নিচ্ছিল।

বিজন বারান্দায় নেমে স্থনীলকে হাতের ইসারায় কাছে ডেকে নিল। তারপর ত্বধের কাপটি তার সামনে ধ'রে বলল, 'নে স্থনীল।'

স্থনীল বলল, 'তুমি খাও কাকা, তুমি তো কোন দিন খাও না।'

বিজন বলল, 'আরে তুই খা। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

স্থনীল আর কোন কথা না ব'লে কাপটি নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। ফটিক মাথা নিচু ক'রে পড়া টুকছে। কালো রোগা চেহারা।

কির-কির করছে হাড়গুলো। পিঠের দুটো হাড় গরুড় পাখীর দুই ডানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে। দেখে দেখে সুনীল বলল, 'এই ফটিক, শোন। লেখা পরে টুকিস, দুধের কাপটা ধরতো।'

ফটিক মুখ তুলে লজ্জিত ভাবে বলল, 'না ভাই, তুই খা।'

সুনীল বলল, 'আরে দূর পাগল। আমি তো রোজই খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

ক্রোড়পত্র

'সুচরিতাসু,

পত্রবাহক আমার একজন বন্ধু। একটি দুঃস্থা আত্মীয়াকে নিয়ে ইনি সম্প্রতি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছেন। মেয়েটি বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই বিধবা হয়েছে। পিতৃকুলে কি শ্বশুরকুলে দেখাশোনা করবার মত নিকট-সম্পর্কীয় কেউ নেই। সামান্য লেখাপড়া জানে। কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আরো একটু পড়াশুনো কি হাতের কাজটাজ কিছু শিখে মেয়েটি যাতে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তার অভিভাবকেরা সেই চেষ্টাই করছেন। তোমাদের সমিতি থেকে যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারো আমি ব্যক্তিগত উপকার বোধ করব।'

এই পর্যন্ত লিখে অসিতবাবু চিঠিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিলেন, 'দেখুন তো হ'ল কিনা।'

চিঠিখানার ওপর আমি আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। অফিসের প্যাডের কাগজে লেখা চিঠি। ওপরে বড় বড় ইংরেজী হরফে অসিতবাবুদের নাতিখ্যাত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর নাম-ঠিকানা মুদ্রিত। তার নিচে ছোট ছোট জড়ানো অক্ষরে এই সুপারিশ চিঠি সুরু হয়ে নিতান্ত মামুলী ভঙ্গীতে শেষ হয়েছে।

প্যাডশুদ্ধ চিঠিখানা ফের ঠেলে দিলাম অসিতবাবুর দিকে।

বললুম, 'হ'ল কি না হ'ল তা আপনিই সব চেয়ে ভালো জানেন অসিতবাবু।'

মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিলাম। কথার সুরে সেই ক্ষোভ গোপন রাখতে চেষ্টা করলাম না। অসিতবাবুর সঙ্গে আমার আজ বছর তিনচার ধ'রে জানাশোনা। এক টেবিলে মুখোমুখি বসে কাজ করেছি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য ও রাজনীতি থেকে সুরু ক'রে পারিবারিক এবং দাম্পত্য সুখদুঃখের গল্প করেছি। বছর খানেক আগে এই কোম্পানীর সেক্রেটারীর পদ নিয়ে অসিতবাবু চলে এসেছেন। আমি আছি সেই পুরোন অফিসের নিচের সিঁড়িতে। কিন্তু তাই ব'লে আমাদের দুজনের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ আলোচনায় হৃদ্যতার কোন তারতম্য ঘটেনি। তাই, সুপারিশ চিঠিখানা অসিতবাবু একটু ভালো ক'রে ধ'রে লিখবেন এই আশাই করেছিলাম। কেননা, চিঠির কথা সেদিন তিনিই উপযাচক হয়ে বলেছিলেন আমাকে। অফিস-ফেরৎ ট্রামে পাশাপাশি বসে আগের মতই পুত্রকলত্র ঘরসংসারের আলোচনা করছিলাম দু'জনে। কথায় কথায় আমার মাসতুতো বোন উমার কথাও উঠে পড়ল। তার দুর্ভাগ্য আর আমার দুর্ভাবনার কথা সব শুনে অসিতবাবু বললেন, 'আজকাল তো মেয়েদের জন্যে কত সব ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান হয়েছে, দিন না তার কোনটিতে ভর্তি ক'রে। লেখাপড়া কাজকর্ম শিখে স্বাবলম্বী হতে পারবে।, আপত্তি না থাকলে যোগ্য ছেলেটেলে দেখে ফের বিয়ে দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে কোন কোন জায়গায়।'

বললুম, 'আছে নাকি জানাশোনা তেমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান?'

অসিতবাবু মৃদু একটু হেসেছিলেন, 'একেবারে কি আর না আছে? তা'হলে দয়া ক'রে বেড়াতে বেড়াতে আসুন না একদিন আমাদের অফিসে। একখানা চিঠি লিখে দেব।'

প্রায় আধঘণ্টা আমাকে বসিয়ে রেখে, কলমটা একবার খুলে আর একবার বন্ধ ক'রে, দ্বিতীয়বার খুলে মনে মনে কিছুক্ষণ ধ'রে খানিক কি মুসাবিদা ক'রে অসিতবাবু শেষ পর্যন্ত লিখে দিলেন—আর একটু যত্ন ক'রে আর একটু আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখিয়ে চিঠিখানা লিখলে কি ক্ষতি ছিল অসিতবাবুর ?

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছিলেন অসিতবাবু, হঠাৎ বললেন, 'অমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে! আপনার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে চিঠি দেখে আপনি খুশী হন নি।'

বললুম, 'আমার খুশী হওয়া না-হওয়া নিয়ে তো কথা নয়। আপনি লিখে খুশী হ'লেই হ'ল। আমার কাজ নিয়ে কথা। তবে হ্যাঁ, কলমের রাশটা একটু কড়া ক'রেই টেনেছেন ব'লে মনে হচ্ছে।'

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, বললেন, 'তাই নাকি ? তা হবে। কলমের রাশ কি ইচ্ছা করলেই সব সময় ছাড়া যায় মশাই, না, ছাড়বার জো থাকে ?'

বললুম, 'তার মানে ?'

অসিতবাবু বললেন, 'ওই দেখুন, অমনি বুঝি কানে লেগেছে কথাটা! না কল্যাণবাবু, বড্ড প্রফেশনাল চোখ কান আপনাদের, কোন কথা ব'লে সারবার জো নেই। আপনারা চট্ ক'রে মানের দিকে মন দেবেন। মানে আবার কি, মানে নেই কিছু। আসুন, বরং আর একটু চা খাওয়া যাক।'

কাঠের পার্টিসন-ঘেরা ছোট্ট কামরাটুকুর মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। অসিতবাবু হাত বাড়িয়ে স্যুইচ টিপে আলো জ্বাললেন, বেল টিপে ডাকলেন বেয়ারাকে, বললেন, 'দু' কাপ চা।'

তারপর চিঠিশুদ্ধ প্যাডটা টেনে নিলেন অসিতবাবু। আর একবার সম্পূর্ণ চিঠিখানা পড়ে নিজের পুরো নামটা সই ক'রে দিলেন। ড্রয়ার

থেকে অফিসেরই নামাঙ্কিত একখানা লেফাফা টেনে বের ক'রে তার মধ্যে ভরলেন চিঠিখানা। খামের ওপর ঠিকানা লিখতে যাবেন, এই সময় চা এসে পৌছল। অসিতবাবু একটু কি ইতস্ততঃ করলেন, তারপর খামটা সরিয়ে রেখে নিচু হয়ে চুমুক দিলেন কাপে, পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের ক'রে দেশলাইর কাঠি জেলে একটা সিগারেট ধরালেন, তারপর মৃদু একটু হেসে বললেন, 'আপনার জন্য চিঠি লিখতে লিখতে একটা গল্পের কথা মনে পড়ছিল।'

বললুম, 'গল্প!'

অসিতবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, গল্প ছাড়া আর কি। সুপারিশ চিঠি লিখে তো আপনাকে খুশী করতে পারিনি, ফাউ হিসাবে একটা গল্পের প্লট দিয়ে যদি পারি। শুনবেন? সময় আছে হাতে?'

বললুম, 'নিশ্চয়ই। গল্প শুনবার মত সময়ের আমার কখনো অভাব হয় না।'

মনে মনে কিন্তু একটু বিস্মিতই হলাম। দেখতে অমন ছিপছিপে হ'লে কি হয়, অসিতবাবু ভারি রাশভারি মানুষ। বয়স বছর বত্রিশ-তেত্রিশ। মুখ দেখলে হঠাৎ আরো কম ব'লে মনে হয়। চেহারায় সৌন্দর্যের চেয়ে কমনীয়তা বেশি। কিন্তু আকৃতির সঙ্গে অসিতবাবুর প্রকৃতির যেন তেমন মিল নেই। এতদিন যে পরিচয় পেয়েছি তাতে তাঁকে গম্ভীর স্বল্পভাষী ব'লেই জেনেছি। এমন ভূমিকা ফেঁদে গল্পের প্লট শোনাবার আগ্রহ তিনি কোন দিনই প্রকাশ করেন নি। তাই গল্পের চাইতে গল্পকার সম্বন্ধেই বেশি কৌতূহল বোধ ক'রে আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে থাকলেও আমাকে যে দেখছিলেন না তা তাঁর দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলুম। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে সিগারেট

টেনে চললেন—তারপর হঠাৎ সুরু করলেন, 'আজকের কথা নয়। আজ থেকে এগারো বছর আগেকার কথা। মফঃস্বল সহরের কলেজে একটি ছেলে তখন বি. এ. পড়ত। নাম ধরুন তার অরুণ। ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভালো ছিল না। বাপ ছিলেন গাঁয়ের যজমানী ব্রাহ্মণ। চার পয়সা, দু' আনা দক্ষিণা কুড়িয়ে আর গামছায় সিধে বেঁধে ঘরে ফিরতেন। স্ত্রী আর ছেলেমেয়েতে ঘর যেমন পরিপূর্ণ ছিল, বলা বাহুল্য ভাঁড়ার তেমন ছিল না। প্রিনসিপ্যাল ভাইস-প্রিনসিপ্যালকে ধরাধরি ক'রে কলেজে হাফ ফ্রী-শিপ পেয়েছিল অরুণ। দু' জায়গায় দু'টি ছেলে পড়িয়ে ব্যবস্থা করেছিল হোটেল-খরচের। কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে উঠতে না উঠতে দু'টি টুইশানই হাত ছাড়া হয়ে গেল অরুণের। দু'টি ছাত্রের বাবাই ছিলেন সরকারী চাকুরে। একজন স্টেসন মাস্টার আর একজন পোস্ট মাস্টার। ভাগ্যক্রমে দু'জনই গেলেন বদলী হয়ে। দুর্ভাবনায় অরুণের প্রায় মাথায় হাত উঠবার জো হ'ল। এই সময় তাকে বাঁচাল এসে সহপাঠী বিভাস। ছেলেটির সঙ্গে অরুণের সামান্যই পরিচয় ছিল। মেলামেশা প্রায় ছিলই না। কারণ, বিভাসের যা খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল তা কলেজের মাঠে, পাঠে নয়। আর অরুণ ছিল একটু পড়ুয়া ধরনের ছেলে। দু'জনেই দু'জনকে আড়চোখে দেখত, সামনা-সামনি পড়লে বড় জোর একটু ঘাড় নাড়ত, আলাপটা তার বেশি আর এগুতো না।

কিন্তু বিভাস নিজেই যেচে এসে আলাপ করল অরুণের সঙ্গে। প্রায় বিনা ভূমিকায় বলল, 'শুনলাম, আপনার নাকি দু'টো টুইশানই গেছে?'

অরুণ একটু অবাক হোল, একটু বা অপমানিত। তার টুইশান থাক আর যাক, এই আধাপরিচিত বিজাতীয়প্রায় ছেলেটি কেন সে সম্বন্ধে খোঁজ নিতে আসবে?

অরুণ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, আমার দু'টো টুইশানই ছিল এখবরও আপনি তাহ'লে শুনেছিলেন?'

বিভাস হেসে বলল, 'তা শুনেছিলাম বই কি। প্রফেসারদের রাবিশ লেকচারগুলি ছাড়া আর সবই আমাদের কানে যায়। চোখ কান আপনাদের তুলনায় আমাদের অনেক বেশি খোলা। আপনারা আমাদের দেখতে না পারলে কি হয়, আমরা সব দেখি, সব শুনি। বকাটে ছেলে ব'লে আপনারা আমাদের ঘৃণা করেন। অবশ্য ভালো ছেলে ব'লে আপনারাও যে আমাদের কাছে শ্রদ্ধা পান তা নয়, কিন্তু স্নেহ আমরা আপনাদের করি। শত হলেও আপনারা কলেজের গর্ব।'

তারপর সেই স্নেহের বাস্তব প্রমাণ দেবার জন্যই যেন বিভাস হঠাৎ প্রস্তাবটা ক'রে বসল, 'একটা কাজ আছে আমার খোঁজে। করবেন? হাজিরা অবশ্য দু' বেলাই দিতে হবে। তবে থাকতে হবে সব মিলে ঘণ্টাখানেক কি ঘণ্টা দেড়েকে। মাইনে মাস অন্তে পঁচিশ টাকা।'

অরুণের কাছে পঁচিশ টাকা তখন ঐশ্বর্য। হোটেল-খরচ, হাত-খরচ, কলেজের মাইনে—পঁচিশ টাকায় সব হবে। আত্মমর্যাদায় বেশ একটু চিড় খেল অরুণের। তবু যথাসাধ্য গম্ভীর এবং নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অরুণ জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কোন্ ক্লাসের ক'জন ছেলেকে পড়াতে হবে?' বিভাস হেসে বলল, 'ক'জন নয়, একজনই। ছেলে অবশ্য প্রায় ডজন খানেক আছে ও বাড়িতে। কিন্তু ছেলে আপনাকে পড়াতে হবে না। কাজটা পড়ানো নয়, শুনানো। এখানকার ভবেশ চাটুয্যের নাম শুনেছেন তো? তিনি আমার মেসোমশাই, তাঁকে সকালে বিকেলে খানিকক্ষণ ক'রে বই আর খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হবে। বছর পাঁচ ছয় হ'ল মেসোমশাই অন্ধ হয়ে গেছেন। রাজী থাকেন তো বলুন।'

অরুণ একটু ইতস্ততঃ করতে লাগল। সে যখন স্কুলে পড়ে তখন

থেকেই ছেলে পড়াতে স্থরু করেছে। যে সব বাড়িতে রেসিডেন্সিয়াল টুইশান করেছে, কেবল ছেলে পড়িয়ে কর্তব্য শেষ হয় নি, গৃহস্থের হাট-বাজার করতে হয়েছে, ছাত্রের ছোট ছোট ভাইবোনকে রাখতে হয়েছে কখনো কখনো। নইলে স্কুলকলেজের ভাত নামেনি। তবু শত হ'লেও সে সব ছিল টুইশান। কাজটা শিক্ষাদানের, পদটা গুরুর। কিন্তু অন্ধ মনিবকে বই পড়ে শোনানোটা একটু যেন বেশিরকম চাকরীগন্ধী ব'লে মনে হ'ল অরুণের কাছে। টুইশানি ক'রে পড়াটা রেওয়াজ আছে ছাত্রমহলে, কিন্তু চাকরী ক'রে পড়ার মধ্যে কেমন যেন একটু মর্যাদা হারাবার ভয় আছে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে চট্ ক'রে বলা যায় না।

বিভাস বলল, 'দেখুন ভেবে। যদি রাজি থাকেন, কালই কিন্তু বলবেন আমাকে। হ্যাঁ, আর একটা কথা আছে, আপনাকে আগে থেকেই ব'লে রাখা দরকার। কেবল বিষয়-সম্পত্তি, যশ-প্রতিপত্তির দিকে থেকেই নয়, মুখে আর মেজাজেও আমার মেসোমশাই খুব নামকরা লোক। কেউ ওঁর কাছে খুব বেশি দিন টি঳কে থাকতে পারে নি। এখন আপনার কপাল, আর আমার হাতযশ।'

এত সব শুনেও পরদিন অরুণ সেই পাঠকগিরি গ্রহণ করতে সম্মত হ'ল, কাজটা একটু চাকুরীগন্ধী বটে কিন্তু খানিকটা নতুন ধরনেরও। ছাত্রকে পড়া বোঝাবার দায়িত্ব নেই, পাশ করাবার দায়িত্ব নেই, কেবল মনিবের সামনে বসে গড়গড় ক'রে ছাপার অক্ষরগুলি পড়ে যেতে হবে। সময় আর সামর্থ্য বাঁচিয়ে নিজের পড়াশুনোর কাজে তা লাগাতে পারবে অরুণ। বদমেজাজ ব'লে ভয় কি। কর্তব্যে যদি কোন ত্রুটি না হয় মেজাজ দেখাবার স্থযোগই পাবেন না। সব চেয়ে যা বড় কথা, মাস অন্তে পঁচিশটি টাকা এখন আর কে তাকে দিচ্ছে। মুখ আর মেজাজ

মনিবের যেমনই হোক টাকার ওপর তো আর সে মুখ মুদ্রিত থাকবে না। টাকায় তো রাজার মুখই থাকবে।

কিন্তু কাজটা যত সহজ ভেবেছিল অরুণ, সুরু ক'রে দেখল তত সহজ নয়। প্রথম দিন কয়েক ভালোই কাটল, তারপর বড়ই বাড়াবাড়ি সুরু করলেন ভবেশবাবু। যাটের কাছাকাছি হবে বয়স কিন্তু চিত্ত পাঁচ ছয় বছরের ছেলের মত চঞ্চল। খেয়ালের অন্ত নেই। এই পড়তে বলেন মহাভারতের শান্তিপর্ব, তার দশ মিনিট বাদে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর তার ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে প্রজাস্বত্ব আইন। কোনোদিন ধমকে ওঠেন, 'জ্বর হয়েছে নাকি তোমার, মাস্টার? সাগু খাচ্ছ নাকি যে চিঁ চিঁ করছ অমন ক'রে? জোরে জোরে গলা ছেড়ে পড়। বই পড়তেই তোমাকে রেখেছি। ভূতের মন্তর পড়বার জন্য তো তোমাকে ডাকিনি।'

পরদিন যদি স্বরগ্রাম একটু চড়িয়ে দেয় অরুণ, ভবেশবাবু অমনি কানে আঙুল দেন, 'আস্তে হে ছোকরা, আস্তে। চোখে দেখতে পাইনে ব'লে কি আমাকে কালাও ঠাওরালে নাকি তুমি? চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের পর্দা দু'টো ফুটো ক'রে ফেলবার মতলব বুঝি? চোখ দু'টো তো গেছেই এবার কান দু'টোও যাক, তাহ'লেই আমার ছেলে-ভাইপোরা বগল বাজিয়ে নাচতে পারবে।'

কোনদিন বা উচ্চারণতত্ত্ব বোঝান তিনি অরুণকে, 'দেখ মাস্টার, কথায় বলে শব্দব্রহ্ম নাদব্রহ্ম। আর সেই শব্দের প্রাণ উচ্চারণের মধ্যে। বামুনের ছেলে কিন্তু জিভটি করেছ একেবারে শূদ্রের মত। উচ্চারণেই যদি কিছু বোঝা না গেল, তাতেই যদি ভুল রইল, তোমার মুখ থেকে শাস্ত্র শুনে আমার কোন্ অক্ষয় স্বর্গবাস হবে শুনি? কি একখানা জিভই করেছ! বিশুদ্ধভাবে না বলতে পারো দেবভাষা, না রাজভাষা। একেবারে চাষাড়ে জিভ। যা বলছি শোন। একটা জিভছোলা কিনে

নাও। তারপর রোজ দু'বেলা সকালে বিকালে চেঁছে চেঁছে পরিষ্কার করো জিভ। দেখবে স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে, উচ্চারণও আটকাবে না। বুঝেছ?'

বুঝতে অরুণের বাকি ছিল না। দেবভাষাই হোক আর রাষ্ট্রভাষাই হোক, কোন বইয়ের ভাষার সঙ্গে ভবেশবাবুর মনের ভাষার মিল ছিল না। ছাপার অক্ষর কোনদিনই তাঁর কাছে রসক্ষরা ব'লে মনে হয় নি। তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্য ছেলেরা নানা রকম ব্যবস্থাই করেছিল। কীর্তন-ভজন শোনাবার জন্য সুকণ্ঠ গায়ক ছিল একজন, কলকাতা থেকে নতুন নতুন রেকর্ড কিনে পাঠাতেন এক ভাইপো, বেড়াবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী বাঁধা ছিল একখানা, সকালে বিকালে তাঁর খেয়াল অনুযায়ী হাত ধ'রে বাগানে কি পুকুরের ধারে কিংবা চাঁদমারীর মাঠে বেড়িয়ে আনবার জন্য ছিল আলাদা লোক। কিন্তু কিছুতেই চিত্তে শান্তি পান নি ভবেশবাবু। শেষে এক অধ্যাপক বন্ধু বুঝি পরামর্শ দিয়েছিলেন বই শুনবার। জিনিসটে তাঁর কাছে নতুন ব'লে কিছুদিন মন্দ লাগে নি। কিন্তু দিন কয়েক পরে ফের একঘেয়ে লাগতে লাগল। পাঠে কিছুতেই রস পেলেন না। ঘনঘন পাঠক বদ্‌লী হতে লাগল কিন্তু এ পদটা একেবারে তুলে দিলেন না। সংসারের আপনজন তো নিতান্ত দায়ে না পড়লে তাঁর বড় একটা খোঁজ খবর নেয় না। মাইনে-করা যত হরেক রকমের লোককে নিজের সেবায় নিয়োগ ক'রে রাখা যায়, ততই ভালো। এমনি ক'রে নিজের যতটুকু গুরুত্ব আর মর্যাদা বাড়ানো যায় মন্দ কি। সব রকমেই তো তিনি বঞ্চিত হয়ে আছেন, ভোগ-সুখ তো সব উঠে গেছে সংসার থেকে। খসুক কিছু গাঁটের কড়ি ছেলে-ভাইপোদের।

অভিযোগের অন্ত নেই ভবেশবাবুর। কেবল চোখই তো তাঁর যায়নি, চোখের সঙ্গে সঙ্গে সব গেছে। ছেলেদের পিতৃভক্তি নেই, স্ত্রীর নেই

পতিপ্রেম, পুত্রবধূরা যার যার ঘরসংসার ছেলেপুলে নিয়ে ব্যস্ত, সবাই এড়িয়ে চলছে ভবেশবাবুকে—সবাই হেনেস্থা করছে। অথচ এত সব বিষয়সম্পত্তি, জোতজমি, ক্ষেতথামার, জলা, সহরের উপান্তে এত বড় দোতলা পাকা বাড়ি, আম কাঁটাল সুপারি নারকেলের বাগান সব প্রায় ভবেশবাবুর নিজের হাতে করা। নিজের বুদ্ধিবলে আর বাহুবলে। অথচ সে সব কথা পরিবারের আর কারোরও মনে নেই। বেঁচে থাকতেই তিনি বাদ পড়ে গেছেন সংসার থেকে। দূরে বাড়ির এক কোণে তাঁকে সরিয়ে রেখেছে সবাই।

কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। ছেলেরা, ভাইপোরা, বউরা, নাতি-নাতনীরা কেউ বড একটা তাঁর কাছে ঘেঁসে না। সবাই ভয় করে তাঁর গালাগাল বকাবকিকে। তারা কাছে এলে তারাও সুস্থ থাকতে পারে না, ভবেশ-বাবুর নিজেরও অসুস্থতা বাড়ে।

সমস্ত পরিবারটির মধ্যে কেবল একটিমাত্র ব্যতিক্রম আছে। ভবেশ-বাবুর ছোট মেয়ে। বছর ষোল সতের হবে বয়স। কিন্তু প্রভাবে প্রতিপত্তিতে বাড়ির সবাইকে সে ছাড়িয়ে গেছে। অন্ধ বদমেজাজী ক্রোধান্ধ বাপকে সে-ই কেবল আয়ত্তে আনতে পারে। বকতে, গালাগাল দিতে মেয়েকেও কসুর করেন না ভবেশবাবু। তবু মেয়ে ছাড়া দু'দণ্ড তাঁর চলে না। ভবেশবাবু কখন খাবেন, কখন ঘুমোবেন, কখন বেড়াবেন, কখন কি বই শুনবেন, কোন রেকর্ড শুনবেন সব মেয়েটির নখদর্পণে। তার অনুমোদন ছাড়া কিছুই হবার জো নেই, মেয়েটি—'

অসিতবাবুকে বাধা দিয়ে বললুম, 'যতদূর মনে হচ্ছে এই অসীম প্রভাবতী প্রভাবশালিনী মেয়েটিই আপনার নায়িকা। কিন্তু কেবল কি গুণ বর্ণনা করলেই একটি মেয়েকে ফুটিয়ে তোলা যায় মশাই? তার চেহারা কেমন ছিল বলুন, রূপের বর্ণনা দিন।'

অসিতবাবু বললেন, 'রূপ? ক্ষমা করুন মশাই, আমি মোটেই রূপদক্ষ নই। গল্প-উপন্যাসের নায়িকার রূপের মত এককথায় অবর্ণনীয় ব'লেই না হয় ধরে নিন।'

বললুম, 'আচ্ছা, রূপের কথা না হয় গেল। নাম? নাম একটা রাখবেন তো?'

অসিতবাবু একটু হাসলেন, 'কেন, অনামিকা রাখলে চলবে না?'

বললুম, 'তাও চলে। তবে ডাকবার সময় ছোট ক'রে অনু ব'লেই না হয় ডাকবেন সংক্ষেপে।'

এবার তারিফের ভঙ্গিতে অসিতবাবু আমার দিকে চেয়ে হাসলেন, তারপর বললেন, 'না, অনু নয়। অত মৃদু মিহি নামে চলবে না। ভবেশবাবুর মেয়ের নাম জয়ন্তী। কেবল গুণ নয়, দোষও জয়ন্তীর কম ছিল না। ওই বয়সে অমন অহঙ্কারী, দেমাকী, রাশভারি মেয়ে অরুণ আর কোনদিন দেখেনি।'

সে দেমাক যে জয়ন্তী মুখ ফুটে প্রকাশ করত তা নয়। তার চালচলনে ভাব-ভঙ্গিতে সে দেমাক আপনিই ফুটে বেরুত। বাপের জন্য নিজের হাতে চা জলখাবার তৈরী ক'রে নিয়ে আসত জয়ন্তী, কাঁচের আলমারী খুলে বের করত নানাধরণের বই, ইংরেজী বাংলা তিন চারখানা খবরের কাগজ এনে অরুণের টেবিলে নিঃশব্দে রেখে দিয়ে যেত। প্রায় সপ্তাহ খানেকের মধ্যে অরুণের সঙ্গে কথা বলবার তার কোন দরকারই হয় নি। কিন্তু তার নিঃশব্দ যাতায়াতে এই কথাটিই যেন মুখর হয়ে উঠত যে সে মনিবের মেয়ে আর অরুণ তাদের পঁচিশ টাকা মাইনের চাকুরে। মাঝে মাঝে বাপের পাশে ব'সে ব'সে জয়ন্তী পড়া শুনত অরুণের। ক্লাসের টীচার যেন ছাত্রকে দাঁড় করিয়ে তার পাঠের যতি-বিরতির ভুল ধরবার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে, জয়ন্তীর ভঙ্গিটা প্রায় সেই রকমই দেখতে

হ'ত। জয়ন্তীর অবজ্ঞার জবাবটা অরুণও ঔদাসীন্যের ভাষায় দিত। কোন কৌতূহল, কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ পেত না অরুণের চোখে। সে চোখ ঢাকা থাকত বইয়ের পাতায়। সে আর তার শ্রোতা ছাড়া যে তৃতীয় কারো অস্তিত্ব আছে ঘরে, সে সম্বন্ধে তার চেতনা মোটেই ধরা পড়ত না।

সহরে খবরের কাগজ যায় বিকালের গাড়িতে। সন্ধ্যাবেলায় শোনাতে হয় সংবাদ-পত্র। খান দুই কাগজ আগাগোড়া পড়ে শুনিয়ে অরুণ উঠতে যাচ্ছে হঠাৎ চোখে পড়ল টেবিলের উপর মাইকেলের গ্রন্থাবলী। একটু অবাক হ'ল অরুণ। কেন না কাব্যপাঠের প্রোগ্রাম এখন নয়। হয়তো ভুলেই কেউ নামিয়ে রেখেছে বইখানা মনে ক'রে অরুণ বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে, জয়ন্তী ভবেশবাবুকে ডেকে বলল, 'বাবা, তুমি সেদিন মেঘনাদ বধ শুনতে চেয়েছিলে না? শোন না একটু।'

ভবেশবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন মেঘনাদ বধ?'

জয়ন্তী বলল, 'হ্যাঁ, দয়ালদাস তো ছুটি নিয়ে গেছে বিয়ে করতে। সে তো ক'দিন আর আসতে পারবে না। এ সময়টায় বইটই শুনলে পারো খানিকক্ষণ।'

দয়ালদাসের নাম অরুণ এর আগেও শুনেছে। কীর্তন-ভজন শুনায় সে ভবেশবাবুকে। ভবেশবাবু বললেন, 'কথাটা মন্দ বলিসনি। পড়ো মাস্টার, মেঘনাদ-বধখানাই পড়ো। গোড়া থেকেই স্থরু করো না। সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীর চূড়ামণি। এম. ই. স্কুলের ফিফ্‌থ্‌ ক্লাশে খানিকটা পাঠ্য ছিল আমাদের। বেড়ে লিখেছে।'

অরুণ একটু ইতস্ততঃ ক'রে গম্ভীর মুখে ফের গিয়ে বসল চেয়ারে। তারপর পড়তে স্থরু করল মেঘনাদ বধ। কণ্ঠে অসন্তুষ্টি আর বিরক্তির স্থর চাপা রইল না। একটু বাদেই ঢুলতে স্থরু করলেন ভবেশবাবু।

আর সেই ফাঁকে অরুণ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। জয়ন্তী একবার তাকাল অরুণের দিকে, তারপর ভবেশবাবুকে ডেকে জাগিয়ে দিয়ে বলল, 'কেমন লাগছে বাবা? আরো একটু শুনবে?'

ভবেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, থামলে কেন মাস্টার, পড়ো পড়ো। বেশ লিখেছে ইটালী-আবিসিনিয়ার কথাটা। মুসোলিনীই বুঝি জিতে চলেছে?'

অরুণ অদ্ভুত একটু হেসে বইখানা বন্ধ ক'রে বলল, 'আমি এবার যাই চাটুয্যেমশাই, আপনি বরং ঘুমোন।'

জয়ন্তী বলল, 'বাবা, সর্গটা উনি শেষ না ক'রেই যেতে চাইছেন।'

কৌচে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ছিলেন ভবেশবাবু, এবার তড়াক ক'রে উঠে বসলেন, 'যেতে চাইছেন? উঁহু, উঁহু, সর্গ শেষ করো মাস্টার, সর্গ শেষ করো। ফাঁকি দিতে চেষ্টা করেছ, কি ধরা পড়েছ আর চাকরি গেছে। নাঃ, কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো নেই সংসারে। লঙ্কায় যে আসে সে-ই রাবণ। ভবেশ চাটুয্যের কাছে যে আসে সে-ই জোচ্চোর, ফাঁকিবাজ। বিভাসের কাছে শুনলুম ছেলেটি গরীব, ছেলেটি ভালো। তোরাও তো সবাই গোড়ায় তাই বলেছিলি। অথচ দেখ দেখি কাণ্ড। সর্গটা শেষ না ক'রেই উঠে পালাতে যাচ্ছিল। আচ্ছা, জয়ন্তী, যত পাঠক আসবে আমার কাছে সব্বই ঠগ্‌ হবে? সংসারে কারো ওপর একটু নির্ভর করা যাবে না? না ছেলেদের ওপর, না ভাইপোদের ওপর—'

জয়ন্তী বলল, 'তুমি ভেব না বাবা। আমি যতক্ষণ আছি কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

অরুণ বলল, 'ফাঁকি আপনাকে কেউ দিচ্ছে না, চাটুয্যেমশাই। সন্ধ্যায় কেবল আপনি খবরের কাগজ শুনতেন, তাই শুনিয়েই চলে যাচ্ছিলুম। মেঘনাদ বধ কি আরো খানিকক্ষণ আপনি শুনতে চান?'

ভবেশবাবু রূঢ়-স্বরে বললেন, 'শুনতে চাই বা না-চাই। সর্গটা তুমি আগে শেষ করো তারপর যাও। কাজ কেউ অর্ধেক ক'রে ফেলে রাখবে, তা আমি কোনদিন সহ্য করতে পারিনে।'

মেঘনাদ বধ আরো খানিকক্ষণ এগুতে না এগুতে ভবেশবাবু ফের ঢুলতে সুরু করলেন। অরুণ কোনরকমে সর্গটা শেষ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কারো অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষা পর্যন্ত করল না।

ফিরে এসে হোটেলের খাওয়া সেরে অনেক রাত পর্যন্ত নিজের পড়াশুনো করল অরুণ। তারপর দীপ নিবিয়ে শুয়ে প'ড়ে মনে মনে সংকল্প করল পাঠকগিরি আর নয়। মাসখানেক না হয় ধার কর্জ ক'রে চালাবে বন্ধুদের কাছ থেকে। তারপর একটা না একটা টুইশান কোথাও জুটে যাবেই। কিন্তু এই খেয়ালী বড় লোক আর তাঁর খেয়ালী দেমাকী মেয়ের খোস-খেয়াল সহ্য করবার আর কোন মানে হয় না। এ পর্যন্ত কেউ জোচ্চোর ফাঁকিবাজ বলেনি অরুণকে। কর্তব্যে কোনদিন কেউ তার ত্রুটি ধরতে পারেনি। বিনা কারণে ধরেছেন কেবল ভবেশবাবু আর তাঁর মেয়ে। তাঁদের কথার একমাত্র জবাব কাজ ছেড়ে দেওয়া। তাই দেবে অরুণ। কাল গিয়ে সকালের পাঠটুকু শেষ ক'রে জানিয়ে আসবে পদত্যাগের কথা।

সকাল বেলা পাঠ সুরু হয় মোহমুদ্গারে। তাকিয়া ঠেস দিয়ে আল-বোলা টানতে টানতে রোজ ভোরে জীবনের অনিত্যতার কথা শুনতে থাকেন ভবেশবাবু। অন্যান্য দিনের চেয়ে সেদিন আরো নিস্পৃহ আর গম্ভীর মুখে অরুণ এসে বসল ভবেশবাবুর সামনের চেয়ারে। জয়ন্তী এসে ঘরে ঢুকল। মুখে কঠিন গাম্ভীর্য, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে জয়ন্তী খুলে ফেলল কাঁচের আলমারী। বের করল প্রাতঃপাঠ্য, মোহমুদ্গার, শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা, পকেট-সংস্করণের শ্রীশ্রীচণ্ডী।

গম্ভীরভাবে মোহমুদ্গরখানা টেনে নিল অরুণ। সে আজ তৈরী হয়ে এসেছে। আর ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়েক। তারপরেই এঁদের মোহ ভাঙবে। স্পষ্টভাষায় মুখের ওপর কাজ ছাড়বার কথা ব'লে দেবে ভবেশ-বাবুকে। কালক্ষেপ না ক'রে পড়া স্থরু করল অরুণ।

'নলিনীদলগত জলমতি তরলম্—'

কিন্তু হঠাৎ সেই মোহমুদ্গরের পাতায় ভাঁজকরা একটুকরো নীলাভ কাগজ দৃষ্টি আকর্ষণ করল অরুণের। স্থন্দর গোটা গোটা অক্ষরে তার নিজের নামটুকু লেখা আছে তাতে। কৌতূহল সংবরণ করা সম্ভব হ'ল না। চিঠিটুকু হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলে ফেলল অরুণ।

'কেমন, দেখলেন তো মজা? আর দেবেন ফাঁকি? এসেই অমন আর পালাই পালাই করবেন? আহাহা, কি পড়াটাই পড়লেন কাল। বাবার দোষ নেই, আপনার কাব্যপাঠ শুনলে যে-কোন লোকের খবরের কাগজ পাঠ ব'লেই মনে হ'ত। তবু আপনি বলতে চান যে আপনি ফাঁকিবাজ ন'ন?'

চিঠিতে সম্বোধনও ছিল না, স্বাক্ষরও ছিল না। কিন্তু লেখাটুকু কার বুঝতে বাকি রইল না অরুণের।

ধমক দিয়ে উঠলেন ভবেশবাবু, 'বলি ও ছোকরা, হ'ল কি তোমার? দু'ছত্র পড়তে না পড়তেই বাকরোধ হয়ে গেল নাকি? না! তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলল না আমার।'

থতমত খেয়ে অরুণ চিঠিটুকু পকেটে পুরে ফিরে পড়তে স্থরু করল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—' কিন্তু এ মুদ্গরে, এ ধর্মবাণীতে কি কোন একুশ বছরের যুবকের মোহ ভাঙে, না কোনদিন ভেঙেছে? 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং—'

নিষ্প্রাণ স্বরে আবৃত্তি ক'রে চলল অরুণ কিন্তু সতৃষ্ণ অপলক দু'টি

চোখে তাকিয়ে রইল এক সপ্তদশী তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বা-ধরোষ্ঠীর দিকে।

ট্রেতে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে একটু আগে ঘরে ঢুকেছে জয়ন্তী। ভোরেই স্নান সেরে নিয়েছে। ভিজে ঘন কালো চুলের রাশ পড়েছে কটি ছাড়িয়ে। খয়েরী রঙের শাড়িটি বেশ মানিয়েছে সুঠাম তনুদেহের গৌরবর্ণের সঙ্গে।

ভবেশবাবুকে চা পরিবেশন ক'রে আর একটি কাপ অরুণের ছোট টেবিলটুকুর উপর রেখে দিল জয়ন্তী। প্রথম দিনই অরুণ জানিয়ে দিয়েছিল সে চা খায় না। তারপর থেকে কেউ আর তাকে চা খাওয়াবার জন্য পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু আজ শুভ্র সুন্দর ফুটন্ত শ্বেতপদ্মের মত একটি চায়ের কাপ এসে পৌঁছল মোহমুদ্গরের পাশে, এসে পৌঁছল 'চা চাইনে', তার সমস্ত অস্তিত্ব মুখর হয়ে উঠল 'চাই, চাই, সব চাই।'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অন্ধ ভবেশবাবু বললেন, 'কই মাস্টার, হ'ল কি তোমার?'

নিজের হাতের চায়ের কাপটি তাড়াতাড়ি নামিয়ে রেখে অরুণ সঙ্গে সঙ্গে তোতাপাখীর মত ব'লে উঠল, 'অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং'......

জয়ন্তীর গম্ভীর সুডৌল মুখখানি হাসির আভায় চিক্‌চিক্ ক'রে উঠল। আভাস দেখা গেল ছোট ছোট সাদা মুক্তার মত বিন্যস্ত-করা ক'টি দাঁতের। তারপর কি একটি কাজের ছলে সেখান থেকে স'রে গেল জয়ন্তী।

অরুণের পদত্যাগ করা আর হ'ল না।

তারপর কখনো মোহমুদ্গরের পাতার ফাঁকে, কখনো শ্রীমদ্ভাগবতে, কখনো হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে টুকরো কাগজগুলির আদান-প্রদান চলতে লাগল। দিনের পর দিন ভাষা বদলাল, ভঙ্গি বদলাল, স্বাক্ষর-সম্বোধন সুরু হয়ে অদল-বদল হ'ল তাদেরও। জয়ন্তী কি অরুণের শান্ত গম্ভীর

মুখ দেখে বাইরে থেকে কিছু বুঝবার জো ছিল না। কিন্তু কলমের মুখ তাদের ক্রমেই খুলে যাচ্ছিল।

কথাবার্তাও সুরু হয়েছিল অরুণের আর জয়ন্তীর। সব কথাই অবশ্য ভবেশবাবুর সম্বন্ধে। তাঁর সেবা-পরিচর্যা, রুচি-অরুচির কথা। কখনো বা আলোচনা হ'ত পঠিত বইয়ের, কখনো বা সংবাদপত্রীয় রাজনীতির। তবু সেই সব অবান্তর কথার মধ্যে গূঢ়ার্থ অন্তরের কথা থাকত ভরা; চিঠি তখন পরস্পরকে না লিখলেও চলত। যদিও ভবেশবাবুর ঘরের আলমারীর বই আর কেউ ছোঁয় না, যদিও আলমারীর চাবি জয়ন্তীর আঁচলেই বাঁধা থাকে, তবু সাবধানেব মার নেই, শাস্ত্রে আছে 'শতং বদ মা লিখ'। কিন্তু না লিখে কি পারা যায়। না লিখলে মনে হয় অর্ধেক হ'ল আর বাকি রয়ে গেল অর্ধেক। Writing makes a man perfect—এ প্রবচনের সঙ্গে এ কথাও সত্য যে writing makes love complete।

শঙ্কিত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তারা তাকাত ভবেশবাবুর দিকে। তাঁর চোখের অনড় মণি দু'টির কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু মেজাজের পরিবর্তন যেন তাঁর সুরু হয়ে গিয়েছিল। সেবা-শুশ্রূষায় উৎসাহ আর মনোযোগ যেন আরো বেড়ে গেছে জয়ন্তীর। ভারি স্নিগ্ধ মধুর শোনাচ্ছে অরুণের কণ্ঠ। ঘড়ির কাঁটা দেখে তোতাপাখীর মত সে কেবল বই আর খবরের কাগজ ক'খানা পড়ে দিয়েই উঠে যায় না, পড়া শেষ হয়ে গেলেও ব'সে ব'সে গল্প করে ভবেশবাবুর সঙ্গে। তাঁর অন্ধ চোখের সামনে তুলে ধরে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধময় পৃথিবীকে। নবীন লেখকদের ফাঁকে ফাঁকে নবীন-তর লেখকদের কাব্য-উপন্যাস পড়ে শোনায়, পড়ে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। চন্দ্রসূর্যের আশেপাশের গ্রহনক্ষত্রের খোঁজখবর দেয়। জয়ন্তী বই তোলে, বই নামায়, অন্ধ বাপের পরিচর্যা করে। চা, জলখাবার এনে দেয়

ভবেশবাবু আর অরুণের জন্য। আনে মুখশুদ্ধি, চা ধরলেও অরুণ তখনও পান সিগারেট ধরেনি। হাত পেতে নেয় একটি লবঙ্গ কি একটু হরিতকির টুকরো। নিতান্ত সাত্ত্বিক, বিশুদ্ধ বস্তু। জয়ন্তী আলগোছে যেন ওপর থেকে ছুঁড়ে দিতে চায় কিন্তু কি ক'রে যে আঙুলগুলি আপনিই নেমে আসে, ছোঁয়া লেগে যায় অরুণের হাতের তালুর সঙ্গে, তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না। জয়ন্তী আরক্ত হয়ে ওঠে, রোমাঞ্চিত হয় অরুণ।

কিন্তু বাড়িতে তো কেবল অন্ধ ভবেশবাবুই ছিলেন না, তাঁর চক্ষুষ্মান পুত্র-কলত্রও ছিলেন, ছিলেন পুত্রবধূ, ভাইঝি, ভাগ্নীর দল। এতগুলি চোখকে ফাঁকি দিতে পারা কি সহজ! অরুণ আর জয়ন্তী অবশ্য খুব চেষ্টা করত গম্ভীর হয়ে থাকতে, তৃতীয় কারো উপস্থিতিতে পরস্পরের প্রতি ঔদাসীন্যের অভিনয় করতে, কিন্তু দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজনের চোখে যে আনন্দের আলো জ্বলে উঠত, তাতে তাদের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা গোপন থাকত না। সব কিছু সেই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যেত। অরুণ আর জয়ন্তীর অলক্ষ্যে বাড়ির অন্যান্য পরিজনের পাহারা আরও সতর্ক হয়ে উঠল, দৃষ্টি হ'ল অনুসন্ধিৎসু। তারপর একদিন জয়ন্তীর বড় বউদি বারান্দার অন্ধকারে তাদের একেবারে হাতে হাতে ধ'রে ফেললেন। দেখে ফেললেন অরুণের হাতের মধ্যে ধরা জয়ন্তীর হাত। জয়ন্তী অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল। অরুণ দু'পা এগুতে যাচ্ছিল, বড় বউদি বললেন, 'দাঁড়ান। আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

একটু বাদেই এলেন জয়ন্তীর মা। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালেন অরুণের দিকে, বললেন, 'দাঁড়াও।'

অরুণের পাশ দিয়ে তিনি ঢুকলেন গিয়ে স্বামীর ঘরে। অরুণ তাঁদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। জয়ন্তীর মা অরুণকে শোনাতেই চাইছিলেন।

জয়ন্তীর মা স্বামীকে বললেন, 'ওর অনেক ভাগ্য, বড় খোকা মেজো খোকা আজ বাড়ি নেই। তাহ'লে হাড় আর মাস তারা আলাদা ক'রে ফেলত। কিন্তু কেলেঙ্কারী আর বাড়িয়ে কাজ নেই, লোকে হাসবে। শুধু ডেকে ব'লে দাও, কাল থেকে ওকে আর আসতে হবে না।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কার কথা বলছ?'

জয়ন্তীর মা সখেদে বললেন, 'কার কথা বলছি! হায় আমার কপাল, এমনি যদি না হবে চোখ দু'টো যাবে কেন তোমার! অরুণ গো অরুণ। তোমার ওই পাঠক ছোকরা।'

ভবেশবাবু বললেন, 'কেন, আগেকার বুড়ো পাঠকগুলির চাইতে ও তো ভালোই কাজ করছে। কাজে মোটেই ফাঁকি দেয় না, উচ্চারণও বেশ শুধরেছে। আর আমার পাঠক তাড়াবার জন্য তোমার এতো মাথা-ব্যথা কিসের? তাছাড়া এ ঘরে তুমি এলেই বা কেন? ঠাকুর চাকর, নাতিনাতনীর রাজ্যে তো তুমি বেশ রাজরাণী হয়ে আছ। অরুণ না এলে চলবে কি ক'রে? আমাকে বইপত্র কে পড়ে শোনাবে? তুমি?'

জয়ন্তীর মা বললেন, 'কেন, তোমার গুণের মেয়েই রয়েছে। আজ দু' তিন বছর ধ'রে বলছি বিয়ে দাও, বিয়ে দাও, এবার হ'ল তো?'

ভবেশবাবু বললেন, 'কি হ'ল!'

জয়ন্তীর মা আবার বললেন, 'হবে আমার কপাল।' তারপর ফিস্‌ফিস্ ক'রে স্বামীর কানের কাছে মুখ নিয়ে কি বললেন। দু'তিন মিনিট নিঃশব্দে কাটল। অরুণ ভাবল এবার ভবেশবাবু চীৎকার ক'রে উঠবেন, এবার বজ্রগর্জনে ডাক পড়বে তার।

কিন্তু ভবেশবাবুকে মৃদুকণ্ঠে বলতে শোনা গেল, 'অরুণরা পদবীতে কি?'

ভবেশবাবুর স্ত্রী বললেন, 'চক্রবর্তী। কেন, তা দিয়ে তোমার কি হবে ?'

ভবেশবাবু বললেন, 'না, অমনিই জানতে চাইছিলাম। বাড়ির অবস্থা কি রকম ?'

ভবেশবাবুর স্ত্রী রুক্ষস্বরে বললেন, 'শুনছি তো যজমানী করে বাপ। দিন আনে দিন খায়। আর ছেলের এখানে পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষা ক'রে পড়ার খরচ চলে। কেন, তা দিয়ে কি হবে তোমার ?'

ভবেশবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'না, এমনিই জানতে চাইছিলাম।'

জানাজানি খুব বেশি হতে দিলেন না জয়ন্তীর মা, কি তাঁর বড় খোকা, মেজো খোকারা। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক হয়ে গেল। মহকুমা সহরে ওকালতি করে ছেলে। সদ্য পাশ ক'রে এসে বসলেও ইতিমধ্যেই নাকি নাম তার বেশ ছড়াতে সুরু করেছে। বংশে মুখোপাধ্যায়। বাপ মা ভাই বোন সব আছে। পাকা বাড়ি আর পর্যাপ্ত ভূসম্পত্তি আছে গাঁয়ে। রূপে, গুণে, স্বাস্থ্যে, স্বভাবে এমন ছেলে কদাচিৎ মেলে। পণ যৌতুকের দাবী অবশ্য কিছু বেশি।

জয়ন্তীর মা বললেন, 'তা হোক। তবু এ-সম্বন্ধ হাতছাড়া করব না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে। সব চেয়ে কাছাকাছি যে দিন আছে পাঁজীতে পাত্রপক্ষকে ব'লে সেই দিনই ঠিক ক'রে ফেল। টাকা তোমাদের হাতে না থাকে গায়ে গয়না তো আমার আছে।'

জয়ন্তীর বিয়ের দিন দুই পরে একখানা খামের চিঠি হাতে এল অরুণের। গোপন হাতচিঠি নয়, বইয়ের পাতার আড়ালে ছোট ছোট টুকরো নয়, প্রকাশ্য ডাকের চিঠি। কলেজের ঠিকানায় পিয়ন এসে পৌঁছে দিয়ে গেল। ক্লাস শেষ হ'লে কলেজ কম্পাউণ্ড পেরিয়ে পুকুরের

ধারে নির্জন ঝাউ গাছটার তলায় এসে লেফাফার মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা খুলে ধরল অরুণ। অত্যন্ত পরিচিত হস্তাক্ষর। স্বাক্ষর-সম্বোধন এ চিঠিতেও কিছু নেই। কিন্তু প্রতিটি অক্ষর জলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছে।

'ভেবেছিলুম শত হ'লেও তুমি পুরুষ। তুমি কিছুতেই চুপ ক'রে থাকবে না, তুমি কিছুতেই মুখ বুজে সইবে না। তুমি দাঁড়াবে বুক ফুলিয়ে—সমস্ত শাসন ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার সামনে তুমি দাঁড়াবে মুখোমুখি। আমি যে চোখ বুজেছিলুম, আমি যে মুখ বুজেছিলুম, সে কি কেবল ভয়ে? সে কি কেবল লজ্জায়? তা নয়, নিশ্চিন্তেও। ভেবেছিলুম তুমিই তো আছ, তুমি থাকতে আমার ভাবনা কি। কিন্তু দেখলুম যা ভেবেছিলুম সব ভুল। ভালোই হয়েছে, সে ভুল এত অল্পেই ধরা পড়ল, এত অল্পেই চুরমার হ'ল ভেঙে।'

হঠাৎ পিছন থেকে কে এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল চিঠিখানা। চমকে উঠে মুখ ফিরাল অরুণ। দেখল বিভাস মুখ মুচকে হাসছে। কিছু কিছু বিভাস আগেই জানত। কেননা ইতিমধ্যে অরুণের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। এবার সব কিছুই জানল। তারপর ধিক্কার দিয়ে বলল, 'সত্যিই তুমি কাপুরুষের অধম। পুরুষের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে। পরম অপদার্থ।'

অরুণ পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইল। কোন জবাব দিল না। বিভাসের কথারও নয়, জয়ন্তীর চিঠিরও নয়। জবাব দেওয়ার কি-ই বা ছিল। দিন কয়েক আগে লোক মারফৎ খবর দিয়ে গোটা চার-পাঁচ টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন তার বাবা। ছোট ভাই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে, তার ওষুধের দামটা বাকি পড়েছে ডাক্তারখানায়। অরুণ যে এক বড়লোকের বাড়ি কাজ পেয়েছে আর তাদের সুনজরে পড়েছে, এ খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন।

মাস কয়েক বাদে ফল বেরুল পরীক্ষার। দেখা গেল, পুরুষের নাম ডোবালেও মফঃস্বলের সেই অখ্যাত কলেজটির নাম অরুণ গেজেটের মাথার দিকে তুলে ধরতে পেরেছে। প্রথম হয়েছে দর্শনে। এমন ভালো রেজাল্ট সে কলেজের ইতিহাসে নাকি আর দেখা যায় নি। অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে বিভাসও এসে কাঁধ চাপড়ে দিল অরুণের, বলল, 'না হে, সেদিনের সেই কথাটা একটু এ্যামেণ্ড ক'রে নিচ্ছি অরুণ। হৃদয় ভাঙলেও যার কলম ভাঙে না, কাপুরুষ হ'লেও ছেলে হিসাবে তাকে ভালো না ব'লে জো নেই।'

কিন্তু এ সান্ত্বনায় কি বুক ভরে! এই ভালোত্ব দিয়ে কি ভুলিয়ে রাখা যায় মন!

গেজেটের মাথার দিকে নিজের নাম ছাপা হ'লেই কি জীবনের সব ক্ষোভ সব দুঃখ সব লজ্জা চাপা পড়ে যায়?

কলকাতায় এসে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হ'ল অরুণ। আস্তানা নিল উত্তর কলকাতার একটি জনবহুল সস্তা মেসে। ফের বসল বইপত্র নিয়ে, কিন্তু বইতে কিছুতেই মন বসতে চাইল না। বিরাট সহর, বিচিত্র লোকজন, বিচিত্রতর সহপাঠী সহাধ্যায়িনীরা, কিন্তু কোন কিছুই আকর্ষণ করতে পারল না অরুণকে, সব ছাড়িয়ে তার মন কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল মফঃস্বল সহরের একখানি দক্ষিণ-খোলা ঘরে যেখানে রোজ সকাল-সন্ধ্যায় দেখা হ'ত একটি স্মিতমুখী অপরূপদর্শনার সঙ্গে।

বিভাসের ছোট পিসীর বিয়ে হয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুর-বাড়ির পাশের গাঁয়ে। তিনি একদিন স্বামীর সঙ্গে চোখের চিকিৎসার জন্য এলেন কলকাতায়। বিভাস গেল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল অরুণ। কথায় কথায় জয়ন্তীদের খবর বললেন বিভাসের পিসীমা। জয়ন্তী মোটেই শান্তিতে নেই শ্বশুর-বাড়িতে। কি ক'রে বিয়ের আগের বিশ্রী সব

কানাঘুষা অতিরঞ্জিত হয়ে কানে গিয়েছে জয়ন্তীর শ্বশুর ;আর শাশুড়ীর। উঠতে বসতে তাঁরা তাকে নানারকম বাঁকা-বাঁকা কথা শোনাচ্ছেন। নবনীর মনও ভারি সন্দিগ্ধ। সর্বদা স্ত্রীকে চোখে চোখে রাখতে চায়। অভদ্র ইঙ্গিত করে যখন তখন। ভবেশবাবুর খুব অসুখ। তবু অসুস্থ বাপকে একবার দেখতে আসবার অনুমতি পায়নি জয়ন্তী।

ফেরবার পথে অরুণ বিভাসকে বলল, 'আমিই সব কিছুর জন্য দায়ী বিভাস। আমিই নষ্ট ক'রে দিলাম একটা জীবনকে।'

বিভাস হেসে মাথা নাড়ল, 'দূর পাগল। অত সহজেই কি একটা জীবন নষ্ট হয়। কিছু নষ্ট করতে হ'লেও ক্ষমতার দরকার। তোমার দ্বারা তা হবে না। মন দিয়ে পড়াশুনো করো। অন্য কোন দিকে মন দিয়ে তোমার কাজ নেই। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বিভাস একটু সিনিক ধরণের ছেলে। খোঁচা দিয়ে কথা বলা তার অভ্যাস। অরুণ মনে মনে হাসল। কোন কিছু নষ্ট করবার নাকি তার ক্ষমতা নেই। না থাক্ না-ই রইল। সে রকম ক্ষমতা সে চায় না। কিন্তু কষ্ট করবার, কষ্ট পাবার ক্ষমতা তো আছে। আছে দুঃখবোধের, দুঃখ পাবার অধিকার, জয়ন্তীর কাছে সে দুঃখের রূপ আলাদা, ধরণ আলাদা কিন্তু কারণ তো একই। সেই ঐক্যের মধ্যে জয়ন্তীর সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য খুঁজে পেল অরুণ। নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা। অরুণ যদি শুনতে পেত জয়ন্তী বেশ সুখে আছে, তাহ'লে হয়তো নিশ্চিন্ত হ'ত, স্বস্তি পেত, কিন্তু দুঃখ আর বেদনার ভিতর দিয়ে এমন তীব্রতর অস্তিত্বের স্বাদ পেত না। দেখাসাক্ষাৎ, চিঠিপত্রের যোগাযোগ না থাক, চিরকাল ধ'রে থাক দু'জনের যোগসূত্র রক্ষা করার এই দুঃখ—এই অস্বস্তি আর শান্তিহীনতা।

যথাসময়ে মৃত্যুর খবর এল ভবেশবাবুর। কি একটা খারাপ জ্বরে

ভুগে ভুগে মারা গেছেন। বহু জোর জবরদস্তী ক'রে বাপকে শেষ মুহূর্তে দেখতে এসেছিল জয়ন্তী। কিন্তু দেখা হয়নি। জয়ন্তী এসে পৌঁছবার আগেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন।

অরুণ ভাবল এবার একখানি চিঠি লিখবে জয়ন্তীকে। কিন্তু লিখতে গিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। কি লিখবে ঠিক পেল না; যা লিখল মনঃপূত হ'ল না। ছিঁড়ে ফেলল চিঠি।

এম. এ.-তে আশানুরূপ ফল হ'ল না। তবু বন্ধুরা ধ'রে বসল, 'খাওয়াতে হবে। অদ্বিতীয় না হয়ে না হয় দ্বিতীয় হয়েছ। কিন্তু আমরা যে প্রায়ই সব তৃতীয় শ্রেণী। মিষ্টিমুখ ছাড়া আমাদের সান্ত্বনা কিসে।'

টুইশনের টাকায় মেসের ঘরে ঘরোয়া ধরণের ছোট একটু ভোজসভা বসল। সবাই এসে পৌঁছল। কিন্তু বিভাস আর আসে না। শেষ পর্যন্ত দেখা মিলল বিভাসের। রাত তখন ন'টা। সবাই রুখে উঠে বলল, 'এত দেরি হ'ল যে, খবর কি তোমার?'

অরুণকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বিভাস বলল, 'খবর খুব সুবিধা নয়। নবনী মারা গেছে কলেরায়। সস্ত্রীক বেড়াতে এসেছিল শ্বশুর বাড়িতে। সেখানেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। টেলিগ্রাম পেয়ে অনুকুলদা আজই রওনা হয়ে গেলেন। তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েই দেরি হ'ল এতখানি।'

পরমুহূর্তে ভোজের আসরে ফিরে এল বিভাস। সমানে চালাতে লাগল গল্পগুজব আর চপ কাটলেট। একেবারে নির্বিকার চিত্ত, যেন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু অরুণ রইল নির্বাক, স্তব্ধ হয়ে। তার বৈকল্য বুঝি কিছুতেই আর ঘুচবে না।

আরো খবর এসে পৌঁছল নানা রকমের। জয়ন্তীর শ্বশুর পুত্রশোকে পাগলের মত হয়ে যা তা বলছেন। অসময়ে এই যে অপমৃত্যু হয়েছে

নবনীর, তা নাকি জয়ন্তীরই পাপে। তাতে নাকি জয়ন্তীর হাত আছে। এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয় নবনীর। জয়ন্তীকে তাঁরা ফিরিয়ে নেননি কিন্তু ছিনিয়ে নিয়েছেন তার সমস্ত অলঙ্কার আসবাবপত্র। দাবী করেছেন নবনীর লাইফ ইনসিওরেন্সের পাঁচ হাজার টাকা। জয়ন্তী স্বেচ্ছায় লিখে দিয়েছে তার স্বত্ব।

এবার স্তব্ধতা ভাঙল অরুণের, কাটিয়ে উঠল সমস্ত দ্বিধা আর ভীরুতা। সরাসরি চিঠি লিখল জয়ন্তীকে। লিখল, 'তোমার দু'বছর আগেকার চিঠির জবাব আজ দিতে বসেছি জয়ন্তী। আজ নয়, দু' বছর ধরেই তোমার চিঠির জবাব দিতে চেষ্টা করেছি। লিখেছি আর ছিঁড়েছি, টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়েছি নিজেকে। ছিঁড়েছি সেদিনের সেই ক্লীব কাপুরুষকে। সেদিন আমার ভুল হয়েছিল। আজ আমাকে সেই ভুলের সংশোধন করতে দাও, জয়ন্তী। জানি এই মুহূর্তে আমার আওড়ানো উচিত মোহমুদ্গার। তা আমি পারব না, কি ক'রে পারব! আমার মন এখনো মোহে আচ্ছন্ন। সে মোহ জীবনের, সে মোহ তোমার। রূপ-রস-ভালোবাসা ভরা পৃথিবীর।'

এইসব আরো অনেক কথা লিখেছিল অরুণ। তার কলমের কোন রাস ছিল না। লিখেছিল, এই দু'বছর ধ'রে যা ঘটে গেছে তা শুধু দুর্ঘটনা, তা শুধু দুঃস্বপ্ন; কিন্তু সেই দুঃস্বপ্নকে যে চিরকাল সত্য ব'লে, বাস্তব ব'লে মেনে নিতে হবে তার কি কথা আছে। কোন ঘটনাকে আজ তারা মেনে নেবে না, অন্তরের জোরে ভালোবাসার জোরে ঘটনাকে তারা ঘটিয়ে নেবে। অবশ্য বিত্ত সম্পদ কিছু নেই অরুণের বরং অনেক-গুলি ভাই-বোনের দায়িত্ব আছে ঘাড়ে। সেই সঙ্গে দায়িত্ব নেবে সে জয়ন্তীরও। দারিদ্র্যের সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের পরিচয়। দারিদ্র্যকে সে ভয় করে না। চিত্তের তেমন দৃঢ়তা জয়ন্তীরও নিশ্চয়ই আছে।

অরুণের বাবা অবশ্য গোঁড়া সেকেলে ব্রাহ্মণ। নানা সংস্কারে তাঁর মন আচ্ছন্ন। বিধবা-বিয়েতে তিনি সম্মতি নাও দিতে পারেন সে আশঙ্কা আছে। কিন্তু জয়ন্তী সঙ্গে থাকলে সমস্ত বাধাবিঘ্নকেই জয় করতে পারবে অরুণ। কিছুতেই আর পিছপা হবে না। তারপর লিখল, জয়ন্তীর সঙ্গে সে সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করছে। আরো অনেক বক্তব্য আছে তার। যে সব কথা মুখোমুখি ছাড়া বলা যায় না।

সপ্তাহ খানেক বাদে জবাব এল জয়ন্তীর। সংক্ষেপে সম্মতি জানিয়েছে সে সাক্ষাতের।

উল্লাসে, আনন্দে, উত্তেজনায় ভ'রে উঠল অরুণের বুক। মন উঠল অধীর আর উন্মুখ হয়ে। গাড়ীর একটা রাত্রি যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। ভোর-ভোর সময়ে পৌঁছল সেই সহরে। অতীতের সুখ-স্মৃতির সেই সহর। কিন্তু অতীত আজ বর্তমানে রূপ ধরেছে, স্মৃতি হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

দু'ধারে ঝাউগাছের সার। মাঝখান দিয়ে লাল সুরকী-ঢালা পথ। দিগন্তে যে ভোরের সূর্য উঠেছে, উঠেছে লাল হয়ে, তা অরুণের আনন্দের রঙে রঙীন। সদ্য-জাগ্রত সুন্দর মফঃস্বল সহরের জনবিরল কয়েকটি আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে সেই অতি-পরিচিত সাদা ধবধবে বাড়িটির সামনে দুরু দুরু বুকে এসে দাঁড়াল অরুণ। দেখা হ'ল জয়ন্তীর বড় দাদা অনুকূলের সঙ্গে। প্রাতর্ভ্রমণ শেষ ক'রে বাড়ি ফিরছেন। সঙ্গে সাত আট বছরের একটি সুদর্শন ছেলে। অরুণকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'কি চাই?'

'দেখা করতে চাই জয়ন্তীর সঙ্গে।' নির্ভীক জড়তাহীন স্পষ্ট ভাষায় জবাব দিল অরুণ। এই একটি দিনের মহড়া দিচ্ছে সে ক'দিন ধ'রে।

অনুকূলের মুখখানা মুহূর্তের জন্য টকটকে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তে আত্মসংবরণ ক'রে সহজ শান্ত সুরে তিনি বললেন, 'বেশ। আমি খবর পাঠাচ্ছি জয়ন্তীকে। যদি সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, আমার আপত্তি নেই।'

ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন অনুকূল, 'যাও, তোমার ছোট পিসীর কাছে গিয়ে বলো, অরুণবাবু নামে একজন ভদ্রলোক দেখা করতে চান।'

মুন্সেফী থেকে সাবজজীতে প্রমোশন পেয়েছিলেন অনুকূলবাবু। নৈতিক পবিত্রতায় যেমন তাঁর বিশ্বাস ছিল, তেমনি ছিল নারী পুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে। পৈতৃক সনাতন হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে মিশিয়েছিলেন পাশ্চাত্য শিষ্টাচার।

খবর এল জয়ন্তী প্রতীক্ষা করছে অরুণের জন্য। বাড়ির সেই ভিড় আর নেই। ভবেশবাবু মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। ছোট ছোট পরিবারে টুকরো টুকরো হয়ে পড়েছে যার যার চাকরির জায়গায়। মা গেছেন মেজো ছেলের সঙ্গে। পুত্রবধূ আসন্নপ্রসবা। তাঁর সহায়তা চাই। জয়ন্তী আছে অনুকূলের তত্ত্বাবধানে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলার সেই দক্ষিণ-খোলা ঘরখানিতে গিয়ে পৌঁছল অরুণ। ভবেশবাবুর সেই ঘর। সব প্রায় তেমনিই আছে। সেই টেবিল, চেয়ার, পালঙ্ক। চারিদিকে বইভরা কাঁচের আলমারী। জানলার নিচে সেই শস্যশ্যামলা মাঠ। দিগন্তে ঝাউ আর দেবদারু। কেবল নেই ভবেশবাবু, কিন্তু তাঁর কথা সেই মুহূর্তে মনে পড়ছিল না অরুণের। তার সমগ্র অস্তিত্ব প্রতীক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে ছিল কেবল একজনের জন্য।

একটু বাদে পাশের দরজার পাট ঠেলে ঘরে ঢুকল জয়ন্তী। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে অরুণ নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে গেল, ভবেশবাবুর মত সেও যেন দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। রঙীন শাড়িতে কাঁকনে হারে প্রবালের দুলে

যে অপরূপ সুন্দরী একটি তন্বী কিশোরীর স্মৃতি মনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছিল অরুণের, এই মেয়েটির সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই। খাটো আর মোটা সাদা থান তার পরনে। গায়ে অলঙ্কারের চিহ্নটুকুও নেই। চোখে মুখে শীর্ণ কাঠিন্য। অন্তরের শুষ্ক শূন্যতা সমস্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে। একটা অব্যক্ত হাহাকারে ভ'রে উঠল অরুণের মন। মহড়া-দেওয়া কথা-গুলি মুখে এল না। জয়ন্তীই প্রথমে কথা বলল, 'কেন এসেছ? কি চাই তোমার?'

অরুণ বলল, 'কি যে চাই, তা তোমার অজানা নেই জয়ন্তী। আমার চিঠির জবাব এখন পর্যন্ত তো পাইনি। আমি তার প্রতীক্ষা করছি।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'প্রতীক্ষা করছিলাম আমিও। তোমার চিঠির জবাব সত্যিই দেওয়া দরকার। আর সে জবাব মুখোমুখি না দিলে তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না।'

দেরাজ টেনে বের করল জয়ন্তী অরুণের লেখা দীর্ঘ চিঠিখানা। বের করল একটা মোমবাতি আর দেশলাই। তারপর সেই দীপের শিখায় ধরল চিঠিখানা। সম্বোধন থেকে স্বাক্ষরটুকু পর্যন্ত পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পুড়ল জয়ন্তী, পুড়ল অরুণ।

জয়ন্তী বলল, 'এই তোমার চিঠির জবাব। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ের বিয়ে একবারই হয়। আর যেন আমাকে চিঠি লিখবার স্পর্ধা তোমার না হয় কোনদিন।'

স্পর্ধা! একি বলছে জয়ন্তী! না, অরুণ-ই ভুল শুনেছে! এগিয়ে এসে অরুণ এবার হাতখানা ধ'রে বসল জয়ন্তীর, বলল, 'তুমি ভালো ক'রে ভেবে দেখ, ভালো ক'রে বুঝে দেখ, জয়ন্তী।'

হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না জয়ন্তী, শুধু জ্বলন্ত চোখে তাকাল অরুণের দিকে, বলল, 'ভেবেছিলাম সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান তুমি হারাওনি, ভেবেছিলাম

তোমার সঙ্গে দেখা করতে হলে দারোয়ান সঙ্গে রাখবার দরকার হবে না। কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। এবার বোধ হয় তাকে ডাকবার সময় হয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তীর হাতখানা ছেড়ে দিল অরুণ। যেন সাপে ছোবল মেরেছে। বিষের ক্রিয়া ছড়িয়ে পড়েছে সর্বাঙ্গে।

'আমার স্বামীকে বোধ হয় তুমি দেখনি।' অদ্ভুত একটু হেসে জয়ন্তী বলল, 'তিনি ছিলেন মহৎ, সুন্দর, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, সত্যিকারের আদর্শ পুরুষ ছিলেন তিনি। তোমার মত কাপুরুষ ছিলেন না।'

অরুণ যে পরিচয় শুনেছিল নবনীর, তার সঙ্গে জয়ন্তীর স্বামীর মিল নেই।

কিন্তু জয়ন্তী আবার বলল, 'তুমি বোধ হয় কোনদিন তাঁকে দেখনি, তাই তোমার এ দুঃসাহস হয়েছিল।'

অরুণ বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, সেবার তোমাদের বিয়ের পর দূর থেকে আমি সেদিন দেখেছিলাম নবনীবাবুকে।'

জয়ন্তী অদ্ভুত একটু হাসল, 'কিন্তু কাছ থেকে তো দেখনি। তা'হলে অন্যরকম দেখতে। দেখবে আজ কাছ থেকে?'

অরুণ অবাক হয়ে গেল। জয়ন্তী কি প্রকৃতিস্থ নেই? স্বামীর শোকে তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? মৃত নবনীকে সে কেমন ক'রে দেখাবে?

কিন্তু জয়ন্তী বলল, 'দেখবে তো এসো। পাশের ঘরেই তিনি রয়েছেন।' জয়ন্তীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি সম্বন্ধে অরুণের আর সন্দেহ রইল না। তবু উপেক্ষা করতে পারল না তার ডাক। চলল পিছনে পিছনে।

গিয়ে দেখল পাশের ছোট্ট ঘরটিতে নবনীর বাঁধানো অয়েলপেন্টিং। সবল সুদীর্ঘ দেহ। সর্বাঙ্গে শৌর্যের দৃঢ়তা, চোখে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি।

স্নেহময় প্রেমময় অপূর্ব সুন্দর এক যুবকের প্রতিকৃতি। অরুণের যতটা মনে পড়ল এতখানি সুপুরুষ ছিল না নবনী। প্রেম, বুদ্ধি, ক্ষমার এমন সমন্বয় ছিল না তার আকৃতিপ্রকৃতিতে, তার জীবনে। অরুণ লক্ষ্য করল নবনীর প্রতিকৃতির চারদিক ঘিরে রয়েছে সদ্যগাঁথা গন্ধরাজের মালা। শুধু তাই নয়, সামনে আসন পাতা রয়েছে। এক পাশে সাজানো রয়েছে একরাশ ফুল আর শ্বেতচন্দন। সুগন্ধি ধূপ জ্বলছে আর এক পাশে।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না অরুণের। চিনতে বাকি রইল না জয়ন্তীর স্বামীকে। সে তো শুধু নবনী নয়, সে জয়ন্তীর স্বামী। স্বামীত্বের আদর্শ রূপ। অরুণ বুঝতে পারল, ম'রে নবজন্ম নিয়েছ নবনী জয়ন্তীর মনে, মৃত্যু তাকে অমৃতত্ব দিয়েছে। মরলোকের মানুষ নবনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত অরুণ, কিন্তু জয়ন্তীর মনোলোকের মানস নবনীর কাছে সে একেবারে নিরস্ত্র, নিঃসহায়।

নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এল অরুণ। কোন কথাই আর বলল না জয়ন্তীকে। বলবার কি-ই বা ছিল। কিংবা অনেক কথাই হয়তো ছিল বলবার, কিন্তু ব'লে কোন লাভ ছিল না।

দোরের কাছে ফের দেখা হোল অনুকূলবাবুর সঙ্গে। চুরুট মুখে পায়চারী করছেন। বললেন, 'কথাবার্তা শেষ হ'ল আপনাদের ?'

অরুণ বলল, 'হ্যাঁ, শেষ হ'ল।'

অসিতবাবু থেমে ফের সিগারেট ধরালেন। তারপর চুপ ক'রে রইলেন একটুকাল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম অসিতবাবুকে। সাধারণ চেহারার মোটামুটি সুদর্শন শান্তশিষ্ট ভদ্রলোক। এর আগেও অনেকবার দেখেছি। কিন্তু এমন ক'রে আর দেখিনি। তাঁর রূপের সঙ্গে যেন আজ নিগূঢ় এক রহস্যের সংযোগ ঘটেছে।

একটু পরে বললুম, 'কিন্তু গল্প তো আপনার ওখানেই সত্যি সত্যি শেষ হ'ল না। তারপর কি হ'ল বলুন।'

অসিতবাবু ছাইদানিতে খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললেন। তারপর একটু হেসে ফের স্বরু করলেন, 'তারপর আবার কি হবে। যেমন হয়। কিছুদিন ঔদাস্যে নৈরাশ্যে ঘোরাঘুরিতে, ছুটোছুটিতে কাটল। উল্কাপিণ্ডের মত জ্বলতে লাগল হৃৎপিণ্ড। অরুণ ভাবল চিরদিন বুঝি এমন ক'রে জ্বলতেই থাকবে। জ্বালার বুঝি কোনদিন বিরাম হবে না। কোনদিন নিববে না সেই জ্বলন্ত দুঃখানল। কোনদিন ভুলতে পারবে না জীবনের এই ক'টি দিনকে। বছর কয়েক পরে অবশ্য ভুল ভেঙেছিল অরুণের। বুঝতে পেরেছিল জীবনে এ সব বৃত্তান্ত ভোলাটাই সহজ, মনে রাখাই অত্যন্ত কঠিন। মনে রাখতে চাইলেই কি মনে রাখা যায়! জীবনের আরো অনেক দাবী আছে, দায়িত্ব আছে, প্রয়োজন আছে, তাদের স্বীকার না ক'রে জো থাকবে না। ভুলবার জন্য পালাল অরুণ বাংলার বাইরে। সুদূর পশ্চিমে নিল এক প্রফেসারী। কিন্তু বাংলার বাইরেও তো বাঙালিনীর আজকাল অভাব নেই। আর গায়ে গেরুয়া পরলেই কি মনের কাঙালপনা অত সহজে মেটে? দ্বারে দ্বারে হাত পাতবার অভ্যাস যায় সহজে? বছর তিন চার পরে হাত পেতে যে মেয়েটির পাণিগ্রহণ করল অরুণ, সে মেয়েটিও দেখতে সুশ্রী, শুনতে সুকণ্ঠী, সদালাপী, সুশিক্ষিতা। এঁরও একটি নাম চাই না কি আপনার, কল্যাণবাবু?'

নিস্পৃহভাবে বললুম, 'দিন না, ক্ষতি কি।'

অসিতবাবু বললেন, 'ঈস্, আপনার সমস্ত কৌতূহল মাটি ক'রে ফেললুম ব'লে মনে হচ্ছে। কৌতূহল না থাকুক, শুনে একটু কৌতুক হয়ত বোধ করতে পারেন আপনি, তাই বলছি। অরুণের স্ত্রীর নাম কল্যাণময়ী। বাপ একটু সেকেলে ধরনের প্রবাসী বাঙালী। কাজ

করেন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে, রুচির মধ্যে একটু পুরাকালীন ছাপ আছে, তাঁর রুচির ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারল না অরুণ, কিন্তু কন্যার ওপর ফেলল। গড়ে-পিটে পুরোপুরি এ-কালিনী ক'রে তুলল তাকে। নামটাকে ছেঁটে-কেটে করল কলি। তারপর চলে এল কলকাতায়। পরমার্থতত্ত্বের অধ্যাপনা করতে করতে কিছু বেশি মাইনে পেয়ে চাকরি নিল ইনকাম-ট্যাক্স্ অফিসে। পরমার্থের চেয়ে বড় চরমার্থ, তারপর সেখান থেকে আরো তু'-একটা অফিস অদল-বদল হ'ল। ব'য়ে চলল সময়ের স্রোত। মন্বন্তরে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় রাঙা হ'ল সহর। তারপর সেই রঙ ফের ফিকে হ'য়ে এল, কিছু বা ধুয়ে গেল চোখের জলে, কিছু কলের জলে, কিছু বা ঢাকা পড়ল ধূলোয়, কিছু শুকিয়ে গেল, একটু একটু ক'রে লোকে সব ভুলতে লাগল। ভোলার চেয়ে মনে রাখা ঢের কঠিন। জীবন-সংগ্রাম কঠিনতর। তার স্বাদ পুরোপুরিই পেতে হচ্ছিল অরুণকে। ভাই-বোনদের সংখ্যা আর বাড়েনি। কিন্তু তাদের ভাইপো-ভাইঝিরা একটি তু'টি আসতে সুরু করেছে। আয়বৃদ্ধি সেই অনুপাতে অনেক রয়েছে পিছিয়ে।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে সু ছেড়ে স্যাণ্ডাল পরল অরুণ, স্যুট ছেড়ে লুঙ্গি। তারপর পুরোন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে স্ত্রীর দেওয়া চায়ের কাপটি হাতে নিতে যাবে, এমন সময় পরিতোষ এসে উপস্থিত। পরিতোষ পুরোন সহকর্মী, বন্ধু। ঠিক সহকর্মী নয়, এ্যাসিস্ট্যাণ্ট—সহায়ক। পদটা অরুণের চেয়ে একধাপ নিচেই। তবে বয়সও কম। পরে উন্নতি করতে পারবে। পরিতোষ এসে ধরল, তার বিয়েতে বরযাত্রী যেতে হবে। নিমন্ত্রণ-পত্র অবশ্য আগেই দিয়েছিল। এবার পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ক্রটি সংশোধন করতে এসেছে।

অরুণ বলল, 'ক্ষেপেছ। একবার বর হয়েছি, তাই যথেষ্ট। যাত্রীটাত্রী হ'য়ে ভারি হাঙ্গামা। তার চেয়ে দূর থেকে আশীর্বাদ করছি।'

কিন্তু পরিতোষ নাছোড়বান্দা। সে শরণ নিল অরুণের স্ত্রীর। মনিবপত্নীকে দু'-এক রাত সিনেমা দেখিয়ে সে প্রায় হাত ক'রে ফেলেছিল।

কল্যাণী (কলি আর কল্যাণময়ীর মাধ্যমিক রূপ) বলল, 'না, এ বড় অন্যায়। তুমি দিনের পর দিন ক্রমেই কুনো হয়ে যাচ্ছ। সমাজ-সামাজিকতা অমন ক'রে ছেড়ে দিলে চলবে কেন। বিশেষ ক'রে পরিতোষ ঠাকুরপোর বিয়ে। না গেলে কি ভালো দেখায়। তিনি কত করেন আমাদের জন্যে।'

অগত্যা উঠতেই হ'ল। যাবে বরযাত্রী, কিন্তু অরুণকে জোর জবরদস্তী ক'রে প্রায় বরবেশ পরিয়েই ছাড়ল কল্যাণী। বিয়েটা বিশেষ ক'রে মেয়েদেরই উৎসব। বিয়ের নাম শুনলেই মন নেচে ওঠে তাদের। সে বিয়ে নিজেরই হোক আর পরেরই হোক। আত্ম-পরে এখানে প্রভেদ নেই।

বিবাহবাসর বড়িষায়। এতকাল কলকাতায় থেকে ও-জায়গাটার কেবল নামই শুনেছে অরুণ, যাওয়ার কোন উপলক্ষ ঘটেনি। এবার ঘটল। কথা ছিল বরের মোটরেই ঠাঁই হবে। কেননা অরুণ সম্ভ্রান্ত অতিথি। কিন্তু পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে দেখল গাড়িতে তার ভাইপো ভাগ্নের দল উঠে বসেছে। তারা কিছুতেই নামবে না। সম্ভ্রান্ত অতিথির জন্যেও না। অরুণ হেসে তাদের নিশ্চিন্ত থাকতে ব'লে আর পাঁচ-সাত জন বয়স্ক সহযাত্রীর সঙ্গে শ্যামবাজারের মোড় থেকে তিনের-এ বাস ধরল।

বাসের মধ্যে আলাপ হ'ল এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। পরিতোষের কি রকম ঠাকুর্দা হন সম্পর্কে। অবশ্য বয়সটা ঠাকুর্দা-জনোচিত নয়, কিন্তু সম্পর্কোচিত রসিকতা বেশ আছে।

তিনি বললেন, 'ভিড়ে তো গ'লে যাচ্ছি মশাই, কিন্তু লাভ কতটুকু কি হবে তাতে ঘোর সন্দেহ আছে।'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

তিনি বললেন, 'আমরা তো ইতরজন। মিষ্টান্ন ছাড়া তো আর কিছু নেই বরাদ্দে। কিন্তু ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা যা দেখছি, তাতে সেটুকুও জোটে কিনা সন্দেহ।'

অরুণ বলল, 'কেন ?'

ঠাকুর্দা বললেন, 'আরে মশাই, বিয়ে কার জানেন ? বিধবার। বিয়ে-চূড়োয়, কোন শুভ কাজে যে হাত ছোঁয়ালে মহাভারত পর্যন্ত অশুদ্ধ হয়ে যায়, অধিবাস-টাস নয় তার একেবারে সাক্ষাৎ বিয়ে ? বলুন দেখি কি কাণ্ড ? গোড়াতেই অযাত্রা। মিষ্টিমুখ নয় মিষ্টিকথা শুনেই এ যাত্রা বিদায় নিতে হবে। আমি আপনাকে ব'লে রাখলুম।'

অরুণ একটু বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'পরিতোষ কি বিধবা বিয়ে করছে নাকি ? কই আমাকে তো আগে বলেনি।'

ঠাকুর্দা বললেন, 'আমাকেই কি আগে বলেছে ? পরে শুনলুম। আগে থেকেই নাকি এক-আধটু জানা-শোনা ছিল। তা জেনেই হোক না জেনেই হোক, নেমন্তন্ন যখন নিয়েছি, জাতটা সঙ্গে সঙ্গেই গেছে। এখন যদি পেটটা না ভরে, তবে তো দু'কূলই গেল।'

আবহাওয়াটা ভালো নয়। কৃষ্ণপক্ষের মেঘলা আকাশ। সহর ছাড়িয়ে সহরতলীতে পড়ল অরুণরা। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও পড়তে সুরু করল ফোঁটায় ফোঁটায়। মনে মনে ভারি বিরক্ত হয়ে উঠল অরুণ। আচ্ছা স্থান-কাল-পাত্রী ঠিক করেছে পরিতোষ। এ তো আসলে বিয়ে নয়, বিয়ের মোড়কে সমাজ-সংস্কার।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হয় দক্ষিণ-পূব দিকে। কন্যাপক্ষ থেকে দু'একটি ছাতার যা সরবরাহ হয়েছে, তার তলায় গেলে অংশতঃ ভিজতে হয়। তার চেয়ে একক পুরোপুরি ভেজাই ভালো।

এর আগে লজ্জা করছিল, কল্যাণীর পরানো বিশেষ বেশবাসটির জন্য, এবার দুঃখ হ'ল, অরুণের।

অবশেষে সদলবলে এসে পৌঁছা গেল বিয়ে বাসরে। জীর্ণ একটা দোতলা বাড়ি আর সামনে পানাভরা মজা পুকুর ইলেকট্রিকের আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। তবু অরুণরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরোন বাড়ির ভিতর থেকে হুলুধ্বনি উঠল, বেজে উঠল শাঁখ। অমন প্রতিকূল পরিবেশেও খুশীর আমেজ লাগল অরুণের মনে।

টাকপড়া, প্রৌঢ় কন্যাকর্তা এগিয়ে এলেন, 'আসুন, আসুন, আপনাদের খুবই কষ্ট হ'ল।'

পরিতোষের সেই ঠাকুর্দা বললেন, 'আজ্ঞে, তা আপনাদের কৃপায় একটু হ'ল বই কি।'

কন্যাকর্তা হয়ত একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়েছিলেন। জবাবটা সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মুখে জোগাল না, কিন্তু জবাব এল তাঁর পিছন থেকে। কেবল বিনীত নয়, মধু-বিনিন্দিতকণ্ঠে, 'একটু কেন, কষ্ট আপনাদের যথেষ্টই হয়েছে। গরীবের মেয়ের বিয়ে। কষ্টের কথা তো আপনারা জেনে-শুনেই দয়া ক'রে এসেছেন। কৃপা আপনাদের, আমরা কৃপার্থী।'

চমকে উঠে সেই সুধাকণ্ঠের অধিকারিণীর দিকে চোখ তুলে তাকাল অরুণ। তারপর আর চোখ নামাতে পারল না। জয়ন্তী, বেশবাসের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি! সেদিনের প্রায় তেমনি একখানা সাদা থান পরনে। হয়ত ততখানি স্থূল আর হ্রস্ব নয়। তেমনি নিরাভরণ দেহ।

কিন্তু অদ্ভুত বদল হয়েছে চেহারার। সেদিনের সেই শুষ্কতা, শীর্ণতা, শূন্যতার বদলে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যে আর লাবণ্যে টল্‌টল্‌ করছে, মুখ জলজ্বল করছে, তৃপ্তিতে আনন্দে।

কাঠগোলাপ

অরুণকে দেখে একটু যেন চমকে উঠল জয়ন্তী, কিন্তু পরমুহূর্তে তার স্মিতমুখ ঠিক তেমনি সহজ হ'য়ে উঠল স্বাচ্ছন্দ্যে।

কন্যাকর্তা বিভূতিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'তরঙ্গিণী নারীকল্যাণ সমিতির সম্পাদিকা। এঁরাই উদ্যোগ আয়োজন ক'রে বিয়ে দিচ্ছেন আমাদের রেবার। এঁদের সমিতিরই সভ্যা কিনা সে।' তারপর অরুণকে দেখিয়ে বললেন, 'আর উনি আমাদের পরিতোষের বন্ধু। নাম—নাম—'

জয়ন্তী মৃদু একটু হাসল, 'নাম আমি জানি বিভূতিবাবু। আমাদের পরিচয় আছে।'

দু'খানা হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল জয়ন্তী। যেন একটি মুদ্রিত শ্বেতপদ্ম এসে মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করল তার শুভ্র, সুন্দর কপালটুকু।

একটু বাদে জয়ন্তী বলল, 'ভালই হ'ল, রেবার বিয়েতে বিভাসদাকেও পেয়েছি আমরা দলে। খুলনা থেকে আজই এসে পৌছেছেন তিনি। ভাগ্যে স্টেশনে গিয়েছিলাম, তাই দেখা। জোর ক'রে ধরে এনেছি। ঘুমুচ্ছেন শুয়ে শুয়ে। আগের দু'রাত নাকি ঘুমান নি। আজ সন্ধ্যা থেকেই তার শোধ তুলছেন। ডেকে দেব?'

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল অরুণ। তারপর দলের সঙ্গে গিয়ে বসল বরযাত্রীদের আসরে। ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পালাতে চেষ্টা করল অরুণ কিন্তু ভিড় তাকে স্পর্শ করল না। চাপাদেওয়া ক্ষতের মুখে যেন নতুন ক'রে আবার খোঁচা লেগেছে। জ্বালা ধ'রেছে পুরোন দিনের মত। হতাশার জ্বালা, অপমানের জ্বালা, ব্যর্থতার জ্বালা। তার শোধ নেওয়া হয় নি। সেই সঙ্গে অবাকও লাগছে একটু একটু। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, কৌতুককরও বটে। সেই স্বামী-পূজারিণী জয়ন্তী হয়েছে নারীকল্যাণ সঙ্ঘের সম্পাদিকা, বিধবা বিয়ে হচ্ছে তারই উদ্যোগে যে সেদিন দম্ভভরে বলেছিল হিন্দুর মেয়ের মাত্র একবারই বিয়ে হয়। হাতখানা ধরেছিল ব'লে

যে দারোয়ান লেলিয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়েছিল তাকে। আর একবার সহনাতীত জ্বালা ক'রে উঠল সেই গোপন ক্ষতদেশে। স্থান কাল সব যেন ভুলে গেল অরুণ, ব্যবধান ভুলে গেল আট ন' বছরের। ভাবল, এখান থেকে উঠে গেলে কেমন হয়? যেখানে জয়ন্তী আছে সেখানে সে থাকবে কেমন ক'রে?

বিয়ের লগ্নের দেরি আছে। তার আগে বরযাত্রীদের আপ্যায়ন পর্বটা হ'য়ে যাক। কারণ, আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ফের তো ফিরে যেতে হবে। কন্যাকর্তা এসে হাতজোড় ক'রে দাঁড়ালেন। পরিতোষের ঠাকুর্দা অরুণের কানে কানে বললেন, 'চলুন মশাই, চলুন। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। হিতৈষিণীদের ধন্যবাদ। এই দুর্যোগের মধ্যেও জলযোগের ব্যবস্থাটা ওঁরা বহাল রেখেছেন।' তারপর আর একটু চাপা গলায় বললেন, 'কিন্তু যাই বলুন, মিষ্টিমুখ না হ'লেও বোধ হয় তত আর আফশোষ ছিল না। চোখ জুড়িয়ে গেছে মশাই, হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ। হিতৈষিণীর মনোহারী মুখ আরো সুদুর্লভ।'

ভিতরবাড়ি থেকে বিভাস এসে পৌঁছল। সোল্লাসে জড়িয়ে ধরল অরুণের হাত, 'আরে তুমি? আমি তো ভেবেছিলাম ম'রে হেজে একেবারে ভূত হয়ে গেছ। কত মারাত্মক কাণ্ডই তো ঘটল!'

অরুণ একটু হাসল, 'তুমিও তো ভূত হও নি দেখছি।'

বিভাস বলল, 'কে বলল যে হই নি। ভূতেরাও দেখতে প্রায় মানুষের মত। দেখবার অভ্যাস না থাকলে চেনা যায় না। বিয়ে থা ক'রে একেবারে দারুভূত মুরারী সেজে বসে আছি। তেমন ছুটোছুটি আর করতে পারিনে। দেখছ না, বেশ একটু নেয়াপাতি ভুঁড়ির মত হয়েছে। ভালো খেয়ে-দেয়ে নয়, যা তা খেয়ে খেয়ে। বদহজম, তার পর, তোমার খবর কি?'

কন্যাকর্তা ইতিমধ্যে আর একবার এসে হাতজোড় ক'রে অরুণের সামনে দাঁড়ালেন। সরকারী বরকর্তা—পরিতোষের সেই ছোড়দার বয়সী ঠাকুর্দা ভদ্রলোক অসহিষ্ণু হয়ে টানলেন হাত ধ'রে। অরুণ দু'জনকেই এক কথায় জবাব দিল, 'মাপ করুন।'

কাজের এক ফাঁকে কখন জয়ন্তী এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওঁর জন্য ব্যস্ত হবেন না, বিভূতিবাবু। উনি না হয় একটু পরেই খাবেন।'

বিভূতিবাবু বললেন, 'কিন্তু একেবারেই খাবেন না বলছেন যে!'

জয়ন্তী একটু হাসল, 'বলছেন নাকি? আচ্ছা, সেজন্য ভাববেন না।'

লগ্ন এগিয়ে এসেছে। বিয়ের আয়োজন চলেছে ভিতরে। জয়ন্তী আবার সেদিকে চলে গেল।

আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, বোধ হয় জয়ন্তীদের সমিতিরই কোন সহকারিণী, টিপ্পনী কেটে বলল, 'আপনার যে আজ খুব উৎসাহ দেখছি, জয়ন্তীদি। পুরোন বন্ধুদের দেখা পেয়েছেন ব'লে বুঝি?'

জয়ন্তী ধমকের স্বরে বলল, 'বাজে বকিসনে। আমার উৎসাহ কম দেখেছিস কবে? তোদের মত ঢিলেমী আমার কোনদিন নেই।'

কিন্তু ধমকের মধ্যে কৃত্রিমতা ধরা পড়ল। মাজা গৌর বর্ণের সুডৌল মুখখানিতে আরক্ত আভাস গোপন রইল না।

বৃষ্টি থেমেছে। সিগারেট ধরিয়ে বিভাসকে সেই পানাভরা পুকুরের ধারে ঠেলে নিয়ে গেল অরুণ। বলল, 'চল, একটু ঘুরে আসা যাক।'

বিভাস বলল, 'অবাক করলে। কোথায় যাবে এত রাত্রে এই কাদা-কাচড়ের মধ্যে। তার চেয়ে বিয়ের আসরে গিয়ে বসলেই হ'ত। খুব খুশী হ'ত জয়ন্তী।'

অরুণ বলল, 'না না, চল। কথা আছে।'

বিভাস মুখ টিপে হাসল, বলল, 'বুঝেছি। এতক্ষণে তোমারও তো

বোঝা উচিত ছিল। তুমি একটি আস্ত হাঁদারাম। তোমার দোষ নেই। ভালো ছেলেরা তাই হয়। তারা খেলাটা বোঝে না, লীলাটাও নয়।'

তারপর সেই পানাভরা পুকুরের কাদামাখা পাড়ে পায়চারী করতে করতে বিভাসের মুখ থেকে অরুণ শুনতে লাগল জয়ন্তীর ইতিবৃত্ত, তার বিবর্তনের কাহিনী।

একনিষ্ঠ স্বামীপূজা বেশ কিছুদিন চলেছিল জয়ন্তীর। দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময় কাটত তার স্বামীর ফটো নিয়ে, সেই ছোট ঘরটুকুর মধ্যে। ফুল তুলত, মালা গাঁথত, মালা পরাত। অধ্যায়ের পর অধ্যায় ব'সে ব'সে পড়ত গীতা আর শ্রীমদ্‌ভাগবত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী তার বড়দা অনুকূল কোন কথা বলতেন না, কোন বাধা দিতেন না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি বদলী হয়ে গেলেন অন্য জেলায়। উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে চাকরি খুইয়ে বাড়ি এসে বসলেন মেজদা শশাঙ্ক। চালানী ব্যবসা স্থরু করলেন বাঁশের আর কাঠের। তিনি বললেন, 'পূজো কর, কর। কিন্তু কেবল পূজো নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। সংসারে কাজ আছে অনেক। তোমার মেজো বউদি চিররুগ্না। কতগুলি ছেলে-মেয়ে। তাদের দিকে না চাইলে পারব কি ক'রে।'

ফলে সকলের দিকেই চাইতে হ'ল জয়ন্তীকে। গোশালা থেকে আঁতুড়ঘর পর্যন্ত। হাঁপ ছাড়বার সময় নেই। কিন্তু সময় না পেয়ে জয়ন্তী যেন বেঁচে গেল। বিয়ের আগের প্রণয়ঘটিত দুর্ঘটনায়, বিয়ের পরের বৈধব্যের দুর্ভাগ্যে যে সম্মান যে মর্যাদা সে হারিয়েছিল, একটু একটু ক'রে সেই হৃতশ্রী আবার ফিরে এল, আবার সে হয়ে উঠল পরিবারের মধ্যে অপরিহার্য। পাড়ার যে সব মেয়েরা তার সঙ্গ এড়িয়ে চলত, মা-বাপের কাছ থেকে তারা ফের অনুমতি পেল জয়ন্তীর কাছে এসে সেলাই শিখতে। সূচিশিল্পে দক্ষতা ছিল জয়ন্তীর।

সেই সেলাই-সমিতি থেকেই উৎপত্তি নারীকল্যাণ সমিতির।

একদিন স্বামীর প্রতিকৃতির জন্য বেলফুলের মালা গাঁথতে বসেছে জয়ন্তী, হঠাৎ পায়ের ওপর এসে ঘোষেদের কমলা বলল, 'দিদি, আমাকে রক্ষা কর। ও আমাকে জোর ক'রে নিয়ে যেতে চায়। নিয়ে গিয়ে এবার একেবারে মেরে ফেলবে সেই মতলব।'

কমলাও বাপের বাড়িতে যখন থাকে সেলাই শেখে এসে জয়ন্তীর কাছে। তার দুর্ভাগ্যের কথা কারো অজানা ছিল না। কমলার স্বামী প্রিয়বর মগুপ, দুশ্চরিত্র। তাই নিয়ে কমলা কোন কথা বলতে গেলেই সে তার মুখ চেপে ধরে, গলা টিপে ধরে, লাথি মারে এলোপাতাড়ি। বেদম মার খেয়ে সেদিন কোন রকমে পালিয়ে এসেছে কমলা। প্রিয়বর এসেছে পিছনে পিছনে। কেলেঙ্কারীর ভয়ে কমলার বাবা তাকে সেই স্বামীর হাতেই সঁপে দিতে চাইছে। এখন জয়ন্তী যদি রক্ষা না করে, উপায় নেই কমলার।

মালা-গাঁথা ফেলে রেখে উঠে পড়ল জয়ন্তী। মনে পড়ে গেল নিজের কথা। নিজেদের দাম্পত্য জীবনের কথা। বলল, 'তোমার ভয় নেই কমলা, আমি যতক্ষণ আছি কেউ তোমাকে সেই দুর্বৃত্ত স্বামীর হাতে ঠেলে দিতে পারবে না।'

কথা দেওয়া যত সহজ হ'ল, রক্ষা করা তত সহজ হ'ল না। বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন কমলার বাবা, কমলার স্বামী। এমন কি জয়ন্তীর নিজের মেজদা শশাঙ্ক বললেন, 'যার যেমন স্বভাব তার তেমনি সঙ্গ। ও সব ন্যুইসেন্সের জায়গা আমার এখানে হবে না। তুমি ইচ্ছা করলে তোমার শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ওসব হিতব্রত, সমাজসংস্কার করতে পার। আমার বাড়িতে চলবে না।'

জয়ন্তী বলল, 'বেশ। শ্বশুর বাড়ি আর তোমার বাড়ি ছাড়াও আরো অনেক বাড়ি আছে সহরে। দেখি তার কোনটি পাই কি না।'

একজিবিশনে প্রাইজ পাওয়া নিজের যে সব সূচিশিল্পের নমুনা ছিল তার কাছে, খুঁজেপেতে জড়ো করল জয়ন্তী, কুড়িয়ে নিল সঙ্গিনীদের হাতের কাজ, দু'চারখানা অলঙ্কার যা অবশিষ্ট ছিল বাঁধল আঁচলে, বিক্রি ক'রে জমল কিছু টাকা। সেই টাকায় ভাড়া নিল কলেজ পাড়ায় প্রফেসারদের বাসার কাছে ছোট দোচালা একখানা টিনের ঘর। অফিস বসল নারীকল্যাণ সমিতির। ঘুরে ঘুরে সহায়তা পেল দু'তিনজন পসারহীন তরুণ উকিলের। মামলা রুজু হ'ল কমলার স্বামী প্রিয়বরের নামে, মারপিট-অত্যাচারের অভিযোগে, খোরপোশের দাবীতে। আশ্চর্য, মামলা জিতে গেল জয়ন্তী। প্রাচীনপন্থীরা বাঁকা কটাক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র কোট করলেন, 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।' কিন্তু উৎসাহী তরুণের দল জয়ন্তীকে ঘিরে ধরল। দুর্নাম, অপবাদের ঢেউ কোন কোন পাড়ায় অবশ্য উত্তুঙ্গ হয়ে উঠল। কেউ কেউ খুঁড়ে বের করলেন অতীতের ইতিবৃত্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেউ রুখতে পারল না জয়ন্তীকে। ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় সে ভেসে চলল। স্রোত তার অনুকূলে।

বিধবা বিয়ে সম্বন্ধে জয়ন্তীর দিন কয়েক একটু দ্বিধা ছিল। এ প্রসঙ্গে সে বলত, 'কেন, একজন পুরুষের স্কন্ধগত হওয়া ছাড়া মেয়েদের কি অন্য কোন কাজ নেই? একজন ম'রে গেল ব'লে যে আর একজনের কাঁধে চাপতেই হবে তার কি মানে আছে। নিজেদের হাত আছে পা আছে, চোখ আছে মাথা আছে। চলবার পক্ষে, বাঁচবার পক্ষে তাই তো যথেষ্ট। গোঁফ দাড়ি না-ই বা থাকল। তার ওপর এত লোভ কেন মেয়েদের!'

কিন্তু কিছুদিন বাদেই এই উগ্র নারীস্বাতন্ত্র্য শিথিল হয়েছিল জয়ন্তীর। সমিতির একটি অল্পবয়সী মুখচোরা লাজুক বিধবা মেয়ে তার ভারি স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রমাণ পাওয়া গেল, জজকোর্টের একটি সুদর্শন কেরাণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘটেছে। সবাই ভাবল মুখচোরা মিনতির এবার

নাম কাটা যাবে সমিতি থেকে। কিন্তু কেরাণীটির অসীম সাহস। সে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা ক'রে বলল, 'নাম কাটেন কাটুন। কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা না হ'লে কান কাটা যাবে। মিনুর আর কোন জায়গায় স্থান হবে না। ব'লে ক'য়ে ওর বাপ-মাকে রাজী করাতেই হবে। আর তা' কেবল আপনিই পারেন।'

জয়ন্তী একটা রাত সময় নিল ভেবে দেখবার। তারপর তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। হয়তো তার মনে পড়েছিল, হাত পা নাক চোখ কান মাথার দিক থেকে মেয়ে আর পুরুষে আলাদা আলাদা হলেও হৃদয়ের ক্ষেত্রে দুই জাতই বড় অসহায়, বড় নির্ভরশীল পরস্পরের ওপর।

বিয়ের পরও মিনতির নাম রইল সমিতির খাতায়, আর কর্মতালিকায় বিধবা বিয়েটিও অন্তর্ভুক্ত হ'ল।

টিনের ঘরের বদলে পাকা বাড়ি উঠল সমিতির। বসল স্কুল, বসল তাঁত, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, ওই ধরনের আরো কয়েকটি লুপ্তপ্রায় কুটিরশিল্প পুনরুজ্জীবিত হ'ল। সমিতির শাখা-অফিস বসল কলকাতায়।

অনেকক্ষণ ধ'রে জয়ন্তীর দিগ্‌বিজয়ের কাহিনী ব'লে গেল বিভাস। সে কাহিনীর মধ্যে অরুণের নামগন্ধ মাত্র নেই।

অরুণ মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে ভাবল, এই মহাভারত শুনে তার লাভ হ'ল কি। সময় নষ্ট করার জন্য বিভাসের ওপর অদ্ভুত একটা আক্রোশই বরং এসে গেল তার।

অরুণ বলল, 'তা তোমার জয়ন্তী নিজেই আর কাউকে বিয়ে করল না কেন? একটা মহৎ দৃষ্টান্ত থেকে যেত সমিতিতে। অনুপ্রাণিত হ'ত আরো অনেক শাঁখাসিঁদূরবঞ্চিতার দল।'

বিভাস একটু হাসল, 'এ প্রশ্ন কেবল তুমি নয়, আরো অনেকে করেছেন। তাদের মধ্যে প্রবীণ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট থেকে সুরু ক'রে তরুণ

উকিল, প্রফেসর সবাই ছিলেন। কিন্তু জয়ন্তী তাঁদের প্রত্যেককে নিরুত্তর আর নিরাশ করেছে। বলেছে, 'উঁহু। এ সম্বন্ধে সমিতির সভ্যাদের রেকর্ড খুব ভালো নয়। যে সব সভ্যারা নতুন ক'রে শাঁখা-সিঁদুরের স্বাদ পাচ্ছেন, তাঁরা এমন ক'রে ডুবে যাচ্ছেন ঘর-সংসারে যে, চার আনা চাঁদা পর্যন্ত মিলছে না তাঁদের কাছ থেকে। সে দশা তো আমারও হতে পারে। তার চেয়ে একেবারে পাকা চুলেই ফের সিঁদূর পরব। দ্বিতীয়বার মুছবার আর ভয় থাকবে না। সমিতির ভিতটাও ততদিনে আশা করি পুরোপুরি পাকা-পোক্ত হবে।'

বিভাস একটু থামল, তারপর আরও একটু চাপা গলায় বলল, 'কিন্তু অনেকেরই ধারণা, এসব বাজে ওজুহাত জয়ন্তীর। আসল মনের কথা নয়।'

অরুণ বলল, 'আসল মনের কথাটা তা'হলে কি?'

বিভাস জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'কি জানি ভাই। মেয়েদের চরিত্র, মেয়েদের মন, দেবাঃ ন জানন্তি কুতঃ মনুষ্যাঃ।'

খাওয়া-দাওয়ার পাট শেষ হ'ল। শাঁখে আর হুলুধ্বনিতে সুরু হ'ল বিয়ে। পরিতোষের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এল অরুণ, বিদায় নিল কন্যাকর্তা বিভূতিবাবুর কাছ থেকে, বিভাসকে ঠিকানা দিয়ে বলল, 'দেখা কোরো।'

কেবল বলল না কিছু জয়ন্তীকে। তাকে এড়িয়েই পেরিয়ে গেল বাড়ির সদর দরজা। বাস অনেকক্ষণ বন্ধ হ'য়ে গেছে। বরযাত্রীদের যাঁরা দু'একজন যেতে পারেন নি তাঁদের জন্য নারীকল্যাণ সমিতি হঠাৎ ভারি সদয় হয়ে উঠেছেন। নিজেদের ব্যয়ে ট্যাক্সীর বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছেন একখানা। খানিক দূরে দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সী। সহযাত্রীরা তাড়াতাড়ি গিয়ে সীট দখল করেছেন। অরুণও সেইদিকে যাচ্ছিল, পিছনে কার

পায়ের শব্দে মুখ ফিরে তাকাল। দেখল, জয়ন্তী দ্রুত এগিয়ে আসছে তার দিকে। অরুণের কাছাকাছি এসে ব্লাউজের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বের করল ছোট একটা চাঁদার খাতা। হেসে বলল, 'সঙ্ঘ মানেই সাঙ্ঘাতিক। আমাদের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না, একথা সবাই জানে। পালিয়ে গেলে আমরা পিছু নি-ই। আর, চাঁদাটা এমনই জিনিস, জোর-জবরদস্তী ছাড়া তা আদায় হয় না।'

গাড়ির ভিতর থেকে যে সব সহযাত্রী মুখ বাড়িয়ে ছিল তারা ফের সভয়ে মুখ লুকাল। অরুণও বিব্রত বোধ করল একটু। তারপর পকেট হাতড়ে বের করল দশ টাকার একটি নোট। এইটিই শুধু আছে। গৃহিণীপনা জানে কল্যাণী। স্বামীর ঘড়িপকেটে অযথা বেশি টাকা গুঁজে দেওয়ার সে কোনদিন পক্ষপাতী নয়। সে টাকা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হিসাব পাওয়া যায় না খরচের।

অরুণ ভাবল জয়ন্তী খুব খুশী হবে এই অপ্রত্যাশিত দানে। কিন্তু জয়ন্তীর কথা শুনে সে অবাক হ'য়ে গেল। দশ টাকার নোটখানা দেখেও ঘাড় নাড়ল জয়ন্তী, মৃদু হেসে বলল, 'যাঁরা অসামান্য, তাঁদের কাছ থেকে সামান্য পাঁচ-দশ টাকা তো আমরা নিইনে!'

অরুণ বিরক্তির স্বরে বলল, 'আমি অসামান্য নই। আর এই দশ টাকা ছাড়া এখন কিছু নেইও আমার কাছে।'

জয়ন্তী বলল, 'কি জানি, কারো কারো তো এখনো অসামান্য ব'লেই ধারণা। তা'ছাড়া টাকা না থাকলে তার বদলে ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে আমরা অন্য জিনিসপত্রও নিয়ে থাকি।'

কিন্তু এই মুহূর্তে অন্য জিনিসপত্রই বা অরুণের কাছে এমন কি আছে? হঠাৎ জয়ন্তীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে নিজের আঙুলের দু'টি আংটির দিকে চোখ পড়ল অরুণের। দামীটি শ্বশুরবাড়ির। কম দামীটি নিজের।

ছাত্র বয়সে মা দিয়েছিলেন। সেই থেকে আছে হাতে। অনামিকায় বড় আঁট হয়, তাই রেখেছে কনিষ্ঠায় পরিয়ে। মনে পড়ল সেই প্রথম প্রেমের সময় জয়ন্তীকে দু'একবার পরিয়েছে এই আংটি। প্রতিবারই ফেরৎ দিয়েছে জয়ন্তী। লোকে দেখলে কি বলবে? আজ কি, এতদিন বাদে লোকভয় লোপ পেয়েছে জয়ন্তীর! হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন অনুভব ক'রল অরুণ। তারপর আঙুল থেকে খুলতে চেষ্টা ক'রল শ্বশুরের দেওয়া পোকরাজ-বসান আংটিটি।

কিন্তু জয়ন্তী মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু, এত বড় দান সইবে না। তা'ছাড়া দাতাকে হয়ত এর জন্যে বউয়ের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তার চেয়ে নিজেরটি দেওয়াই ভাল।'

আংটিটি খুলে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে অরুণ বলল, 'কিন্তু আংটিটি আজ যদি নিজের হাতে পরিয়ে দিতে যাই জয়ন্তী, ফের দারোয়ান ডাকবে না তো?'

জয়ন্তী হেসে উঠল, 'ওমা, বলছ কি তুমি! নিজের হাতে পরিয়ে দেবে কাকে? দেখছ না কি মোটা হ'য়ে গেছি, ও আংটি তো কড়ে আঙুলেও লাগবে না আমার। আমি চাইছিলুম রেবার জন্যে। ওর ভারি সখ আংটি পরার। তাড়াতাড়িতে দিয়ে উঠতে পারিনি।'

অরুণ এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল। তারপর আংটিটি তুলে দিল জয়ন্তীর হাতে।

তার পরিবর্তে জয়ন্তী দিল একখানা ছাপানো কার্ড। তাদের নারীকল্যাণ সমিতির নাম-ঠিকানা। বলল, 'যদি কোন দরকার হয়, চিঠি দিয়ো।'

অসিতবাবু হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, বললেন, 'চলুন, দেখুন তো গল্পে-গল্পে কত রাত হ'য়ে গেল।'

বললুম, 'তা একটু হ'ল বই কি। কিন্তু আমার সুপারিশ চিঠির খামের ওপর নাম-ঠিকানা তো লেখেন নি।'

অসিতবাবু বললেন, 'ও! ভবী দেখছি ভুলবার নয়, সুপারিশ চিঠিটা বেশ মনে রেখেছেন দেখছি।'

সাদা খামটা টেনে নিয়ে মাথা একটু নিচু ক'রে তার ওপর ঠিকানা লিখতে লাগলেন অসিতবাবু: সম্পাদিকা, ফরিদপুর নারীকল্যাণ সমিতি, বউবাজার ব্রাঞ্চ, ফরডাইস লেন, কলিকাতা।

স্বাচ্ছন্দ্যে আর পরিতৃপ্তিতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে অসিতবাবুর মুখ। অরুণ কি এখনো প্রেমপত্র লিখছে জয়ন্তীকে?